পরিপ্রশ্ন

(দ্বিতীয় ভাগ)

(স্বামী ভূতেশানন্দ মহারাজের সাথে কথোপকথন)

সম্পাদনা

স্বামী ঋতানন্দ

(দ্বিতীয় ভাগ)

(স্বামী ভূতেশানন্দ মহারাজের সাথে কথোপকথন)

সম্পাদনা

স্বামী ঋতানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়

কলকাতা

প্রকাশক
স্বামী বিশ্বনাথানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার
কলকাতা-৭০০ ০০৩
e-mail : info@udbodhan.org

প্রকাশকাল
শ্রীমা সারদাদেবীর শুভ আবির্ভাব তিথি
২৪ ডিসেম্বর ২০১৩
৮ পৌষ ১৪২০
2M2C

প্রচ্ছদ অলঙ্করণ
শুভ্রকান্তি দে

ISBN : 978-81-8040-565-5 (Vol-2)
ISBN : 978-81-8040-566-2 (Set)

মুদ্রক
রমা আর্ট প্রেস
৬/৩০, দমদম রোড
কলকাতা-৭০০ ০৩০

শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের শ্রীচরণে উৎসর্গিত

প্রকাশকের নিবেদন

'পরিপ্রশ্ন' প্রথম ভাগ প্রকাশের পর থেকেই দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশের জন্য পাঠক-অনুরাগীদের সাগ্রহ অনুরোধ এসেছে বারবার। ধর্মপিপাসু ও অনুসন্ধিৎসু পাঠকের ক্রমবর্ধমান আগ্রহে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ আবির্ভাব তিথিতে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হল।

প্রথম ভাগটির মতো দ্বিতীয় ভাগটিও অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও পরম যত্নে সম্পাদনা করেছেন 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক ও বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের বর্তমান সম্পাদক স্বামী ঋতানন্দ মহারাজ।

আশা করি, প্রথম ভাগের মতো এটিও একইভাবে সকলের কাছে সমাদৃত হবে।

যাঁদের সার্বিক সহায়তা পুস্তকটিকে সর্বাঙ্গসুন্দররূপে প্রকাশিত হতে সাহায্য করেছে, তাঁদের ওপর শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক—এই প্রার্থনা।

২৪ ডিসেম্বর ২০১৩ — **স্বামী বিশ্বনাথানন্দ**
শ্রীমা সারদাদেবীর শুভ আবির্ভাব তিথি — অধ্যক্ষ
উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা-৭০০ ০০৩

সম্পাদকের কথা

শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর পরম আশীর্বাদে 'পরিপ্রশ্ন' দ্বিতীয় ভাগ শ্রীশ্রীমায়ের শুভ আবির্ভাব তিথিতে প্রকাশিত হল।

'পরিপ্রশ্ন' প্রথম ভাগ পাঠক ও অনুরাগিমহলে বিশেষ সমাদৃত ও প্রশংসিত হয়েছে। পরবর্তী ভাগের জন্য তাঁদের প্রবল আগ্রহ এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশে আমাদের অপরিমেয় উৎসাহ দান করেছে। বলা বাহুল্য, দ্বিতীয় ভাগটিও আমাদের সংগ্রহে থাকা পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের কথোপকথন ও আলাপচারিতার আরো কিছু অমূল্য অংশ যথাযথভাবে প্রকাশের প্রয়াস।

শ্রীরামকৃষ্ণভাব প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় শাস্ত্র ও মহাপুরুষদের সনাতন ভাব ও আদর্শের মধ্যে তার মূলকে প্রোথিত করেও বর্তমান ও আগামী আধুনিক ভাবসকলের সমষ্টিস্বরূপ। সেই ভাব-আদর্শের পূত পীযূষধারার গভীরতা ও মাধুর্য-ই পূজ্যপাদ মহারাজজীর স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল ঘরোয়া আলাপচারিতায় পরিস্ফুট হয়ে আলোচনা-পর্বগুলিকে অত্যন্ত মনোগ্রাহী করে তুলেছে। এ-বিষয়গুলি একদিকে যেমন পণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞদের অভিভূত করছে, অপরপক্ষে অগণন রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শী ও অনুরাগীর মনে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন ও বাণীর তাৎপর্যকে অধিকতর স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল করে তুলছে।

অপর যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অবশ্যই উল্লেখের দাবি রাখে সেটি হল—গ্রন্থটি পাঠকালে প্রতিটি আলাপ-আলোচনার মধ্যে পূজ্যপাদ মহারাজজীর দিব্য-মধুর উপস্থিতি। এই দিব্য-সান্নিধ্য আমাদের সকলকে তাঁর অমূল্য ও অমোঘ সঙ্গলাভে ধন্য করছে। আশা করি, প্রথম ভাগের মতো এটিও পাঠক-অনুরাগীদের মনের জিজ্ঞাসাকে পূজ্যপাদ মহারাজের অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার-নিঃসৃত আলোকে পরিতৃপ্ত করবে।

পরিশেষে, গ্রন্থটি প্রকাশে বিভিন্নভাবে যাঁরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তাঁদের ওপর শ্রীশ্রীঠাকুর; শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও মহারাজজীর অকৃপণ আশীর্বাদ ও কৃপা ঝরে পড়ুক—এই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীমায়ের শুভ আবির্ভাব তিথি
২৪ ডিসেম্বর ২০১৩

স্বামী ঋতানন্দ

প্রশ্ন : শ্রীরামকৃষ্ণের অনুভব বা অন্যান্য যাঁরা অতি উচ্চ কোটির মহাপুরুষ—তাঁদের অত্যুচ্চ অনুভব কি একদিন বেদ বা ভাষাকে অতিক্রম করে যাবে?

মহারাজ : তা যাক। তুমি তো আর সকলের অনুভব দেখতে যাবে না। নিজের অনুভবই তো বলবে।

—'কথামৃত'-এ ঠাকুর তো তাঁর অনুভবের কথাই বলছেন।

মহারাজ : তা তো বটেই। সবটা মুখে বলা যায় না—বলছেন না? অনুভবের কথা বলছেন মানে, দিগ্‌দর্শন করাচ্ছেন।

—একবার বলতে চেষ্টা করছেন, দুবার, তিনবার। কিন্তু পারছেন না। তখন কাঁদছেন। লীলাপ্রসঙ্গে আছে।

মহারাজ : মা মুখ চেপে ধরছেন।

এই যে অনুভূতি, যা বেদ-বেদান্তকে ছাড়িয়ে গেছে, তা শুধু এই দৃষ্টিতে না অন্য কোন অর্থও হয়? ব্রহ্মের অনুভব—এটাই কি একমাত্র তাৎপর্য, না অন্য কোন তাৎপর্য আছে?

মহারাজ : অনুভবকে ভাষায় যদি প্রকাশ করা না যায়, তাহলে তা শাস্ত্রকে ছাড়িয়ে যাবে।

—ঠাকুর যখন কাশীতে গিয়েছিলেন, তখন সেখানে তাঁর অনুভব হল—শিব এসে তারকব্রহ্ম মন্ত্র দিচ্ছেন এবং মা জীবের বন্ধন কেটে দিচ্ছেন। পণ্ডিতদের কাছে একথা বলায় তাঁরা বললেন : আমরা এতদিন জেনেছিলাম, কাশীতত্ত্বে লেখা আছে—এখানে মরলে মুক্তি হয়। কিন্তু কী করে হয়, তা জানতাম না। তখন ঠাকুর বলছেন, এখানকার অনুভূতি

বেদ-বেদান্তকে ছাড়িয়ে গেছে। তা ওপরের ঘটনায় দেখা যাচ্ছে, এমন কিছু অনুভব ঠাকুরের ছিল, যেগুলির বর্ণনা বেদ-বেদান্তে নেই।

মহারাজ : বর্ণনা নেই মানে—সত্যের বর্ণনা কোথাও নেই। অসত্য নয়—এই অবধি বলা যায়। সত্যের এই এই রকম—এভাবে বলা যায় না।

—মহারাজ, আধ্যাত্মিক জগতে অনুভব তো একরকম নয়, অনেক রকম হতে পারে। সেই অনুযায়ী কি ঠাকুরের অনুভূতি অন্যান্য সব অনুভবকেও অতিক্রম করেছে?

মহারাজ : এ তো মুশকিল। এ কে বলবে বল। সব শেয়ালের এক 'রা'—এও তো ঠাকুর বলেছেন।

—কিন্তু আমরা নির্বিকল্প সমাধিকে সর্বোচ্চ অনুভব বলি—

মহারাজ : আসল কথা হল, ব্রহ্মানন্দ বর্ণনার অতীত।

—আবার এই ব্রহ্মেরই অনুভব ঠাকুর কতরকমভাবেই না করেছেন।

মহারাজ : রকম যেখানে, সেখানে অনুভব নয়। চরম অনুভব নয়।

—এই যে, যেমন জগন্মাতাকে দেখছেন সাকাররূপে, রামরূপে, কৃষ্ণরূপে; এগুলো তো একরকম অনুভব নয়।

মহারাজ : না। চরম অনুভব নয়। এ অনেকে দেখেছে। এক-একজন এক-একরকম করে দেখেছে।

—হ্যাঁ। তা, এখানেও কি ঠাকুরের অনুভব অন্যান্য আচার্য বা মহাপুরুষদের ছাড়িয়ে গেছে?

মহারাজ : তা কী করে বলব?

প্রশ্ন : মহারাজ, আপনি গান গাইতেন আগে?

মহারাজ : গান শুনতাম। তবে কখনো কখনো গেয়েছি একসঙ্গে—কোরাসে। আমি আর ফণি মহারাজ একসঙ্গে গান করতাম। মাস্টারমশায়ের কাছে যখন গেছি দুজনে, তিনি বললেন : তোমরা গান করতে পার? আমি বললাম : একলা পারি না। দুজনে মিলে পারি। তা বললেন : গাও দুজনে। তা এমন একটা গান গাইলাম যে, ওঁর পছন্দ হল না।

।কোন। গানটা গাইলেন, মহারাজ?

মহারাজ : রজনীকান্তের—"পাতকী বলিয়ে কি গো পায়ে ঠেলা ভাল হয়?/ তবে কেন পাপী-তাপী এত আশা করে রয়।" আসলে ঠাকুর পাপী-তাপী বলা পছন্দ করতেন না। সেটা তখন আমাদের মনে ছিল না।

তারপরে কী গাইলেন?

মহারাজ : মনে নেই, কী একটা আনন্দের গান গেয়েছিলাম। হতে পারে—"এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর।/ পুণ্য হলো অঙ্গ মম, ধন্য হলো অন্তর।"

-আপনারা যখন মাস্টারমশায়ের কাছে গিয়েছিলেন, তিনি কি ঐ মর্টন স্কুলের ওপরেই থাকতেন?

মহারাজ : প্রথমে যখন গেছি তখন উনি প্রাইমারি সেকশনের একটা বাড়িতে থাকতেন। তাছাড়া মঠে যোগ দেওয়ার পরেও গেছি। আবার যখন গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে কথামৃত ভবনে থাকতেন, তখনো গেছি।

—আপনারা যখন যাতায়াত করতেন, তখন 'শ্রীম-দর্শন'-এর লেখক নিত্যাত্মানন্দজী ওখানে থাকতেন?

মহারাজ : না। নিত্যাত্মানন্দ তখন থাকতেন না। উনি মাস্টারিও করেছেন—দেওঘরে। দেওঘর থেকে এখানে এসে ব্রহ্মচারী হয়েছেন।

—আমাদের সংঘেই তো ছিলেন প্রথমে। তাহলে কি ব্রহ্মচারী অবস্থাতেই তিনি মাস্টারমশায়ের কাছে চলে গিয়েছিলেন?

মহারাজ : না, সন্ন্যাসী হয়ে সংঘ ছেড়েছেন।

—অনেক লিখেছেন তিনি। মাস্টারমশায়ের কথাবার্তা—

মহারাজ : খুব খুঁতখুঁতে লোক ছিলেন।

—আপনারা সাধু হওয়ার পর যখন মাস্টারমশায়ের কাছে যেতেন, তখন তিনি পছন্দ করতেন?

মহারাজ : তখন খেতে দিতেন।

—তবে শুনেছি, সাধুদের খুব শ্রদ্ধা করতেন। মাধবানন্দজী গিয়েছিলেন, তার প্রসঙ্গ আছে।

মহারাজ : পুরনো সাধুরা সকলেই মাস্টারমশায়ের কাছে গেছেন। সাধু হওয়ার আগে আবার পরেও। সীতাপতি মহারাজ, অনঙ্গ মহারাজ গেছেন। ওখানে পড়েওছেন। তবে সত্যেন মহারাজ (আত্মবোধানন্দজী) মাস্টারি করেছেন।

—স্বামীজীও কিছুদিন বিদ্যাসাগরের স্কুলের বউবাজার ব্রাঞ্চে মাস্টারি করেছেন।

মহারাজ : করেছেন, কিন্তু কোন্ ব্রাঞ্চে তা জানি না। বিদ্যাসাগর একদিন মাস্টারমশাইকে বললেন : নরেনবাবুকে বলে দিও—সে আর এখানে না আসে। কে নাকি বলেছে, নরেন্দ্রনাথ ভাল পড়ায় না! স্বামীজী বললেন : কেন, আমি তো ভালই পড়াই! আচ্ছা, আর আসব না। তখন স্বামীজীর বাড়ির অবস্থা খুব কাহিল।

—মাস্টারমশায় তখন খুব সাহায্য করেছেন?

মহারাজ : বেশি নয়।

—মাঝে মাঝে নাকি বেনামে টাকা পাঠাতেন।

মহারাজ : তা হবে।

—কথামৃতে আছে যে, মাস্টারমশায় তাঁকে একশো টাকা দিয়েছেন। তিন মাস চলবে ওতে। এখন এদিক সামলে ভগবানের ধ্যান করতে পারবেন।

॥ ৫৬ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ! বিহারে, অরুণাচলে পাদরিরা সাধারণ মানুষের মধ্যে খ্রিস্টধর্ম খুব প্রচার করছে।

মহারাজ : আমরা ছেলেবেলায় দেখতাম, মিশনারিরা বাড়িতে আসত। যখন পুরুষরা বাড়িতে থাকবে না, সেই দুপুরবেলা আসত। এলে একটু ভদ্রতা করে তাদের বসতে দেওয়া হতো। তারা চলে যেতে তো দিদিমা গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিত। যাই হোক, বসতে দিলে একটু পড়ে শোনাত।

একটু গান করত। তা একটা গান আমার মনে আছে—ওরে পাতকী, যিশুখ্রিস্ট পাপীর বন্ধু স্বর্গে যাওয়ার ভাবনা কী? (সকলের হাসি)

—তারা কি আমাদের এখানকার, মানে ভারতীয়?

মহারাজ : হ্যাঁ, Indian Christian। কখনো কখনো মেম-সাহেবও আসত। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকত আর বই দিত। আবার এটাও দেখতে পাই, যারা নিজেদের হিন্দু বলে—তাদের ভিতর কুসংস্কার ভর্তি। প্রচার করবে কী! তাদের জীবন যা, তা দিয়ে আর প্রচার চলে না।

—ঠাকুর বলেছেন, তাঁর অনুভূতি বেদ-বেদান্তকেও ছাড়িয়ে গেছে। বেদ-বেদান্তকেও অনুভূতি ছাড়িয়ে যাবে?

মহারাজ : যাবে না? বেদ যতটুকু বলতে পারে, তার পরেও অনেক বাকি থাকে। "তত্র বেদা অবেদা ভবন্তি।"

—অনুভব তাহলে বেদের পারে?

মহারাজ : হ্যাঁ, বেদের পারে। কারণ, সেটা মুখে বলা যায় না। 'মূকাস্বাদনবৎ'। নেতি নেতি করে বেদ পথনির্দেশ করে।

—মহারাজ, তপস্যা কত রকমের আছে? সাত্ত্বিক তপস্যা, রাজসিক, তামসিক...

মহারাজ : আবার ঠাকুরের তপস্যা আছে। ভক্তির তম—মারো কাটো লোটো। তপস্যার ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছে : "সহনং সর্বদুঃখানাম-প্রতীকারপূর্বকম্।/ চিন্তাবিলাপরহিতং সা তিতিক্ষা নিগদ্যতে॥" (বিবেকচূড়ামণিঃ-২৫)—তাকে বলে তিতিক্ষা।

—মহারাজ, আমরা যে-আশ্রমে থাকি—সেখানে তপস্যা কিভাবে করতে পারি? এখানে থেকে কি আমাদের তপস্যার জীবন হয় না?

মহারাজ : হয়। যেমন ঘরে বসেও সন্ন্যাস হয়—সেইরকম। আসলে পরিচিত পরিবেশের ভিতরে থাকলে পুরো তপস্যা হয় না।

—আপনি একদিন বলেছিলেন, তপস্যা মানে হল উচ্চ একটা আদর্শলাভের জন্য কৃচ্ছ্রসাধনা। তা আমরা এখানেও কৃচ্ছ্রসাধনা করতে পারি তো?

মহারাজ : হ্যাঁ, যেমন খ্রিস্টানদের আছে—Fasting Day, একদিন। মানে সেদিন Meatless Day! (সবার হাসি)

—ঠাকুর যাকে বলতেন কৃষ্ণকিশোরের একাদশী!

মহারাজ : আমরা যখন উত্তরকাশীতে—ছত্রতে একাদশীর দিনে অন্ন দিত না। তবে রামধনেকা হালুয়া দিত। আমি আর শক্তি মহারাজ একজায়গায় থাকতাম। তা দুজনের ভিতরে একজন ভিক্ষায় যেতাম alternate day-তে। একজন একাদশীতে যা দেয় তা পেল, আরেকজন সাধারণ রুটি-ডাল যা দিল, পেল। ওখানে একাদশীটা ঐচ্ছিক, compulsory নয়।

—মহারাজ, বললেন যে, পরিচিত পরিবেশে থেকে তপস্যা সম্ভব হয় না। মঠ-মিশনের যেখানেই আমরা থাকি না কেন, সে তো পরিচিত পরিবেশ হয়ে যায়।

মহারাজ : এজন্যই মাঝে মাঝে একটু অন্যত্র যাওয়া।

—সে তো, ৫-১০ বছরে একবার। প্রতিবছরে ছুটি নেওয়া সম্ভব হয় না।

মহারাজ : তা কী করবে বল! আমাদের পরিবেশ এইরকম।

—তাহলে centre পরিবর্তন হওয়াই ভাল।

মহারাজ : তাতে লাভ হয় না। যেখানেই যাবে সেটা আমাদের centre।

—মহারাজ, তপস্যাটা compulsory করা যায় না?

মহারাজ : না, তাতে হিতে বিপরীত হবে। যারা যেতে চায় তাদের কখনো কখনো দেওয়া ভাল—তবে কাজের বিঘ্ন না করে।

—এখানেই তো সমস্যা, মহারাজ।

মহারাজ : ঐ যে বলেছিলাম, উত্তরাখণ্ডে দেখেছি—একজনের কলেরা হল বলে সেখানকার এক সাধু তাকে ফেলে পালিয়ে গেল। কেন? না, বিক্ষেপ হোতা হ্যায়! তা আমরা তো ঐরকম 'বিক্ষেপ হোতা হ্যায়' বলে পালিয়ে যেতে পারব না। আর এইসব আশ্রম তো আমাদের ঘর। এইজন্য এখানে থেকে তপস্যা হয় না। কারণ তপস্যা মানে, যেখানে পরিচিত কেউ থাকবে না, ঘণ্টা বাজলেই খাবার জুটবে না। এরকম জায়গায় যাওয়া ভাল।

অর্থাৎ নিরালম্ব জীবন।

মহারাজ : ওটা আবার কঠিন। নিরালম্বটা বড় কঠিন। ছত্রের অন্ন তো নিরালম্ব নয়। গেলেই পাওয়া যাবে। ওটা মাঝামাঝি আর কি!

আমরা পরিচিত জায়গাতেই যদি বিলাসিতা বর্জন করে জীবনযাপন করি, সেটাও কি এরকম তপস্যা হবে না?

মহারাজ : এক হিসাবে হবে। আরেক হিসাবে নয়। এই যে পরিচিত পরিবেশ—এইজন্য নয়।

—মহারাজ, পরিচিত পরিবেশে ভগবানকে ডাকার পক্ষে প্রতিকূল কেন হয়? ভগবানকে ডাকা নিয়েই তো কথা।

মহারাজ : কারণ, ঐ জায়গার সঙ্গে মনটা জড়িয়ে থাকে। এইজন্য ভগবানের ওপর পুরো মনটা দেওয়া যায় না।

—কিন্তু আশ্রমের কাজ তো ঠাকুরেরই কাজ।

মহারাজ : ঠাকুরের কাজ তো বটেই। তাহলে আর ঝগড়া করি কেন? (হাসি)

—ঝগড়া না করে যদি সেই তপস্যার ভাবে এখানে থেকে করতে পারা যায়—

মহারাজ : তা পারা যায়। কিন্তু তপস্যা বলতে আমরা যা বুঝি, সেরকম হল না।

—তাহলে মহারাজ দেখা যাচ্ছে, তপস্যার আদর্শ আর সংঘজীবনের আদর্শের মধ্যে একটা বিরোধ হয়ে যাচ্ছে।

মহারাজ : না, দুটোকে মিশিয়ে কর। মাঝে মাঝে আশ্রমে থেকে করলে, মাঝে মাঝে গেলে। মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে তো তাই বলেছিলেন। খুব উৎসাহ দিয়েছিলেন যাওয়ার জন্য। আমার উৎসাহ অনেক বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু বলে দিলেন—দেখ, আবার এসে এখানে থাকবে, ঠাকুরের কাজ করবে। আমাদের এই আদর্শ। তপস্যার একটা ভাব মনে থাকা ভাল। সুযোগ পেলেই যাব—এই।

—ছুটির ব্যাপারটা মহারাজ আপনার হাতে থাকলে ভাল।

মহারাজ : এখন ছুটি দিলে শুধু ছুটোছুটি করবে। তখনো ছুটিও ছিল না, ছুটোছুটিও ছিল না। জান তো, তিনরকম সাধু আছে—হটুরে, মঠুরে আর বাস্তু। হটুরে মানে হেঁটে বেড়ায়। মঠুরে মানে মঠ থেকে যায় না। আর বাস্তু মানে গৃহস্থ বাড়িতে থাকে। (সকলের হাসি)

—আমাদের তো ধারণা, আমরা ঠাকুরের কাজ করছি, এভাবেই আমাদের হবে। কিন্তু আপনি যা বললেন, তাতে তো আমরা একটু শঙ্কিত হয়ে পড়লাম।

মহারাজ : ঠাকুরের কাজ করছি—একথা শুধু মুখে বললে হবে না। মনে যদি এ দৃঢ় ধারণা থাকে, তাহলে হবে।

—তা, আমরা কিভাবে test করব?

মহারাজ : রাগ-দ্বেষ থাকবে না; লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয়—এতে সমদৃষ্টি থাকবে। আমি কর্তা—এই বোধ থাকবে না।

—এগুলোর জন্যও কি ঐরকম বাইরে গিয়ে তপস্যার প্রয়োজন আছে?

মহারাজ : যার পক্ষে যেটা অনুকূল হয়, করবে।

—স্বামীজী তো খুব জোর দিয়েছেন কর্মযোগের ওপর।

মহারাজ : আচ্ছা, স্বামীজী নিজে কী করেছেন, দেখ। স্বামীজীর জীবনে চারটি যোগেরই সমন্বয় পাওয়া যায়। অন্যদের ক্ষেত্রে ততটা নয়। স্বামীজী বলেছেন, এই চারটি যোগের যেখানে সমন্বয় হবে সেটাই হচ্ছে perfect। আর perfect আমরা তো নই। আমরা চেষ্টা করছি যেকোন উপায়ে সেই perfection-এ পৌঁছাতে। স্বামীজী একথাও বলেছেন, এর মধ্যে যেকোন একটা হলেও চলবে।

—কিন্তু, সমন্বয়টাকে তিনি আদর্শ বলেছেন।

মহারাজ : হ্যাঁ, তা তো বটেই। শ্রীরামকৃষ্ণ কি আর ঘরে ঘরে হবে? স্বামীজী নিজেই তো বলেছেন, তোরা কি ভেবেছিস, সব এক-একজন রামকৃষ্ণ হবি? সে সাত মন তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না।

—এই সংঘ কি সকল সাধককে স্থান দিতে পারে?

মহারাজ : যারা আসবে ঠাকুরকে আদর্শ বলে মনে করে—তাদের সংঘে স্থান হবে না?

কেউ যদি বলে অন্য কোন মতে সাধনা করব, তাহলে কি এখানে করতে পারবে?

মহারাজ : কী মতে?

—যেমন খ্রিস্টান মতে।

মহারাজ : তা খ্রিস্টান মতে দোষ কী হল? খ্রিস্টান মতের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য কোন্‌খানে? যদি সংঘের সাধারণ নিয়মগুলো মেনে চলে তাহলে হবে।

—সাধারণ নিয়মগুলো মেনে চলার পরেও যদি কেউ কিছু অসাধারণ করতে যায়?

মহারাজ : দেখতে হবে সেটা practical কিনা। সংঘে কতকগুলি নিয়ম আছে; যাতে অপরের অস্বস্তি না হয়, এমন করে করতে হবে।

—অন্য কেউ অস্বস্তি বোধ করলেও কিন্তু যে করতে চাইছে তার কাছে তো সেটাই সাধনা।

মহারাজ : না, অপরকে উত্যক্ত না করে আমাদের সাধনা করতে হবে। সাধনার মূল কথাগুলো তো থাকবে। সেগুলো বাদ দিলে হবে না। তাছাড়া adjustment করতে হবে।

—কিন্তু মহারাজ, সাধনার প্রক্রিয়া তো এক এক ধর্মে এক এক রকম। হিন্দুধর্মের সাধক যেভাবে সাধনা করবে, একজন মুসলমান সাধক—

মহারাজ : যে-প্রক্রিয়াগুলি অপরের বাধার সৃষ্টি করবে না—সেরকম প্রক্রিয়া allowed।

—মহারাজ, কেউ যদি একটি ভাবে নিজেকে তৈরি করতে চায়, তাকে allow করা যাচ্ছে না। তাহলে আমাদের কাজ চলবে কী করে, সংঘ চলবে কী করে? স্বামীজী যে যেকোন একটিতেই হবে বলেছেন, সেটা তাহলে আমরা বাস্তবে রূপ দিতে পারছি না!

মহারাজ : আমরা যদি না পারি, সে আমাদের দোষ বলব। তা বলে আদর্শকে খাটো করব না। আমাদের দুর্বলতা আমরা স্বীকার করব। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও যোগ—by one or more, or all—এই কথা স্বামীজী বলেছেন। তাতে সংঘের ভিতরে কোন বাধার সৃষ্টি হচ্ছে না। সংঘ মানেই give and take। সকলকে যদি পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হয়, তাহলে সংঘ দাঁড়ায় না।

—বরানগর মঠে কালী মহারাজ খুব পড়াশোনা করতেন, কোন কাজ করতেন না। কেউ এই নিয়ে অনুযোগ করলে স্বামীজী বলছেন : ও পড়াশোনা করুক। তোদের কত হাণ্ডা আছে নিয়ে আয়—আমি মেজে দিচ্ছি। অর্থাৎ স্বামীজী allow করছেন।

মহারাজ : তা করছেন। কিন্তু অভেদানন্দ স্বামী যদি বলতেন, আমি তন্ত্রমতে সাধনা করব, তাহলে?

—স্বামীজী চারটে যোগের কথা বলেছেন। তার যেকোন একটা—

মহারাজ : চারটে যোগের ভিতর কি হাণ্ডা মাজা নেই?

—না, সেটাই কালী মহারাজ করতেন না বা পড়াশোনায় এত ব্যস্ত থাকতেন যে, অন্যেরা গুঞ্জন করলে স্বামীজী বলেন যে, নিয়ে আয় আমি করে দিচ্ছি।

মহারাজ : স্বামীজী উদার ছিলেন, তাই বললেন।

—মহারাজ, আপনি বলছেন এটা হচ্ছে আদর্শ। আর এদিকে আমরা practice-এর ক্ষেত্রে বলছি, আমাদের দুর্বলতা। দুটোর মধ্যে তাহলে সামঞ্জস্য হচ্ছে কী করে?

মহারাজ : আদর্শকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে না পারাটা দুর্বলতা।

—তাহলে সে-আদর্শকে গ্রহণ করার চেষ্টা করা প্রয়োজন।

মহারাজ : হ্যাঁ, চেষ্টা মনে মনে করবে—সংঘকে আঘাত না করে। সকলেই যদি পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়, তাদের দিয়ে সংঘ হয় না। লাটু মহারাজ সংঘভুক্ত ছিলেন, যদিও সংঘের সব নিয়ম মানতেন না, নিজের মতো

থাকতেন। কিন্তু যদি আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা না করতাম, তাতে আদর্শকে খর্ব করা হতো। আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা করি।

—তবে স্বামীজীর কাজকে লাটু মহারাজ খুব শ্রদ্ধা করতেন। বলতেন—লোরেন ভাই ভাল করেছে।

মহারাজ : স্বামীজী লেখাপড়ায় খুব উৎসাহ দিতেন। পড়াশুনা করতে বাধ্য করলেন সকলকে। কৃষ্ণলাল মহারাজ বললেন—আমার লেখাপড়া ভাল লাগে না। স্বামীজী বললেন—তোর কী ভাল লাগে? বললেন—আমার জপ করতে ভাল লাগে।—তুই জপ কর। এই হল স্বামীজীর উদারতা। এখন, সবাই যদি জপ করে তো রান্না করবে কে!

॥ ৫৭ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, আপনি একদিন বলছিলেন—মনের তপস্যাই তপস্যা। এটা কী করে হতে পারে মহারাজ?

মহারাজ : মনেতে বিলাসিতা অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা—কাম-কাঞ্চনের আকাঙ্ক্ষা না থাকা। এটাই তপস্যা।

—আপনি একবার বলেছিলেন, কামনা-বাসনা ত্যাগ করাই মনের তপস্যা। গীতায় (১২।১৯) আবার বলেছে—"তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।/ অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ।।" মান-অপমান, সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি থেকে দূরে থাকা—এইগুলিকেই বলা হচ্ছে মানস তপস্যা। মহারাজ, কামনা-বাসনা ত্যাগ করলেই কি এগুলি হবে?

মহারাজ : কামনা-বাসনা ত্যাগ করলে তো সব হয়েই গেল। "কাঞ্চন কামাৎ কাময়তে।"

—মা বলেছেন, তোমাদের মনের তপস্যাই তপস্যা; এখানে শরীরের তপস্যাটা কী?

মহারাজ : ছেলেদের কষ্ট মা দেখতে পারতেন না।

—শরীরের তপস্যা যদি না থাকে তাহলে তো, স্বামীজী যেরকম বলছেন, বিলাসিতা এসে সংঘকে গ্রাস করবে।

মহারাজ : আমাদের আর কী বিলাসিতা আছে বল। ঠাকুর বলছেন, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগই হল ত্যাগ।

—কী করে মাপব মহারাজ, কোন্‌টা বিলাসিতা আর কোন্‌টা কঠোরতা?

মহারাজ : এটা মনের ওপরে নির্ভরশীল। মন যদি এতে আগ্রহী না হয়, তাহলে উদাসীন থাকলেই হল।

—আসলে মহারাজ, কিছুদিন থাকলেই তার প্রতি একটা আগ্রহ এসে যায়।

মহারাজ : তাহলে গা সইয়ে নাও। একটা দৃষ্টান্ত বলছি শোন—আমাদের আগে motor ছিল না। আমি বেলুড় মঠে থাকতে প্রথম motor কেনা হল। ছোট। তারপর Fiat। তারপরে Ambassador। তারপরে হল Contessa, এখন Mercedes।

—এগুলো যে বেড়েছে বা এসেছে, তা তো বিচার-বিশ্লেষণ করে করেই হয়েছে।

মহারাজ : তখন মনে হয়েছিল, এটা প্রয়োজন।

—এটা একজনের খেয়াল তা তো বলা যাবে না।

মহারাজ : না, একজনের নয়—সমস্ত সংঘেরই। আর সেটা যে প্রয়োজন, তা সেসময়ে তো সকলে স্বীকার করেছেন। আমাদের আগেকার দিনে যেটা বিলাসিতা ছিল, এখন সেটাই মনে হয় চূড়ান্ত কৃচ্ছ্রসাধনা। আর এখন যেটাকে বিলাসিতা মনে করছি, দুদিন পরে সেটাই কৃচ্ছ্রসাধনা হয়ে যাবে।

—তাহলে আদর্শের দিক থেকে কি আমাদের ঘাটতি হচ্ছে না?

মহারাজ : না, যে-সমাজে আমরা বাস করি তাতে যে পরিবর্তন এসেছে, আমরা সেটা খেয়াল করিনি।

—আপনারা যখন প্রথম মঠে আসেন, তখন মঠের অবস্থা যেমন দেখেছেন, আর এখন যেরকম দেখছেন—এর মধ্যে তপস্যার তফাত কতটা? সেটা কি কমে গেছে?

মহারাজ : না, তখন যে-standard ছিল, এখন আমাদের কাছে সেটা অসহ্য। আবার এখন যে-standard-এ আছ, ভবিষ্যতে সেটা কারো কারো কাছে অসহ্য হবে। তপস্যা তো মনের ব্যাপার। এটা সমাজের পরিবর্তন অনুসারে হবে। এই জন্যে ধীরে ধীরে তার পরিবর্তন আসবে।

—সমাজ তো তার নিজস্ব একটা আদর্শ অনুসারে চলছে। কিন্তু আমরা তো ত্যাগ ও সেবার আদর্শের জন্যেই এখানে এসেছি।

মহারাজ : আদর্শ তো মনে, সেটা বাইরে নয়। দেখ, আগে আমরা যেটাকে বিলাসিতা মনে করতাম, এখন সেটাকে প্রয়োজন বলেই মানি। কাজেই এটা মনের ব্যাপার।

—এতে সাধুজীবনের আদর্শের সঙ্গে কি সংঘাত হচ্ছে না?

মহারাজ : না, তা ঠিক বলতে পারব না। কারণ, যে-সমাজে আমরা বাস করি, তার সঙ্গে তুলনা করে দেখতে হবে তো! আগে আমাদের টেলিফোন করতে হলে মঠের কাছে মাড়োয়ারির বাগানে যেতে হতো। এখন টেলিফোনের জ্বালায় অস্থির!

—তা মহারাজ, আপনি যেটা বলেন—তপস্যা মানে কষ্ট সহ্য করা, তার standard পালটাচ্ছে বটে; কিন্তু মনের যে কষ্ট সহ্য করা, সেটা তো রয়েছে।

মহারাজ : তাই তো, তাহলে বোঝ। সেই কথাই বল। সংঘে আছ। কাজেই এটা দোষের নয়। সনাতন গোস্বামীকে ঠাকুর (শ্রীকৃষ্ণ) বললেন যে, ওরে আর শুকনো রুটি খেতে পারিনে। অন্তত যদি একটু নুন দেয়, তাহলেও হয়। সনাতন গোস্বামী শুনে বললেন—ঠাকুর, আজ নুন বলবে, কাল চিনি বলবে, ছানা আন বলবে। ও আমার দ্বারা হবে না। আমার এখানে এই। এই পোষায় তো থাক। দেখ, তখনকার দিনে আদর্শ কিরকম! ভগবান বলছেন, তাতেও চলবে না। তারপরে যখন ঠাকুরের ঐশ্বর্য হল, তখন বলছেন—ঠাকুর, তোমার ভোগ করার ইচ্ছে হয়েছে, তুমি থাক। আমি চললাম। তিনি চলে গেলেন ছেড়ে।

বাইবেলে একটা কথা আছে—"Thou seest evil because thine eyes are evil." যদি দোষদৃষ্টি না থাকে, তাহলে দোষ দেখতে পারবে না। বাচ্ছা ছেলে অপরের দোষ দেখতে পারে না। কারণ তার ঐ বোধই নেই। মহারাজ, এই যে বাচ্ছা ছেলে অপরের দোষ দেখতে পারছে না, এটা তার জ্ঞান না অজ্ঞান?

মহারাজ : অজ্ঞান।

—মহারাজ, ঠাকুর কথামৃতে বলেছেন—প্রথমে চাই নিষ্ঠা, তারপরে ভক্তি। তার পরে ভাব। ভাব পাকলে মহাভাব। মহাভাব পাকলে প্রেম। এখানে নিষ্ঠা-ভক্তি আর ভাব—এর পার্থক্যটা একটু বুঝিয়ে বলুন না—

মহারাজ : নিষ্ঠা মানে একটা ভাবকে ধরে থাকা, দৃঢ়তা। 'নিতরাং স্থিতি'। তাতে নিষ্ঠা। কোনকিছুতে নিষ্ঠা করে থাকলে তাতে ক্রমশ ভক্তি হয়। তার মানে, পূজ্য ভাব হয়, ভাল লাগে। ভক্তির পরে ভাব। ভাব মানে তন্ময়তা। এর পরে মহাভাব—এখানে ঠাকুর প্রেম শব্দটা ব্যবহার করেছেন।

—মহারাজ, আপনি বলছিলেন, প্রেম জীবকোটির হয় না। আবার স্বামীজী বলছেন : "জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।" তাহলে ঐ প্রেমটা কী? দুটো কিভাবে হয়?

মহারাজ : দেখ, context অনুসারে তার মানে হবে। এখানে প্রেম বলতে স্বামীজী mean করেছেন ভালবাসা। ভক্তি মানে তার সঙ্গে পূজ্য ভাব থাকবে। মা ছেলেকে প্রেম করে—একথাটা ব্যবহার হয় না। বলবে—স্নেহ করে।

—মহারাজ, নিষ্ঠা অনেক সময় গোঁড়ামিতে পরিণত হয়ে যায়। তাহলে কখন নিষ্ঠা থাকবে, কিন্তু গোঁড়ামি থাকবে না?

মহারাজ : এই যে ঠাকুর বলেছেন—আমারটাই ঠিক, আর বাকি সব ভুল—এর থেকে গোঁড়ামি আসে। ভগবানকে আমি যেভাবে আস্বাদন করছি, সেটাই যে একমাত্র আস্বাদনের পথ, তা নয়। এটা বুঝলে গোঁড়ামি আর থাকবে না।

—মহারাজ, অন্য ধর্ম বা পথেও যে সেই একই সত্য লাভ করা যায় তা ঠিক, কিন্তু সেটাতেও মন থাকলে যে-পথটা ধরে সাধনা করছি তার কি হানি হবে না?

মহারাজ : না, যদি মনে কর যে, অপরের পথ সম্বন্ধে আমি জানি না, কাজেই আমার তার সম্বন্ধে মন্তব্য করার কোন অধিকার নেই। কিন্তু ধরে থাকতে হবে নিজের পথটাকে। এটা ওটা করলে হবে না।

—মহারাজ, এই যে ধরে থাকার ব্যাপারটা যখন আসে, সবাই বলে ঠাকুরকে আঁকড়ে ধরে থাক; তখন মনে হয় যেন, আমাদের কি বাঁদরের ছানার মতো স্বভাব হল যে, আমরা আঁকড়ে ধরে থাকব?

মহারাজ : Context অনুসারে শব্দের অর্থ হয়।

—সবাই বলে তাঁর চরণ ধরে থাক, ছাড়বে না। আমি তো এখন ঠাকুরের পা ধরেছি, ছাড়ব না—

মহারাজ : সর্বনাশ! বেচারি বুড়ো মানুষের পা-টা ভাঙবে? (সকলের হাসি)

—আসলে তখন মনে হয়, আমি কি করে ধরব? আমার কি তাগিদ আছে? প্রভুই আমাকে ধরবেন। তখন ঐ বাঁদর-ছানা, বেড়াল-ছানার উদাহরণটা এসে যায় মাথায়।

মহারাজ : কথা হচ্ছে যে, তিনি সকলকে ধরে রয়েছেন। কিন্তু আমাদের দুঃখ যাচ্ছে না। তাঁকে ধরার উদ্দেশ্য আমাদের দুঃখ দূর করা। তাঁর স্বরূপকে বুঝে ফেলেছি, তা নয়; আমাদের দুঃখ দূর করতে হবে।

—ধরে থাকার মানে তো তাঁর ওপর নির্ভর করা?

মহারাজ : এ তো আরেক দিক দিয়ে কথা। নির্ভরতা একটা, ধরে থাকা আরেকটা। ধরে থাকা—আমার প্রযত্ন। নির্ভরতা—তাঁর ওপর নিজেকে ছেড়ে দেওয়া। কাজেই তফাত হয়ে যাচ্ছে না?

—নির্ভরও করতে হবে, আবার ধরেও থাকতে হবে?

মহারাজ : যে যেরকম পাত্র, তার সেরকম অর্থ হবে। যে সাধনায় অগ্রসর হয়েছে, সে নির্ভর করবে। আর যে সাধারণ প্রবর্তক, সে ধরে থাকবে।

মহারাজ, ঠাকুর বলছেন, এই চোখে তাঁকে দর্শন হয় না। সাধন করতে করতে প্রেমের চক্ষু হয়, তাতে তাঁর দর্শন হয়, এইটে কী মহারাজ?

মহারাজ : প্রেমের চোখ হয় মানে, মন প্রেমময় বা শুদ্ধ হয়। তখন ভগবৎ-শরীরের প্রতিকৃতি হয়। চোখ মানে যে-চোখ দিয়ে আমরা দেখি সেটা নয়। তাহলে সবাই তো ভগবানকে দেখত। তা তো দেখে না। আমরা তো ভগবান সম্বন্ধে এখনো নিঃসন্দেহই হতে পারছি না, দেখা তো দূরের কথা! আর দেখা মানে চোখ দিয়ে দেখা নয়। দেখা মানে অনুভব করা। চোখ দিয়ে দেখে যেমন দৃঢ় প্রত্যয় হয়, সেরকম যখন মনের দৃঢ় প্রত্যয় আসে, তাকেই বলে দেখা। ভগবান কি ভূত দেখার মতো নাকি?

—ঠাকুর যে স্বামীজীকে বলছেন—তোকে যেমন স্পষ্ট দেখছি, তার চেয়েও স্পষ্টতর দেখেছি।

মহারাজ : দেখা মানে অন্যরকম। নিজের চক্ষুর বিষয় হলে তা সকলেই দেখত। একটা গাছ দেখতে তো বিশেষ চক্ষুর দরকার হয় না। অন্ধলোকে দেখতে পায় না, বাকি সবাই দেখতে পায়। তা, ভগবান যদি ঐরকম বস্তু হতেন তাহলে সকলেই দেখতে পেত। তা তো নয়। উপনিষদ্ বলছেন, তাঁকে চোখ দিয়ে দেখা যায় না—"ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি" (কেনোপনিষদ্, ১।৩)।

॥ ৫৮ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, আপনার বদরীনারায়ণ-এ যাওয়ার ঘটনাটা একটু বলুন।

মহারাজ : এখান থেকে ট্রেনে গেলাম লক্ষ্ণৌ—ফার্স্ট ক্লাসে। প্রভু মহারাজ, ভরত মহারাজ, সেবক হরলাল আর দয়ানন্দজী। নিচের বার্থে প্রভু মহারাজ একটায়, আরেকটায় ভরত মহারাজ। ওপরের বার্থে হরলাল আর আমি। তা, হরলালও চড়তে পারে না, আমিও চড়তে পারি না। প্রভু মহারাজ আমাকে বলছেন : তুমি নিচে থাক, আমি ওপরে উঠছি। আমি বললাম—সেটা কী করে হয়! মনে মনে ভাবছি, লোকে

বলবে কী! তারপর চেষ্টা করতে করতে একবার উঠে পড়লাম। হরলালও কোনরকমে উঠে পড়ল। নামার সময় কিছুতেই সে আর নামতে পারছে না। আমার নামার সময় ততটা অসুবিধে হয়নি, নেমে পড়লাম। কিন্তু হরলাল তো আমার থেকে আরো স্থূল ছিল। সে আর নামতে পারে না। শেষপর্যন্ত ওপর থেকে ধুপ করে পড়ল। (সকলের হাসি)

—মহারাজ, লক্ষ্ণৌ থেকে ওখানে কী করে গেলেন?

মহারাজ : ওখান থেকে ট্রেনে গেলাম বিছিয়া। বিছিয়া বলে একটা স্টেশন আছে—টনকপুরের পথে। ওখানে রাত্রে গাড়িতে যেতে অসুবিধা হয় বলে ট্রেনে গেলাম। সেখানে গাড়ি অপেক্ষা করছিল। ওখানে ভোরবেলা নেমে গাড়িতে গেলাম।

—আপনারা কি আলমোড়া দিয়ে গিয়েছিলেন?

মহারাজ : হ্যাঁ, আলমোড়াতেও গিয়েছিলাম। রাত্রিতে একটা ফরেস্ট বাংলোতে ছিলাম। তা বলছে, এখানে ভালুক আছে। রাতে আমরা বাইরে এসেছিলাম—বারান্দায়। খুব গরম হচ্ছিল। রাত্রে আবার শুনছি, খট্‌খট্ করে শব্দ হচ্ছে। আমি ভাবছি, ভালুক তো খট্‌খট্ করে না। খট্‌খট্ করছে কে? তারপর দেখা গেল একটা গরু। (সকলের হাসি) তা, লোকজন গিয়ে গরুকে তাড়িয়ে দিলে। তারপরে ভিতরে ঢুকে গেলাম আর বাইরে নয়। খুব enjoy করেছি।

—সেবারই মায়াবতী গিয়েছিলেন?

মহারাজ : হ্যাঁ। ঘুরতে ঘুরতে টনকপুর হয়ে তারপরই গেলাম শ্যামলাতাল। শ্যামলাতাল থেকে মায়াবতী। মায়াবতীতে ১৫ দিন ছিলাম। মায়াবতী থেকে গেলাম আলমোড়া। আলমোড়া থেকে গোয়ালদাম হয়ে বদরীনারায়ণ। কর্ণপ্রয়াগে meet করলাম—মেইন রোডে।

—মহারাজ, বদরীনারায়ণ পর্যন্ত রাস্তা ছিল তখনো?

মহারাজ : খুব ভালই রাস্তা। তবে অনেক গাড়ি খাদে পড়ে যেত। আমাদেরটা পড়েনি। (হাসি)

—বাঘ দেখেছিলেন, মহারাজ?

মহারাজ : বাঘ? তাহলে কি আর ফিরে আসতুম! (সকলের হাসি)

—মায়াবতীতে বাঘ দেখেননি, মহারাজ?

মহারাজ : না না, কিচ্ছু দেখিনি। আমি অনেককে জিজ্ঞেস করেছি। তারা কেউই দেখেনি। সব শোনা কথা। শোনার মধ্যে কতটা সত্যি আর কতটা মিথ্যে তা জানি না। একটা গল্প আছে। একজন বলছে—আমি বাঘ দেখেছি। আমার থেকে তিন হাত দূরে।—বল কী? তিন হাত দূরে!—হ্যাঁ। আমি মুখ ভ্যাংচাচ্ছি, সেও মুখ ভ্যাংচাচ্ছে। এইরকম কিছুক্ষণ চলল। তারপরে আমি চলে গেলাম।—কী ব্যাপার? না চিড়িয়াখানার বাঘ। (সকলের হাসি) আমি উত্তরকাশীতে বাঘ দেখেছি, তবে গঙ্গার ওপারে। গঙ্গা ছোট সেখানে। তার ওপারে বাঘ। গঙ্গায় এত current যে, সে এপারে আসতে পারবে না। কাজেই নিরাপদে বাঘ দেখলাম। সে একটা ছাগলকে ধরেছিল। রাখাল ছেলেগুলো হৈহৈ করছে, তখনো ছাগলটি ছেড়ে সে কিন্তু ছুটে পালাচ্ছে না! আস্তে আস্তে যাচ্ছে আর পিছন ফিরে তাকাচ্ছে। জিবে মুখটা চাটছে। রক্তের স্বাদ পেয়েছে তো!

—মহারাজ, অমরনাথেও তো গিয়েছিলেন?

মহারাজ : হ্যাঁ গিয়েছিলাম। তবে সেবারে নয়, অন্য সময়ে। তখন যোগোদ্যানে আছি। প্রভু মহারাজের অমরনাথে যাওয়া হয়নি। একবার রওনা হয়েছিলেন অমরনাথে যাবেন বলে। তা, করণ সিংহের মা বলছেন— মহারাজ, আমার একটি অনুরোধ আছে। আপনারা অমরনাথে যাবেন না। বড্ড কষ্ট, বিপদ। যাবেন না। তাঁর কাছে এমন মিনতি করে বললেন যে, মহারাজ ফিরে এলেন, আর গেলেন না।

—গম্ভীরানন্দজী মহারাজ গিয়েছিলেন?

মহারাজ : হ্যাঁ, তিনি গিয়েছিলেন।

—যখন আপনি প্রথম তপস্যা করতে উত্তরকাশী গিয়েছিলেন, তখন কেদার-বদরী গিয়েছিলেন?

মহারাজ : না, সেবার গঙ্গোত্রী গিয়েছিলাম। উত্তরকাশী থেকে গঙ্গোত্রী কাছে—মাত্র ৫৬ মাইল। প্রথম বছর যাইনি। তারপর শক্তি

মহারাজ ঘুরে এসে বললেন : আপনি যান, ঘুরে আসুন, দেখবেন আনন্দ হবে।

প্রশ্ন : শুনেছি, আপনি মুকুন্দ দাসকে দেখেছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলুন।

মহারাজ : মুকুন্দ দাস স্বামীজীর মতো মাথায় পাগড়ি বেঁধে যাত্রা করতেন, গান গাইতেন। গ্রিনরুম থেকে বেরিয়ে স্টেজে আসছেন। 'সাবধান! সাবধান!'—এইরকম করে আরম্ভ করলেন, গলা ছিল ভীষণ। গানের একটা কলি বলতে বলতে আসতেন। লোকে ঘাবড়ে যেত। উদ্দীপনীয় তাঁর কথাগুলি। দেশাত্মবোধক গান গাইতেন।

—মহারাজ, গুরুবাদ বিষয়ে কোন প্রথা আছে কি?

মহারাজ : একটা গল্প বলি শোন। যখন আমি উত্তরকাশীতে ছিলাম, তখন একদিন এক সাধু একজন অল্পবয়সি সাধুকে এক গ্লাস জল আনতে বলল। উত্তরে অল্পবয়সি সাধুটি বলল : না, আমি পারব না। প্রথমজন জিজ্ঞাসা করল : আরে কী ব্যাপার, আমি কি তোমার গুরু নই? তখন ছোট সাধুটি বলল : কী আশ্চর্য! আপনি তো মাত্র একটি শ্লোক শিখিয়েছেন আমাকে আর তাতেই আপনি গুরু হয়ে গেলেন? (উচ্চ হাসি) এই হচ্ছে পারস্পরিক সম্পর্ক। তাই দেরাদুনের গুরুদোয়ারার মোহন্ত মহারাজ আমাদের একজন সাধুকে বলেছিলেন : স্বামীজী, কভি চেলা নেহি বনানা। চাক্কু মারেগা। (সকলের হাসি) খবরদার শিষ্য তৈরি করো না। কারণ, পদের লোভে তারা আপনাকে ছুরি মারবে।

—ঠাকুর বলছেন, সচ্চিদানন্দই একমাত্র গুরু। এর মানে কী?

মহারাজ : এটাই রীতিসম্মত। কারণ, সচ্চিদানন্দকে তো সেবা করা যায় না। (উচ্চ হাসি) নিজেকে কখনো গুরু বলে ভাবতে নেই। একমাত্র সচ্চিদানন্দই গুরু। তাঁর প্রয়োজনে তুমি শুধুমাত্রই একটি মাধ্যম।

—স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণকে কী বলতেন?

মহারাজ : পরমহংসমশাই। যেখানেই তাঁরা ঠাকুরের কথা বলতেন, তাঁকে পরমহংসমশাই বলেই সম্বোধন করতেন।

—কবে থেকে 'গুরু মহারাজ' বলা শুরু করলেন?

মহারাজ : বলা মুশকিল। আমি ইতিহাসটা ঠিক জানি না।

—স্বামীজীই শুরু করেছিলেন, মহারাজ?

মহারাজ : সন্দেহ রয়েছে।

—বরাহনগর মঠে যখন আরতি হতো তখন তাঁরা সব 'জয় গুরু মহারাজ', 'জয় গুরু মহারাজ' বলতেন।

মহারাজ : তা তো হতো। কিন্তু আরম্ভ কে করল সেটা তো জানা নেই।

—তাঁরা ঠাকুরের মধ্যে গুরু এবং ইষ্ট উভয়কেই দর্শন করতেন।

মহারাজ : এবং সখারূপেও। বন্ধু, তত্ত্বদর্শী, পথনির্দেশক, ঈশ্বরের অবতার ইত্যাদিরূপেও দেখতেন। ঠাকুরের মধ্যে অলৌকিক শক্তির তেমন কোন বহিঃপ্রকাশ ছিল না। তিনি কোন রোগ ভাল করতে পারতেন না। কাউকে এমন বর দেননি যাতে সে সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে। মাঝে-মাঝেই তিনি সমাধিস্থ হতেন। কিন্তু সেটাও একটা বিচিত্র পন্থায়। ভাগবতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যায়, একজন মানুষ যিনি সমাধিপ্রবণ তিনি নিজেও জানেন না কী হচ্ছে। তিনি চিৎকার করে উঠলেন, ভাবছেন—পড়ে যাবেন। কিন্তু পড়লেন না। কারণ এটা সমাধি। ভক্তেরা প্রথমে ভাবতেই পারেননি যে, এটা হল সমাধি। তাঁরা ভাবতেন, এটা এক ধরনের অস্বাভাবিক আচরণ।

—মহারাজ, ঠাকুর কৃষ্ণকিশোরের কথা বলে বলতেন যে, ভক্তের দেহ চিন্ময়। এর মানে কী?

মহারাজ : ঐ যে হলধারী বলেছিল—কী দেখতে যাব—মাটির খাঁচা! তাইতে চটে গিয়ে বলেছিলেন—সে জানে না, ভক্তের দেহ চিন্ময়? এতে একটা পূজ্য ভাব আছে। চিন্ময় মানে—ব্রহ্মকে যেমন বলা হয় চিন্ময়, সেরকম চিন্ময় নয়। তার তো স্থূলদেহ আছে।

—তার দেহটা চিন্ময়, তা চৈতন্য দিয়ে তৈরি হতে পারে না?

মহারাজ : না, তা বলা যায় না।

—মহারাজ, স্বামীজীও বলছেন, 'চিদ্‌ঘনকায়'।

মহারাজ : ঠাকুরের কথা আলাদা।

—সেখানে কী অর্থ হবে, মহারাজ?

মহারাজ : দেহটাই চিদ্‌ঘন—চৈতন্যময়। সচ্চিদানন্দ দেহধারণ করে এসেছেন।

—চৈতন্য দেহধারণ করে এসেছেন, চিদ্‌ঘনকায় মানে চৈতন্য ঘনীভূত হয়ে শরীর হয়েছেন?

মহারাজ : হ্যাঁ, তাই।

—আরেকটি কথা মহারাজ। ঠাকুরের আরাত্রিক স্তবে পাশাপাশি দুটি গুণের কথা রয়েছে—নির্গুণ গুণময়। নির্গুণও তিনি, গুণময়ও তিনি। তিনি সত্ত্ব, রজ, তমোগুণের অতীত, অথচ গুণগুলি তাঁকেই আশ্রয় করে আছে। এটা কিভাবে সম্ভব?

মহারাজ : গুণময় মানে গুণের বিকার নয়। সর্ব সদ্‌গুণ-সম্পন্ন।

—ঠিক। এইটাই মনে করছিলাম। কৃন্তন কলিডোর। কলি—

মহারাজ : কলিডোরকে যিনি কেটে দেন। কলির বন্ধনকে যিনি কেটে দেন। কলিযুগে মানুষের যে অধোগতি—সেটা কেটে দেন।

—আচ্ছা। 'তুমি তমোভঞ্জনহার' মানে?

মহারাজ : তমোভঞ্জন বললে যা বোঝায়, হার বললেও তাই বোঝায়। ওটা হিন্দিতে প্রচলিত আছে। 'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।' তার ওপর সমস্ত বস্তু প্রকাশিত হচ্ছে। প্রকাশস্বরূপ তিনি। প্রকাশক নয়—প্রকাশস্বরূপ। শ্রবণ তো অনেক হয়ে গেছে। "শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ। ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীব ব্রহ্মৈব নাপরঃ।।" এও তো হয়ে গেল। আধ শ্লোকেতে সব কথা বলা হয়ে গেল। কূট তর্ক নয়। সহজ সরল তত্ত্বটাকে বোঝাতে মানুষ অনেক কথা বলে। দেখতে হবে, আমরা বুঝতে চাই, না তর্ক করতে চাই। এইটা দেখতে হবে আগে। বুঝতে চাই যদি, তাহলে মনন করতে হবে। শ্রবণ অনেক হয়েছে, মনন হয়নি। তার পরে নিদিধ্যাসন। এই মননের পর্যায়ে পড়বে অনেক গ্রন্থ। তখনকার দিনে তো অনেক গ্রন্থ মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। এখন সেটা ছাপা হয়ে বেরিয়ে গেছে এবং কিছু

তাতে অর্থাগমও হচ্ছে। তবে তাতে নিজে চিন্তা করার শক্তি হারিয়ে ফেলছি। অপরের চিন্তাগুলোকে পড়ায় নিজের চিন্তাশক্তি কমে যাচ্ছে। আগে মানুষ অপরের চিন্তাগুলো কম পড়ত, নিজে চিন্তা করত।

॥ ৫৯ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, আপনার প্রথম দক্ষিণেশ্বর দর্শনের কথা কিছু বলুন।

মহারাজ : সে তো অনেকদিন আগের কথা। সে কী মনে আছে আমার! তবে এইটুকু মনে আছে, বাগবাজার থেকে হেঁটে দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলাম। সেসময় হেঁটেই যেতাম। হেঁটেই ফিরতাম।

—কোন্ সাল মনে আছে?

মহারাজ : না। সালটাল মনে নেই। তবে আন্দাজ একটা করতে পারি। হয়তো ১৯১৬ বা ১৭।

—যদিও আগে কখনো-সখনো আপনার মুখে এসব শুনেছি, কিন্তু আবারও শুনতে ইচ্ছা করে। কেননা আপনিই বলেন, ভাল প্রসঙ্গের পুনরুক্তিতে দোষ হয় না—শাস্ত্রে আছে।

মহারাজ : আসলে, কথাটা হল—শাস্ত্রেষু ন জামিতা অস্তি। শাস্ত্রের কোন আলস্য নেই। তাই একই কথা বারবার বলেছে, যাতে মনের ভেতরে ঢুকে যায়—কথাগুলো অন্তরে বসে যায়। এই পুনরুক্তি অন্য জায়গায় দোষের হবে, কিন্তু শাস্ত্রে নয়।

প্রশ্ন : মাইসোর স্টাডি সার্কেলের কথা যদি একটু বলেন।

মহারাজ : ওখানে আমার যাওয়াটা একেবারে আকস্মিক। কারণ, আমি ঢাকা থেকে স্বামী শুদ্ধানন্দজীকে লিখলাম যে, আমি তপস্যায় যেতে চাই। যদি আপনি অভয় দেন তো মঠ হয়ে যাব। তিনি অভয় দিয়ে বললেন : "তুমি এখান হয়েই যাবে। নির্ভয়ে এস।" তখন মঠে এলাম। যাব তপস্যায়। তিনি বললেন : "দেখ। তপস্যায় গেলে যা করবে সেইরকমই অনুকূল একটা পরিবেশে তোমাকে পাঠাতে চাই। মাইসোরে একটি স্টাডি সার্কেল হচ্ছে, তা প্রথমে ভাল ছাত্র পাঠাতে হবে যাতে

impression-টা তাদের ভাল হয়। তো, সেখানে তোমার কাজ হবে পঠন-পাঠন। পড়বে, পড়াবে, তপস্যা করবে—আর কোন কাজই নেই।” আমি ভাবলাম, মন্দ নয়। তপস্যার একটা ভাল বিকল্প পাওয়া গেল। বললাম—আচ্ছা, যাব। তারপর গেলাম। সেখানকার অধ্যক্ষ ছিলেন সিদ্ধেশ্বরানন্দ স্বামী। তিনি আমাদের সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করতেন, যদিও আমার চেয়ে একটু বড়। কাজেই ভালই লাগল।

—ওখানে কতদিন ছিলেন?

মহারাজ : দেড় বছর। ভাল মেধাবী ছাত্র কিনা, দেড় বছরেই পাঠ সমাপ্ত! সমাপ্ত মানে কী, স্টাডি সার্কেল একেবারে উঠেই গেল। সেখানে প্রধান কাজ হল—ভি. সুব্রহ্মণ্য আয়ার—আমরা তাঁকে ‘Uncle’ বলতাম—তাঁর কাছে গিয়ে Philosophy শোনা। তাঁর Philosophy-র basis হল মাণ্ডূক্যকারিকা। তিনি সংস্কৃত তেমন জানতেন না বলে আমার ওপর ভার পড়ল, মাণ্ডূক্যের শ্লোক ইংরেজিতে অনুবাদ করে দেওয়া। তারপর discussion হবে। Discussion-এর সময় তাঁর সাথে আমার মতদ্বৈধ হতো। তিনি শঙ্করের নাম করে ‘কুম্ভকর্ণ দর্শনম্’ চালাতেন। কুম্ভকর্ণের যেমন ঘুমিয়ে থাকাই জীবনের উদ্দেশ্য—সেইরকম uncle বলতেন, সুষুপ্তি আর সমাধিতে কোন তফাত নেই! সুষুপ্তিতে মনের লয় হয়, সমাধিতেও মনের লয়। সুতরাং কোন তফাত নেই। আমি তার প্রতিবাদ করতাম। কিন্তু সে-প্রতিবাদে কোন কাজ হতো না। তিনি এত দৃঢ়প্রতিষ্ঠ আপনার সিদ্ধান্তে যে, আর তাঁকে নড়ানো যেত না। আমাদেরও তেমনি নড়াতে পারতেন না। এই করে করে—

—জিতল কে?

মহারাজ : জেতা মানে যদি স্টাডি সার্কেল উঠে যাওয়া হয়, তাহলে আমরা জিতলাম। আর জেতা মানে যদি আমাদের ধারণা accept করানো হয়, তাহলে আমরা হেরে গেছি। কিন্তু উনি পড়াশুনা নিয়ে খুব আগ্রহী ছিলেন। প্রশংসার বিষয় হচ্ছে এটি। তা, দেড় বছর ঘষাঘষি করে দেখা গেল—তিনি ক্লান্ত হয়ে গেছেন। এরকম চালিয়ে লাভ কী!

প্রশ্ন : স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলতেন, দুটো মিষ্টি কথা বলুন। দেখুন আমার মিষ্টি খাওয়া বারণ—Diabetes; কিন্তু মিষ্টি কথা বলা বারণ নয়।

মহারাজ : আমার Diabetes নেই। সুতরাং মিষ্টি কথা শুনতে পারি অনেক। আমার কথাগুলো মিষ্টি কিনা আমি তো বুঝতে পারি না। আমার কথা বেরিয়ে যায়, যারা শোনে তারা বুঝতে পারবে। কেউ কেউ বলে মিষ্টি। কেউ কেউ বলে—আপনি বড় কঠিন নিয়ম বলেন। আমি বলি—কঠিন নিয়ম তো আমি বলি না, শাস্ত্র বলে। আমি কী করব! একজন বলছে—বড় অশান্তি। কী করলে শান্তি হবে? আমি বললাম—একটা সোজা উপায় আছে। বাসনা ছেড়ে দাও। তো অমনি মুখটা চুন হয়ে গেল। তা বলছে—আমরা সংসারী লোক, বাসনা ছেড়ে দেওয়া কী করে সম্ভব! তখন বলি—তাহলে অশান্তি দূর করাই বা কী করে সম্ভব? একটাই পথ আছে—বাসনা ত্যাগ। তা যদি না করতে পার, অশান্তি যাবে না। "অনিত্যম্ অসুখং লোকম্ ইমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।" (গীতা-৯।৩৩) জগৎটা অনিত্য এবং দুঃখময়। এখানে ভগবানের ভজনা কর। তা যদি না পার, জগৎটা অনিত্য ও দুঃখময় বলে যদি ধরে না নিতে পার, তবে কখনো শান্তি আসবে না।

প্রশ্ন : সাধুজীবনের করণীয় কী কী—এসম্পর্কে একটু বলুন না, মহারাজ—

মহারাজ : সর্বত্যাগ—এই হল প্রথম কথা। আর দ্বিতীয় কথা—সমস্ত তাঁকে সমর্পণ। ত্যাগটা হল যেন নেতিবাচক, আর ইতিবাচক হল—সব তাঁকে অর্পণ।

—আমেরিকায় মানুষ ত্যাগের কথায় ভীষণ ভয় পায়। তারা মনে করে, ত্যাগ জিনিসটা গঠনমূলক নয়।

মহারাজ : যতক্ষণ ভোগে আসক্তি আছে ততক্ষণ ত্যাগটা ভয়ানক ভয়ের জিনিস। ভোগাসক্তি চলে গেলে ত্যাগটা আর ভয়ের নয়—স্বাভাবিক সেটা। আর তার উপায় হল—ঐ সর্বস্ব সমর্পণ করা।

—কিভাবে তাঁকে সমর্পণ করা?

মহারাজ : অহং ত্যাগ কর। তারা অহংকে জীবনের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করেছে। অহংকে সরিয়ে সেখানে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। অথবা অন্যভাবেও যদি তুমি অহংকে সরাতে পার তবে সেই স্থানে তিনিই বিরাজ করবেন। চেষ্টা করে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে না। কারণ, তিনি সর্বত্রই আছেন। পৃথিবীতে কোন শূন্যস্থান নেই।

—সেটা ঠিক। হরি মহারাজ একসময় বলেছেন, অবশ্য যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ এবং জীবন্মুক্তিবিবেকেও আছে—বাসনাক্ষয়, মনোনাশ, তত্ত্বজ্ঞান—তিনটে একসঙ্গে হয়। কিভাবে হয় মহারাজ?

মহারাজ : মননটা হল উপায়। তারপরে বাসনাক্ষয়, বাসনা হল নিজের জন্য ইষ্টসাধনবুদ্ধি। সেই বাসনা চলে যায়। যখন মনন করলে তখন স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মুক্তি আর যা বল—তাই আসে। বাসনার ক্ষয় হলে তত্ত্বজ্ঞান হয়। এই তিনটে যে পরপর হয়, তা নয়—তিনটে একই জিনিস। বাসনাক্ষয়, মনোনাশ আর তত্ত্বজ্ঞান—একই। এগুলোর আগে-পিছে বলে কিছু নেই। একটার সঙ্গে আরেকটা যুগপৎ হবে।

প্রশ্ন : বৌদ্ধদের একটি তত্ত্ব আছে, তাঁরা বলেন—প্রতিটি নিঃশ্বাসের সঙ্গে তোমার মনকে পর্যবেক্ষণ কর, পরীক্ষা কর। বৌদ্ধরা বলেন—এরকম উপাসনা হল বিপাসনা ধ্যান। আপনি এই বিষয়ে কী মনে করেন?

মহারাজ : বুদ্ধের একটা কথা আছে—"সর্বং ক্ষণিকম্। ক্ষণিকং দুঃখম্। দুঃখং ত্যাজ্যম্।" দুঃখ-নিবৃত্তির উপায়ও আছে। চতুরার্য সত্য। এই চতুরার্য সত্যকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমে প্রয়োগ করেছে। বৌদ্ধধর্মে বলে—সদা সতর্কতা। তোমাকে প্রতিটি কর্মে সবসময় সতর্ক থাকতে হবে। তাহলে কোন কিছুই তোমাকে প্রলুব্ধ করতে পারবে না। তাই নতুন কিছুতেই আকৃষ্ট হবে না।

॥ ৬০ ॥

প্রশ্ন : একাগ্রতা সম্বন্ধে আপনার ধারণা কিছু বলুন—

মহারাজ : যে-কর্ম তুমি অনুষ্ঠান কর তা সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে কর—মনের কোন একটা অংশ দিয়ে নয়। মন যেন কোন একটা সময় একমাত্র একটা কাজেই ব্যস্ত থাকে—মনের সমস্তটাই যেন নিবদ্ধ থাকে ঐ বিশেষ কর্মটিতে। তার ফলে অন্যদিকে মন দেওয়ার আর ফুরসত থাকে না এবং তখন 'সত্য' প্রতিষ্ঠিত হয়—সে-সত্য যাই হোক না কেন। তাঁদের মতে, শূন্য সত্যেরই প্রতীক। শূন্য ধ্রুব। সেই শূন্য বিদ্যালয়ের অঙ্কের শূন্য নয়। এই শূন্যের মানে—মনের সামান্যতম বিক্ষেপও না হওয়া। সেই শূন্যের কথাই বলা হচ্ছে।

মনের বিক্ষেপ বা অন্যমনস্কতা বৌদ্ধধর্মে একটি মজার ব্যাপার। একজন নবীন যুবক সংঘে যোগদান করার পর তাকে থালা মাজতে বলা হয়। সে তাই করেছিল। দুবছর ধরে সে বাসন মাজে। হঠাৎ একদিন তার মনে হল, বাসন মাজার সময় আমার মনে অন্য ভাবনাও আসে, কিন্তু এটা তো ঠিক নয়। সুতরাং বাসন মাজার কাজও করতে হবে সম্পূর্ণ মনোযোগ সহকারে। যদি তা করতে পারি তাহলে রহস্যময় এই জগৎ সম্পূর্ণ উন্মোচিত হবে আমার সামনে। এই হল সতর্কতা। স্বামীজী কর্মযোগে বলেছেন : কর্ম যখন করবে সম্পূর্ণ মন দিয়ে করবে। তা যদি করতে পারি তাহলে আমাদের মনের চঞ্চলতা দূর হয়ে যাবে। চঞ্চলতা দূর হলে জগতের পিছনে যে এক সত্তা আছে—সেই সত্তার প্রকাশ হবে।

প্রশ্ন : গীতার কর্মযোগ ও স্বামীজীর কর্মযোগের মধ্যে পার্থক্য কী?

মহারাজ : গীতায় উল্লিখিত কর্মযোগের অর্থ—সমস্ত কৃতকর্মের ফল শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করতে হবে। আর স্বামীজীর কর্মযোগের অর্থ—নিঃস্বার্থ কর্ম। সমস্ত স্বার্থ বিসর্জন দিতে হবে। মনে কোনরকম স্বার্থচিন্তা থাকলে চলবে না। স্বামীজীর ভাব আর বুদ্ধের কর্মযোগ কমবেশি একইরকম। কিন্তু যখন কর্ম করবে—তোমাকে একাগ্র হতে হবে। কর্মটা করতে হবে সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে। তবেই তুমি কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হবে। মানসিক বিচ্যুতি

দূর হয়ে সত্য উন্মোচিত হবে। সত্যকে প্রকাশ করার জন্য কোন প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই; কারণ সত্য স্বতঃপ্রকাশিত, স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং কর্মযোগের অনুষ্ঠানের পর আর কোনকিছুর প্রয়োজন নেই। তাই স্বামীজী বলছেন—কর্মযোগ সহায়ে তুমি লক্ষ্যে পৌঁছাতে পার। আবার শঙ্করের ব্যাখ্যায় কর্মযোগের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, মনের মলিনতা দূর হয় এবং চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানলাভ হয়। কিন্তু শঙ্কর মাঝের স্তরটির অবতারণা করেছেন; স্বামীজীর মতে, এটার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ, ব্রহ্ম বা পরম সত্য স্বতঃপ্রকাশিত—তার প্রকাশের জন্য বাইরের কোন প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই। নিঃস্বার্থ কর্মের দ্বারা মাঝের আবরণটি অপসারিত হলে সত্য আপন মহিমায় মূর্ত হয়ে ওঠে। সত্যকে জানার জন্য আলাদা করে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন হয় না। শঙ্কর এই মত গ্রহণ করেন না। কারণ, তাঁর মতে, জ্ঞানের দ্বারাই অজ্ঞান অপসারিত হবে। ব্রহ্মাকারা-বৃত্তির উদয়ে অজ্ঞানবৃত্তি দূরীভূত হয়। কিন্তু স্বামীজী বলছেন, যদি তুমি অজ্ঞানবৃত্তির অপসারণ করতে পার তাহলেই ব্রহ্মের প্রকাশ ঘটে, কারণ এটি স্বতঃপ্রকাশিত।

—আরেকটি প্রশ্ন, ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন আর ফলার্পণের মধ্যে পার্থক্য কী?

মহারাজ : মানসিকতার তফাত। ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন আর ফলাকাঙ্ক্ষা সমর্পণ—এই দুটির মধ্যে একটি আপাত-দৃষ্টিতে নঞর্থক এবং অপরটি সদর্থক।

—কোন্‌টি সদর্থক?

মহারাজ : সর্বস্ব তাঁকে সমর্পণ। কর্মফল সমর্পণ। এটি সদর্থক এবং সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা অপনয়ন—এটি নঞর্থক পদ্ধতি।

—এই দুটি কি পরস্পরবিরোধী নয়?

মহারাজ : না, একটি সত্যের নঞর্থক রূপ, অপরটি সত্যের সদর্থক রূপ। দুটি পরস্পরবিরোধী নয়, বরঞ্চ তারা একই বস্তু। আমি একবার এই বিষয়ে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলাম।

—সেটা কি লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল?

মহারাজ : ঠিক জানি না। যতদূর মনে হয়, হয়নি। সাধারণত আমি এরকম কোন লেখা রাখি না।

—সেটা তো আপনার দিক থেকে ঠিক আছে। অন্যেরা রাখতে পারত—

মহারাজ : আমার প্রকৃতিই এইরকম। কিছু লিখে রাখি না, কারণ আমি কোন কিছুর আবিষ্কারক নই। এইগুলি পরম সত্য। তাই লিখে রাখার দরকার নেই। সত্য চিরন্তন।

প্রশ্ন : এবার একটা খুব জরুরি প্রশ্ন করছি। একজন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক দর্শন সত্য না মিথ্যা তা কিরূপে নির্ধারিত হবে? দর্শন বা দৈব অভিজ্ঞতা সত্য না অসত্য—সেবিষয়ে একজন কিভাবে নিশ্চিত হবে?

মহারাজ : এটি দুরকমভাবে বিচার করা যায়। একটি বিচারে ব্যক্তির নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং অপরটি তার মন—যার বুদ্ধি সত্যে প্রতিষ্ঠিত। তারপর ভাগবতের বাণী অনুসরণ করে দেখতে হবে সেখানে কী কী গুণের কথা বলা হয়েছে এবং তোমার ঐ সম্বন্ধীয় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই বা কী বলছে। ভাগবতে পরিষ্কার বলা হয়েছে—প্রথমত, তোমার ভগবানের প্রতি ভক্তি বৃদ্ধি পাবে; কতটা বাড়বে তার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। দ্বিতীয়ত, তোমার মন বাইরের সমস্ত আকর্ষণ থেকে মুক্ত হবে। এবং তৃতীয়ত, সত্যে তোমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাবে এবং এবিষয়ে কোন দ্বিধা বা দ্বন্দ্বের উদয় হবে না। এই সমস্ত গুণ ভাগবতে বর্ণিত আছে, যার ব্যাখ্যা অনুসারে বোঝা যাবে আধ্যাত্মিক অনুভবটি সত্য অথবা মিথ্যা।

> "ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
> প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥"
>
> (ভাগবত, ১১।২।৪২)

একজন মানুষকে যদি না খেতে দিয়ে রাখা হয় তাহলে একসময় সে ক্ষুধার জ্বালায় ছট্‌ফট্ করতে থাকে এবং তার শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। এরপর যদি তাকে খেতে দেওয়া হয় তাহলে খাবারের প্রতিটি গ্রাস গলাধঃকরণের সঙ্গে সঙ্গে তার মন আনন্দে ভরে ওঠে এবং শরীরেও শক্তিসঞ্চার হয়, সেইসঙ্গে ক্ষুধার উপশম হয়। সুতরাং এইভাবেই একজন মানুষ ক্রমান্বয়ে তার আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার সত্যতা উপলব্ধি

করতে থাকে। যদি সে সত্য উপলব্ধির পর মনে মনে আনন্দ অনুভব করে, তার আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে সে ভাবতে পারে যে, তার দৈব অনুভব সত্য।

অতএব এই লক্ষণগুলির দ্বারা একজন সত্যের মূল্যায়ন করতে এবং অন্যরা তার অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করতে পারে। কিন্তু এখানে সন্দেহের অবকাশও রয়ে গিয়েছে। কারণ, কেউ ঈশ্বরোপলব্ধির ভানও করতে পারে, যার দ্বারা অন্যেরা প্রভাবিত হতে পারে। কিন্তু সে নিজে তো আর নিজেকে ঠকাতে পারে না। তাই এই বিচার-পদ্ধতি অনেক বেশি আস্থাবর্ধক। অন্যদের পক্ষে গীতায় যেমন বর্ণনা করা হয়েছে—'অহিংসা, ক্ষান্তি, আর্জবম্' ইত্যাদি। সেখানে 'স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণম্' ইত্যাদি লক্ষণ সহায়ে একজনকে বিচার করা যেতে পারে যে, তিনি সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন কিনা।

—পাশ্চাত্যে আজকাল কেউ কেউ বলে—স্বামীজী, আমার কুণ্ডলিনী জেগে উঠেছে, আমি অনুভব করছি, আমার দর্শন হয়েছে ইত্যাদি। এইজন্য প্রশ্নটি করলাম।

মহারাজ : হ্যাঁ, তাদের ভোগের চাহিদা বা বাসনা অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ায় কুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়েছে! (উচ্চহাসি) পার্থিব চাহিদা জাগ্রত হওয়াকে সে কুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়েছে বলে ভাবছে। তাদের কাছে কুণ্ডলিনী শব্দটাই বিভ্রান্তিমূলক। এটি আসলে কী তা বুঝতে না পেরেও মানুষ এসম্বন্ধে আলোচনা করে থাকে! কথামৃতে অনেক বড় বড় তত্ত্ব আলোচনা তারা দেখেছে বা শুনেছে এবং মনে করছে, তারাও ঐসকল গুণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—যেমন বিভিন্ন শাস্ত্রে কথিত হয়েছে। অনেক মানুষই শাস্ত্রপাঠ করে না, শাস্ত্রবাক্য অনুধাবন করার ক্ষমতাও নেই তাদের। তাই কথামৃত পড়ে ভেবেছে, তারা অন্তিম লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে! আমার ব্যক্তিগত একটি অভিজ্ঞতা বলছি। একসময় এক ব্যক্তি একজন বিখ্যাত ধর্মীয় নেতার সঙ্গ করতেন। তিনি একবার আমাকে একটি প্রশ্ন করেন। তিনি বলেন—ধ্যানের সময় আমি অনুভব করি যেন

কিছু একটা জিনিস আমার শিরদাঁড়া বেয়ে ওপরে উঠে আসছে। এই কথা বলে তিনি আমাকে বিশ্বাস করাতে চাইলেন যে, তাঁর কুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়েছে। আমি বললাম, আপনি ডাক্তার দেখান। এটা উচ্চ রক্তচাপের জন্যও হতে পারে। (উচ্চ হাসি)

প্রশ্ন : কী করে ঈশ্বরের আদেশ পাওয়া যায়?

মহারাজ : আদেশ বিচার করার তিনটি উপায় আছে। একটি হল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, দ্বিতীয়টি শাস্ত্রবাক্য এবং তৃতীয়টি সন্দেহভঞ্জন। এই তিনটি উপায়ে আদেশপ্রাপ্তির যথার্থতা সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চিত হতে পার। অনেক সময় আমাদের মনে কোন বাসনার উদয় হলে আমরা ভেবে ফেলি, ঈশ্বরই আমাদের ঐরূপ নির্দেশ দিচ্ছেন। কিন্তু মন শুদ্ধ হলে ওপরের তিনটি উপায়কে অবলম্বন করেই যেকোন দৈব অভিজ্ঞতা বা আদেশকে বিচার করতে হবে। নতুবা বিভ্রান্তির শিকার হতে পারি আমরা।

॥ ৬১ ॥

প্রশ্ন : বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের বাইরে এখনো খুবই প্রভাবশালী। কিন্তু ভারত থেকে অবলুপ্ত।

মহারাজ : অবলুপ্ত নয়। তবে ধর্ম হিসেবে খুব minority। আম্বেদকর একসঙ্গে ৫০ হাজার লোককে নিয়ে বৌদ্ধ হয়ে গেলেন। এটা তো ধর্ম হিসেবে নয়। এ তো রাজনীতি।

—এই যে ধর্ম উঠল, আবার পতন হল এর কারণ কী?

মহারাজ : পতন কেন বলছ? বল, প্রয়োজনীয়তা কমে গেল।

—প্রয়োজনীয়তা কেন কমলো, মহারাজ?

মহারাজ : কমলো তার কারণ প্রণালীটা খুব কঠিন। বাসনা ত্যাগ খুব কঠিন জিনিস। এইজন্য বাসনা যাদের আছে, তাদের বাসনা তৃপ্তির জন্যে বৈদিক ধর্মে কর্ম করতে বলছে। তাতে তাদের একটা উন্নতির পথ রইল। বাসনা পূর্ণমাত্রায় রয়েছে অথচ এখন যদি বলে, বাসনা ত্যাগ করতে হবে, তাহলে মুশকিলের ব্যাপার। কজন পারবে সেটা?

—কিন্তু যখন উঠেছিল, ঐ মতাদর্শটাই তো উঠেছিল?

মহারাজ : তখনো যে খুব ব্যাপক হয়েছিল, একথা মনে হয় না। কারণ, ধর্ম তার অনুরাগীদের সংখ্যা দিয়ে ঠিক করা যায় না। তবে কিছু কিছু রাজা সমর্থন করেছিল, তার ফলে কিছু কিছু প্রচার হয়েছিল। এই রাজারা কি সকলে ধার্মিক? তারা কি বাসনা ত্যাগ করেছিল?

—ঐতিহাসিকরা স্বীকার করছেন, বৌদ্ধধর্মের প্রভাব খর্ব হয়েছে।

মহারাজ : তাঁদের প্রচারশীল ধর্ম ছিল। বৈদিক ধর্মের সাথে প্রতিযোগিতায় পারল না। বৈদিক ধর্ম অধিকতর স্বাভাবিক। ধর্ম মানুষের প্রকৃতিকে অনুসরণ করে, যাতে সকলেই কিছু না কিছু পথ পেতে পারে। কিন্তু মুশকিল হল, বৌদ্ধধর্ম এত কঠোর যে, সাধারণের পক্ষে তা ধর্ম হিসেবে অনুসরণ করা খুব শক্ত। তবে দল হিসেবে আলাদা কথা।

—বিদেশি বৌদ্ধ আলোচকরা আলোচনা করেন যে, হিন্দুরা বৌদ্ধধর্মকে বিতাড়িত করেছে।

মহারাজ : কেউ বিতাড়িত করেনি। তার আদর্শ যা, তা যেখানে উঠেছিল—সেখানেই মিশে গেছে। প্রাচীনকালে বৌদ্ধধর্মের আদর্শ ছিল, তরঙ্গ একটা উঠেছিল, আবার তা সমুদ্রে মিশে গেছে।

—সেই তরঙ্গ তো অন্যত্র প্রচার হচ্ছে।

মহারাজ : সেখানে ধর্ম হিসেবে যতটা না প্রচারিত হচ্ছে, যুক্তিবাদী মতবাদ হিসাবে তার চেয়ে বেশি প্রচারিত হচ্ছে। যুক্তিপূর্ণ ধর্ম। বিশ্বাসের দরকার নেই।

—স্বামীজী বলেছেন, প্রথম পাঁচশো বছর বৌদ্ধদর্শনের যুগ, পরবর্তী পাঁচশো বছরে মূর্তিপূজা শুরু হয়ে গেল।

মহারাজ : এটা মানুষের স্বভাব। বুদ্ধ তো চাননি, তাঁর পুজো সকলে করুক। কিন্তু ভক্তরা ভাবল, বুদ্ধের স্মৃতিপূজা করতে হলে মূর্তিপূজাও করতে হবে।

—কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মানুষের ধর্ম।

মহারাজ : সে তো বটেই।

—বুদ্ধকে হিন্দুরা অবতার বলে স্বীকার করে নিল।

মহারাজ : কাজেই তাঁর আর পৃথক সত্তা রইল না।

—এটাই কি হিন্দুদের কৌশল?

মহারাজ : কৌশল মানে যে ছল, তা নয়। এটা তাদের উদার স্বভাব। একজন উদার প্রকৃতির মুসলমান আমাদের বলেছিলেন যে, তোমরা হিন্দুরা—যে যে ধর্ম এদেশে এসেছে, সকলকে খেয়ে ফেলেছ। আত্তীকরণ করেছ।

—মুসলমানদের তো করেনি মহারাজ?

মহারাজ : তিনি বলছেন যে, আমাদের বলে কদাচারী, নিষ্ঠুর প্রকৃতির। কিন্তু তোমরা তো সমাজের নিকৃষ্টদের ঠেলে দিয়েছ। তারা খ্রিস্টান, মুসলমান হয়েছে। কাজেই যাদের (মুসলমানদের) তোমরা সমালোচনা করছ, তারা তো তোমাদেরই লোক।

—খ্রিস্টানদের একটা অংশ তো হিন্দুদের থেকেই হয়েছে।

মহারাজ : খ্রিস্টধর্ম ছিল রাজধর্ম। অনেক লোক তাই ভাবল, এটা করলে কিছু সুবিধা আছে। তাই সব দলে দলে খ্রিস্টান হয়ে গেল। ধর্মের জন্য যে কতজন হল, সেকথা বিচার্য। কারণ, যিশুর আদর্শের মধ্যে এমন কিছু নেই যা হিন্দুরা অস্বীকার করে। কেবল কিছু মতবাদ; যেমন—জন্মান্তর মানে না। এই জন্মই শেষ সুযোগ। এরপর আর জন্ম হবে না—এটা ইহুদীদের থেকে আরম্ভ করে খ্রিস্টান, মুসলমান সকলে মানে। এটা যুক্তিসঙ্গত নয়, বরং খুব নিরাশাবাদী। জন্মান্তর নেই, মৃত্যুর পরেই স্বর্গে বা নরকে চলে গেল। নরকে গিয়ে পচুক বা স্বর্গে গিয়ে মজা করুক। পরবর্তী জন্মে ভাল সংস্কার পাওয়ার জন্য হিন্দুদের যে সর্বদাই কৃচ্ছ্রতা করা—এটা খুব বড় জিনিস।

—সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ই তো শুধু স্বর্গাদি অস্বীকার করেছে।

মহারাজ : সন্ন্যাসী ও প্রকৃত ভক্ত স্বর্গ চায় না। ভক্ত চায় ভগবানের সাথে আনন্দ করবে। হিন্দুধর্ম মতে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্বর্গের যে যেটা চায়, সে সেটা পাবে।

—বৌদ্ধরাও স্বর্গ চায় না।

মহারাজ : স্বর্গ তাদের নেই, তো চাইবে কী! বুদ্ধের পরবর্তী কালেও অনেক বুদ্ধ স্বীকার করা হয়েছে। তাদের বলে বোধিসত্ত্ব, ধীরে ধীরে তাদের বুদ্ধত্বলাভ হয়। সেটা কল্পনাবিলাস বলে মনে হয়। তবে আরেক দিকে এটা যুক্তিসঙ্গত যে, মানুষ ধীরে ধীরে উন্নতি করতে করতে পূর্ণজ্ঞান লাভ করে। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, নিজের মুক্তির চেয়ে জগতের মুক্তি বড়। এটাই বড় জিনিস। অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধ—তিনি নির্বাণ চাননি। চেয়েছিলেন, জগৎকে নির্বাণের পথে নিয়ে যেতে।

—তিনি এখনো আছেন। সেই অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধ অপরকে সাহায্য করেন যাতে তারা মুক্ত হয়ে যায়।

মহারাজ : বুদ্ধের বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে স্বামীজী বলছেন, বুদ্ধের হৃদয়। বুদ্ধ নিজের জন্য তপস্যা করেননি। জগতের দুঃখ দেখে সেই দুঃখের নিবৃত্তির উপায় খুঁজেছেন, তাই তাঁর তপস্যা।

॥ ৬২ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, একবার একটা খবর বেরিয়েছিল, ঝড়ের দাপট এমন—

মহারাজ : একটা দোলনাকে তুলে নিয়ে গিয়ে গাছে টাঙিয়ে দিয়েছে। তার মধ্যে বাচ্চাটা ঘুমাচ্ছে।

—পড়েছেন? তা ওটা গল্প না ঘটনা?

মহারাজ : গল্প না, ঘটনা বলে বলেছে। একটু রসিকতা করে বলা। আমেরিকাতে যে সাইক্লোন হয়, তাতে মানুষ, গাড়ি সব তুলে নিয়ে যায়। দেখেছ তো, ঘূর্ণি হাওয়ায় ধুলো-কুটোটা উড়িয়ে নিয়ে যায়। ঐরকম ধুলোর মতো গাড়িকেও উড়িয়ে নিয়ে যায়।

—ঐরকম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেও উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল কোন এক অসুর এসে।

মহারাজ : তৃণাবর্ত। ভগবান তাকে সেখানেই গলা টিপে ধরলেন। তিনি অসুর-সুদ্ধ নিচে পড়লেন।

—কৃষ্ণ ছোটবেলা থেকে ফটাফট অসুর মেরে দিচ্ছেন।

মহারাজ: আর কী করবেন! ঐরকম। গাড়ির নিচে শুইয়ে রেখেছে, মারল লাথি। গাড়ি ভেঙে গেল। গাড়ি মানে একটা অসুর—শকটাসুর। সমস্ত ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। এইরকম ভগবানের লীলা সব। তার আগে পুতনাকে মেরেছিলেন। এমন তার মাই খেলেন যে তার প্রাণসুদ্ধ গেল।

—ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি।

মহারাজ: ছেড়েও আর দেবে না, আর কেঁদেও বাঁচবে না।

—এইসব অবিশ্বাস্য ঘটনা থেকে আমরা কী পেতে পারি, মহারাজ?

মহারাজ: বিশ্বাস্য যদি হবে তো অবতার হবেন কেন? অলৌকিক ঘটনা ঘটাবার জন্যই অবতার।

—তিনি যে অবতার, তিনি যে ঈশ্বর—এটা বোঝাচ্ছেন এইসব কাহিনি থেকে।

মহারাজ: মানুষ কি আর বোঝে? বলে দেবে সব গপ্প।

—তুলসীদাস বলছেন যে, ভগবানের সব গুণ কীর্তন করেছি। তবে ভগবানের একটা দোষ আছে।

মহারাজ: একটা নাকি? আমার তো মনে হয়, ভগবানের অনেক দোষ! (হাসি)

—উনি একটাই দেখেছেন। ভগবান ধরতে জানেন, কিন্তু ছাড়তে জানেন না। ঐটাই আমাদের সম্বল।

মহারাজ: কেন? ঐ তো বৃন্দাবন ছেড়ে চলে গেলেন।

—তবু তো বলছেন, বৃন্দাবন ছেড়ে এক পা-ও যাইনি।

মহারাজ: কে বলল, ছাড়েননি। মথুরায় চলে গেলেন। গোপীরা কেঁদে কেঁদে মরল।

—ওটা তো 'ইব'।

মহারাজ: ওটা তো—তারা তাঁর ভক্ত তাই তিনি তাদের ছাড়েননি। কিন্তু ভক্তরা তাঁকে খুঁজে পেল না। তিনি তো সর্বব্যাপী। ছাড়বেন কী করে! সর্বব্যাপী যিনি তিনি নিজেকে কোথা থেকেও সরাতে পারেন না।

সুরদাস তো বলেছিলেন যে, তুমি হাত ছেড়ে চলে যেতে পার, কিন্তু আমার হৃদয় ছেড়ে যেতে পার? তাহলে—

মহারাজ : বাবা! তোমার জোর তো কম নয়! (আঙুল নির্দেশ করে) ভগবান ঢুকলে আর বের হবার পথ পাবেন না! এইজন্য ভয়ে আর ঢুকবেনও না। (হাসি)

—আমার মধ্যে ঢুকে গেছেন, মহারাজ। প্রভু মহারাজ আমার নাম দিয়েছেন, তিলভাণ্ডেশ্বর। আমার মধ্যে তিল তিল করে বাড়বেন তিনি।

মহারাজ : আরে তিল তিল করে বাড়বার আগে তো তুমি মরেই যাবে। এক তিল এক তিল করে কতদিন লাগে! (সকলের হাসি)

—মহারাজ, আপনি কোন বড় দুর্যোগপূর্ণ ঝড় দেখেছেন?

মহারাজ : ঝড় তো অনেক দেখেছি।

—একটা কী বলে—আশ্বিনের ঝড়।

মহারাজ : আশ্বিনের ঝড় আমি দেখিনি। আশ্বিনের ঝড়ের উল্লেখ কথামৃতে আছে। যাহোক, একবার আমি জয়রামবাটী থেকে আসছি, না যাচ্ছি, ঠিক মনে নেই। তা, পথের মাঝে খুব ঝড়। একবারে শ্বাস বন্ধ হয়ে যায় ঝড়ের চোটে। একটা গর্ত পেলাম, তাতে শুয়ে পড়লাম। ওপর দিয়ে ঝড় চলে গেল। আমার কোন অসুবিধা হল না। বুদ্ধিটা কী করে খাটল জানি না, শুয়ে পড়লাম। আর একবার জয়রামবাটী যাব, রাস্তায় এমন ঝড়—একটা বড় গাড়ি নিয়ে গিয়েছিলাম। তা গাড়িটা থরথর করে কাঁপছে। আমি ভাবলাম, বাবা! বললাম, গাড়িটা গাছের নিচ থেকে সরিয়ে রাখ। গাছটা যদি ভেঙে গাড়ির ওপর পড়ে, তাহলে গাড়িও গেছে, আর আমরাও গেছি। তারপর ঝড় থামলে যেতে গিয়ে দেখি, ঝড়েতে রাস্তায় গাছ পড়ে গেছে। যাওয়ার পথ নেই। অনেকগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে। এখন কী করা যায়? তারপর গ্রামের ছেলেরা এল। বলল, তোমরা যদি এত টাকা করে গাড়ি-পিছু দাও তো আমরা রাস্তা পরিষ্কার করে দিই। এইরকম দরকষাকষি হচ্ছে, এর মধ্যে গ্রামের এক বুড়ো মুখিয়া এসে বলল—আরে, এরকম করলে গ্রামের বদনাম।

তোমরা কুড়ুল নিয়ে এস। তা দিয়ে গাছ কাট। বুড়োর কথায় সবাই কুড়ুল নিয়ে এল। গাছ কাটল। তারপর একটা ট্রাকে সেই গাছটাকে বেঁধে সরিয়ে দিল। তবে আমরা যেতে পারলাম।

—এখন মহারাজ, কাঠের এত দাম, গাছ পড়তেই সঙ্গে সঙ্গে লোক জড়ো হয়ে যায়। যে পারে এসে কেটেকুটে নিয়ে চলে যায়।

মহারাজ : কেটেকুটে তো পরে নেবে। আগে তো ভাড়াটা আদায় করে নিক! আর একবার আলিপুরদুয়ারে মিটিং চলছিল। সবে শেষ হয়েছে। চাঁদোয়া খাটানো ছিল। এমন ঝড় হল যে, চাঁদোয়াটা নিচে পড়ে গেল।

—আপনার মনে আছে মহারাজ, গৌহাটিতে আপনি বক্তৃতা করছিলেন তখন খুব জোর ঝড় উঠেছিল—

মহারাজ : হ্যাঁ, খুব মনে আছে। তা তখন আমাকে টেনে ভিতরে নিয়ে গেল। তারপর ছাউনিটা পড়েই গেল।

প্রশ্ন : মহারাজ, আপনি তো ভাগবত খুব পড়েছেন, তাই না?

মহারাজ : ভাগবতের কথায় একটা ঘটনা মনে পড়ে আমার—একবার মঠে আমরা কজন ভাগবত পড়ছিলাম। এক ব্রহ্মচারীও শুনছিল। যখন রাসলীলা পড়া শুরু হল, সে উঠে গেল। বলল—আমরা ব্রহ্মচারী, রাসলীলা শুনতে চাই না। ভাল কথা।

—যখন শেষ হল তখন সঙ্গে সঙ্গে ঢুকেছে। তা আপনি জিজ্ঞাসা করলেন—তাহলে কি লুকিয়ে লুকিয়ে শুনছিলে? (সকলের হাসি)

॥ ৬৩ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, তপস্যায় গিয়ে কিরকমভাবে চলব?

মহারাজ : প্রথম কথা, ভিক্ষা করে খেতে হবে। দ্বিতীয় কথা, কাপড়চোপড় যথাসম্ভব কম ব্যবহার করতে হবে। তৃতীয় কথা, নেশা-ভাঙ চলবে না। একবার—একজন সাধু বলছে, দুটো পয়সা দেবেন? আমি বলছি—কেন কী হবে? বলছে—আমার তিনদিন ধরে বাহ্যে হয়নি। জিজ্ঞাসা করলাম—দুটো পয়সায় বাহ্যে হবে কী করে? বলছে—দু-পয়সার বিড়ি কিনব।

তাতেও খাওয়া হবে। দিলাম পয়সা।—বললাম, ঘরের ভিতরে খাবে। বাইরে যেন খেও না।

—মহারাজ, তপস্যায় গিয়ে কী করব না তা তো বললেন। কী করব, এবার বলুন।

মহারাজ : ভগবানের নাম করবে, যতটা পার। আর বাকিটা ঘুমাবে। কারণ ওখানে তো কেউ দেখতে যাচ্ছে না। (হাসি)

—মহারাজ, তখন তো কাজকর্ম কম থাকে। তাই ঘুমও তো কম পাওয়া উচিত।

মহারাজ : তুমি করে দেখ। শারীরিক পরিশ্রম নেই। তবে কিছু করার না থাকলে লোকে ঘুমিয়ে পড়ে।

—জপধ্যান করতে গেলে ঘুম পায়।

মহারাজ : তাই তো। জ্ঞান মহারাজ leaflet বের করতেন। তাতে এক জায়গায় বলেছেন—দেহের শান্তি ঘুমে, মনের শান্তি নামে। এসব ছাপিয়ে তিনি বিলি করতেন। বিবেকানন্দ ইউনিভার্সিটির নামে।

—তখন বিবেকানন্দ ইউনিভার্সিটি কী?

মহারাজ : তিনি নিজে। (সকলের হাসি)

—থাকতেন যে-ঘরটায়, সেখানে নাকি আলমারি থাকত।

মহারাজ : সেখানে থাকত না। Visitors' Room-এ থাকত। তাতে লেখা ছিল—পড় এবং রাখ। লোকে গোড়ারটা শুনত, পরেরটা শুনত না। তারপর উঠে যেত বইটা নিয়ে। আমাদের বলতেন, যেখানে যা ভাল কাজ হচ্ছে, সব বিবেকানন্দ ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে।

—ঘুম পায় যে বললেন, তা রোধ করা যায় কিভাবে?

মহারাজ : তা যদি জানতাম, তাহলে তো বেঁচে যেতাম। আমি তো এখানে বসে বসেই ঘুমোই। ভক্তরা এসেছে, বলে—মহারাজ ধ্যানে আছেন! (হাসি)

—আপনার তো অনেক বয়স। আপনার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের কেন হয়?

মহারাজ : তুমি আমায় অনেক বয়স বলে দিলে? মাত্র ছিয়ানব্বইয়ে এসেছি। এটা একটা বয়স হল? ষাট্ ষাট্! বিষম খেলে—বলে ষাট্ ষাট্। মানে ষাট বছর বাঁচলে যথেষ্ট হবে।

—ষাট্ ষাট্ মানে একশো কুড়ি।

মহারাজ : না না। একশো কুড়ি বছর আর কেউ বাঁচবে না। এই বুড়োকে একশো কুড়ি বছর টানতে হবে?

—আয়ু আস্তে আস্তে বাড়ছে।

মহারাজ : আস্তে আস্তে কেন, একটু তাড়াতাড়ি বাড়লে হতো না? তোমাদের আশা আছে।

—আশা রাখতে হবে।

মহারাজ : 'আশা হি পরম-দুঃখম্।' আর আশা রাখতে হবে বলছ?

প্রশ্ন : বরানগরে স্বামীজী এবং গুরুভাইদের সম্বন্ধে বলা হয়, তাঁরা নিরালম্ব জীবন যাপন করতেন।

মহারাজ : নিরালম্ব মানে তাঁরা নিজেরা চেষ্টা করতেন না। তা, শশী মহারাজ তাঁদের জন্য ভাবতেন। বেশি জুটত না। একদিন তো সমস্ত বেলা কেটে গেছে, কিছু জোটেনি। তারপর শশী মহারাজ কোথা থেকে কী নিয়ে এলেন। যা নিয়ে এলেন তা যথেষ্ট নয়। যারা ধ্যান করছে, তাদের মুখে একটা করে দলা পাকিয়ে গুঁজে দিয়ে গেলেন।

—মহারাজ, নিরালম্ব জীবনের ব্যাখ্যা কী?

মহারাজ : কোন চেষ্টা থাকবে না। ভগবানের ওপর নির্ভর করবে। ভাগবতের একটি বর্ণনা আছে। এক রাজা—তিনি খুব তপস্যা করছিলেন। অজগরবৃত্তি আরম্ভ করলেন। অজগর যেমন কোথাও গিয়ে খায় না, যা মুখে আসে তাই খায়—সেরকম তাঁকে কেউ দিলে খেতেন। এ রকম করে শীর্ণকায় হলেন। তারপর যখন নাম প্রচার হয়ে গেল, অনেকে খাবার এনে দিত। তারপরে একটু বীভৎস রসের কথা আছে। পায়খানা করে সাফ করতেন না। পায়খানা থেকে সুগন্ধ বের হতো। কত যোজন সেই সুগন্ধ পরিব্যাপ্ত হতো।

—এটা অজগরবৃত্তি?

মহারাজ : খানিকটা, খাওয়ার দিকটা অজগরবৃত্তি। বাকিটা নয়। তার যোগৈশ্বর্য হয়েছিল। তারপর সেই যোগৈশ্বর্য চলে গেল। সাধন করতে করতে চলে গেল।

—স্বামীজী বলছেন, প্রকৃতির নিয়মকে যে যতখানি বাধা দিতে পারে, সে তত সুখী।

মহারাজ : 'জীবন'-এর লক্ষণ হল সংগ্রাম। একটা পিঁপড়ে সেও বাঁচবার জন্য চেষ্টা করছে।

—মানে প্রকৃতির নিয়মকে বাধা দিচ্ছে। ঈশ্বরে পরম নির্ভরতা—সেটা কি প্রকৃতির নিয়মকে সম্পূর্ণরূপে মান্য করা না উপেক্ষা?

মহারাজ : না, না। ঈশ্বর তো প্রকৃতির অতীত। প্রকৃতির নিয়ম সাধকেরা মানেন না। ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করেন।

—এই যে অজগরবৃত্তি বলা হচ্ছে, যা আসছে খাচ্ছে—

মহারাজ : এটা ঈশ্বরের ওপর নির্ভরতা। তিনি যদি খাওয়ান তো খাবেন, না হয় তো খাবেন না। আমি একজনের অজগরবৃত্তি দেখেছিলাম উত্তরকাশীতে। তাকে খাইয়ে দিচ্ছে। দই-টই তার গা দিয়ে পড়ছে। ভুঁড়িটি বেশ ছিল।

—বলতে চাইছি, ঈশ্বরে নির্ভরতা আর পুরুষকার—এ দুটোর মধ্যে কিভাবে সমন্বয় করব?

মহারাজ : সমন্বয় নয়, বলো আপস করবে। ঈশ্বরের ওপর নির্ভরতা থাকলে আর নিজের চেষ্টা থাকে না। যতক্ষণ নিজের চেষ্টা থাকে ততক্ষণ ঈশ্বরে নির্ভরতা আসে না। তা আমরা কী করব? যতক্ষণ 'আমি কর্তা' বুদ্ধি আছে, ততক্ষণ আমাদের যা করা উচিত, তাই করব। আর তাঁর ওপর যখন নির্ভর করব তখন কর্তব্যের অতীত। তখন তার কোন কাজ থাকে না—'তস্য কার্যং ন বিদ্যতে।'

প্রশ্ন : লীলাপ্রসঙ্গে আছে, ঠাকুর বলছেন—আবার যদি জন্ম নিতে হয়, তাহলে ব্রাহ্মণের বাড়িতে বালবিধবা হয়ে জন্মগ্রহণ করব। একটি ছোট

বাগান থাকবে, শাকসবজি হবে। একটা গরু থাকবে, দুধ হবে। এবং তা দিয়ে গোবিন্দের সেবা হবে।

মহারাজ : ঠাকুর বলেছেন, কড়ে রাঁড়ি হব।

—ব্রাহ্মণ এবং বালবিধবা—একথা কেন বললেন?

মহারাজ : ব্রাহ্মণের বাড়ি মানে শুচি পবিত্র। তারা স্বভাবতই পবিত্র। তাদের ভিতর বালবিধবা মানে, তারাও পবিত্র। তারপর তিনি ভক্তভাবে গোবিন্দের সেবা করবেন। শাকসবজি বুনে খাবেন। ভিক্ষায়ও যেতে হবে না। যাই হোক, ঠাকুরের সখ হল এই। একটা গরু হলে গোবিন্দের সেবা হবে।

—বিধবা হতে হবে কেন?

মহারাজ : বিধবা এইজন্য বললেন, কারণ তাকে আর কেউ উত্যক্ত করবে না।

—মহারাজ, আজকে এই পর্যন্ত থাক।

মহারাজ : তা থাক।

॥ ৬৪ ॥

প্রশ্ন : স্বামীজী উত্তর ভারতে পর্যটনকালে মেথরের হাত থেকে ছিলিম নিয়ে তামাক খেয়েছিলেন। পরে তা শুনে গিরিশবাবু বলেছিলেন : "তুমি গাঁজাখোর। নেশা হয়েছিল, তাই তামাক খেয়েছিলে।" স্বামীজী প্রতিবাদ করে বলেছিলেন : "না হে, জি সি—ওরকম নয়। আমার পরীক্ষা করার ইচ্ছা হয়েছিল। আমি যে সন্ন্যাস নিয়েছি, তা কতদূর উন্নত হয়েছি। জাতি-বর্ণের বন্ধন সন্ন্যাসী ত্যাগ করবে।" সন্ন্যাস নেওয়ার পর এরকম পরীক্ষা করা উচিত?

মহারাজ : উনি তো নিজেকে সন্ন্যাসী বলে মনে করতেন। তোমরা বলতে চাও কি, তোমরাও এরকম পরীক্ষা করবে? গাঁজা খাবে? (সকলের হাসি)

—জাতি-বর্ণের পরীক্ষা করা কি সকলের পক্ষেই গ্রহণীয়?

মহারাজ : দেখ, "ঈশ্বরাণাং বচঃ কার্য্যং তেষাম্ আচরণং ক্বচিৎ।" সবসময় তাঁরা যা করেছেন তা করতে হবে—তা নয়। তবে তাঁরা যা উপদেশ দিয়েছেন, তা পালন করতে হবে। তোমাদের অত ভাববার দরকার কী যে, পরীক্ষা করে দেখতে হবে? মনকে যাচাই কর না। তাহলেই তো বোঝা যাবে। একটা ঘটনা বলছি। তখন জ্ঞান মহারাজের আশ্রমে থাকি। এখনকার বাংলাদেশের হবিগঞ্জ থেকে কিছু মুচির ছেলে এনে জুতোর কাজ শেখানো হচ্ছে। অশোকানন্দ স্বামী, গোপেশ্বর মহারাজ দুটি মুচির ছেলেকে এনে জ্ঞান মহারাজের আশ্রমে রেখেছেন। একদিন একটি মুচির ছেলে আমার পাশেই বসেছে। মনটা কেমন এলোমেলো হল। তারপর মনে হল, স্বামীজীর উপদেশ তো আমরা মানি। তাহলে আমাদের আবার এসব কী? ভাবতেই, দিব্যি খেলাম। প্রথমটায় সংস্কার মাথাচাড়া দিয়েছিল।

জাতি বর্ণের বন্ধন থেকেই অপরের এঁটো খাবে না, এসব কথা ওঠে?

মহারাজ : জাতি শুধু নয়, এক জাতিরও পরস্পর একে অপরের এঁটো খাবে না। জাতির বন্ধন এটা নয়। "উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্।" (গীতা-১৭। ১০)

ঠাকুরের কাছে বিজয় গোস্বামীর শাশুড়ি এসে বললেন, কৈ, কী আর হল, সকলের এঁটো খেতে পারি না। ঠাকুর বললেন—কুকুরও তো যা-তা খেয়ে বেড়ায়। তা বলে কি সে জ্ঞানী?

মহারাজ : "শূনাং তত্ত্বদৃষাঞ্চৈব কো বেদ শুচিভক্ষণম্।" কুকুর আর তত্ত্বজ্ঞ—অশুচি খাওয়া যদি এদের লক্ষণ হয়, তবে এদের তফাত কী? একজনের শুচি-অশুচি বোধ নেই, আর একজনের শুচি-অশুচি ভেদজ্ঞান নেই। এখানেই তফাত।

—জ্ঞানী পিশাচবৎ—মানে কী?

মহারাজ : পিশাচের যেমন শুচি-অশুচি বোধ নেই, জ্ঞানীরও সেইরূপ।

—জ্ঞানী জেনে অতিক্রম করেছে—

মহারাজ : আর পিশাচের পার্থক্য-জ্ঞান নেই। জ্ঞানীর কাছে পার্থক্য-দৃষ্টি নেই। একজন জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, আর একজনের জ্ঞানের উন্মেষই হয়নি।

—ঠাকুরের জীবনে কিছুকাল এটা লক্ষ করা গেছে।

মহারাজ : ঠাকুর ব্রাহ্মণের রান্না করা অন্ন ছাড়া খেতে পারতেন না। আবার কাঙালিদের এঁটোও খেয়েছেন।

—ব্রাহ্মণের অভিমান ত্যাগ করার জন্য তিনি কাঙালিদের এঁটো খেয়েছিলেন।

মহারাজ : আর তারপরও বামুনের রান্না ছাড়া খাবেন না—সেটা কিরকম?

—এটা তো স্ববিরোধী। কী করে বুঝব? মহারাজ, একটু বলুন না।

মহারাজ : বুঝবে বিচার করে। আর অন্য উপায় নেই।

—বিচারের ধারা কিরকম?

মহারাজ : এইরকম যে, একজন জ্ঞানী পুরুষের শুচি-অশুচি ভেদবোধ নেই, কারণ তাঁর কাছে সবই পবিত্র। আর একজনের শুচি-অশুচি বোধ নেই, কারণ তাঁর কাছে দুটো একই। তফাত হচ্ছে এখানে। ঐ যে বলেছেন, গঙ্গার জল আর নালার জল জ্ঞানীর এক মনে হবে। এর মানে দুই-ই কি অপবিত্র হবে? না, দুই-ই পবিত্র হবে।

—ঠাকুর ব্রাহ্মণের হাতের রান্না ছাড়া খেতে পারছেন না। এটা কিভাবে বোঝা যাবে?

মহারাজ : আরে, ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মেছেন যে—

—এখানে কি কোন নজির দেখানোর আছে?

মহারাজ : নজির দেখানো এই কারণে যে, এসব মানতে হয়। জোর করে ভাঙতে নেই।

—শশী মহারাজ এবং তাঁর পরবর্তী ঠাকুরের সেবক যাঁরা, অনেকেই ব্রাহ্মণ। তাঁদের থেকেই প্রথাটা রক্ষিত হচ্ছে।

মহারাজ : তাঁদের থেকে কিনা জানি না। আমাদের মধ্যে তো বটেই।

—আমাদের মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত।

মহারাজ : তার কারণ, চট করে সামাজিক প্রথাকে ভাঙতে নেই। তাহলে আমরাই সমাজ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাব।

—আমাদের মধ্যে আবার গোঁড়ামি শুরু না হয়ে যায় মহারাজ।

মহারাজ : আমাদের গোঁড়ামি শুরু করা নয়, আমরা জানি ভেদদৃষ্টি ভাল নয়। কাজেই ব্যবহার যাই হোক, গোঁড়ামি হবে না। কথা হচ্ছে, সমাজে বাস করব, আবার সমাজবিরোধী কাজ করব—এ করলে সমাজ মানবে কেন? তাতে হবে কী, সে-ই আলাদা হয়ে যাবে। তখন সমাজের ভিতর তার কিছু করার থাকলে করতে পারবে না।

—স্বামীজী যখন প্রথম মঠ করলেন—বালী, বেলুড়—এসব অঞ্চলের লোকেরা ভাবত, এটা হিন্দুদের মঠ নয়। ওরা বাবু।

মহারাজ : তাই তো। আমরা ছেলেবেলায় শুনেছি, পূর্বাশ্রমের বাড়িতে একজন বলছে ঠাট্টা করে—বেলুড় মঠ কী করে চিনবি জানিস? একদিকে হাড়ের পাহাড়, আর একদিকে পালকের পাহাড়। মুরগির কথা বলছে আর কী! তারা মুরগি পেলে আর ছাড়ে না।

—মহারাজ, সমাজের ধারার সাথে আমরা যদি চলতে থাকি, তাহলে আমাদের যে নতুন কিছু দেওয়ার আছে সেটা দেব কী করে?

মহারাজ : ধীরে ধীরে।

—তাহলে তো ওটাকেই মেনে নেওয়া হচ্ছে। নতুন আর কিছু কিভাবে করব?

মহারাজ : নতুন এই করব যে, আমরা আদর্শ দেব, যাতে সমাজ আপনিই তাদের কু-আচরণ অর্থাৎ কদাচারগুলো একদিন পরিত্যাগ করে।

—তারা তো বলতে পারে, আপনারা তো দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন না।

মহারাজ : তারা দেখতে পাবে, পুরোটা জীবন দেখলে বুঝতে পারবে। ঠাকুর নিজেই নিজেকে ঠাট্টা করছেন। বলছেন যে, একটা খাবার ছিল, হাত দিয়ে নিতে যাচ্ছিলেন, তখন টিকটিকি পড়ল। আর নেওয়া হল না! নিজেই নিজেকে ঠাট্টা, উপহাস করছেন।

—আগেই যেটি বললেন যে, ভেদদৃষ্টি খারাপ। এই দৃষ্টি থাকলে এগুলি সমাজে থেকে যাবে।

বলেছেন যে, প্রথমে শরীরটা বোধ হবে যে—হ্যাঁ, এইটা আমার থেকে একটা আলাদা উপাধি। একটা আলাদা জিনিস। তারপরে বলছেন, স্নায়ুগুলো উপলব্ধি করা যাবে এবং সেইটারও যে কাজকর্ম, তারও উপলব্ধি হবে। সেইটাকেও দূরে সরাতে পারবে। তারপরে যাবে মনেতে। তারপরে বলছেন, প্রাণ—সমষ্টি প্রাণ। সজাগ ভাব এ থেকেই হবে?

মহারাজ : আত্মবিশ্লেষণ দরকার। আমি কে—নিজে এটি বিশ্লেষণ করতে হবে। যা পরিবর্তনশীল, তা আমি নয়। কারণ, আমি যদি পরিবর্তনশীল হতাম, তাহলে পরিবর্তনকে দেখত কে? আমি অপরিবর্তনশীল দ্রষ্টা। কাজেই পরিবর্তনশীল বস্তু আমি নই। এই অপরিবর্তনশীল আমাকে খুঁজতে খুঁজতে তখন শুদ্ধ আত্মা উপলব্ধি হবে।

—ঐ প্রথম স্তরেই এইসব জিনিস বৌদ্ধরা শেখায়। প্রথম স্তরে শেখায়, সাধারণ যেসমস্ত কাজকর্ম, সেগুলো ওরা সচেতনভাবে করুক। যাকিছু কাজকর্ম আমরা করছি, সেগুলো সচেতনভাবে করব—সেটা ওরা প্রথমে আশা করে। তারপরে ধীরে ধীরে তাদের যে তত্ত্বকথা অর্থাৎ সমস্ত কিছুই হল পরিবর্তনশীল—সেটাকে উপলব্ধি করবে। এটাই ওদের লক্ষ্য।

মহারাজ : উপলব্ধিশীল কোন বস্তু ওরা মানে না। বৌদ্ধধর্ম শূন্যবাদী—অপরিবর্তনশীল কোন বস্তুও মানে না। কাজেই এই চিন্তা করতে করতে শূন্য হয়ে যাবে।

—শূন্যতা উপলব্ধি করবে তো?

মহারাজ : কে করবে?

—সেই। কেউ নেই—এইটা তো উপলব্ধি করবে?

মহারাজ : কে করবে?

—সে তো আপনি বেদান্তের দৃষ্টিতে ওদের পরাস্ত করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু ওরা কি করতে চায়, ওদের মতটা কী?

মহারাজ : ওদের মত হচ্ছে, উপলব্ধিকারক কোন বস্তু নেই। নদীর বিন্দু বিন্দু জল একসাথে মিলে চলে যাচ্ছে। এখন এই জলগুলোকে—

বিন্দুগুলোকে যদি পৃথক করা যায়, তাহলে নদী কোথায় থাকবে? একটা প্রদীপের নির্বাণ। প্রদীপটা নিবল। শিখাটা কোথায় গেল? ওদের মতে, শিখা বলে কোন বস্তুই ছিল না। শিখাটাই ভ্রম ছিল। ভ্রম দূর হয়ে গেল। প্রদীপ নির্বাপিত হয়ে গেল।

—ওদের সাধনার অন্তিমে ওরা কী অনুভব করবে?

মহারাজ : অনুভব করবে এই যে, আমি কোন উপাধিবিশিষ্ট নই। তাহলে আমি কি নিরুপাধি? না, তা-ও বলা যায় না। উপাধিগুলো বাদ দিলে আমার আর কিছুই থাকে না।

—সেইটাই বলা হচ্ছে ওদের ভাষাতে যে, আমরা—

মহারাজ : শূন্যবাদী।

প্রশ্ন : মহারাজ, কথা হচ্ছিল নির্বাণের—

মহারাজ : "পুনরপি জননং পুনরপি মরণং, পুনরপি জননী জঠরে শয়নম্।" (চর্পটপঞ্জরিকাস্তোত্র-৮)

—অজাতবাদে তো জন্মও নেই মরণও নেই।

মহারাজ : ও! তা স্থিতিও নেই। যে অজাত তার স্থিতি হবে কী করে! "আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্তমানেঽপি তত্তথা।" যা আদিতে নেই, অন্তে নেই, বর্তমানেও নেই।

প্রশ্ন : স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, সকল ধর্মের জ্ঞানাতীত বা তুরীয় অবস্থা এক। দেহজ্ঞান অতিক্রম করলে হিন্দু, খ্রিস্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ—এমনকি যারা কোনপ্রকার ধর্মমত স্বীকার করে না, সকলের ঠিক একই প্রকার অনুভূতি হয়ে থাকে। মহারাজ, বিষয়টা একটু পরিষ্কার করে বলুন।

মহারাজ : তা তো বটেই। দেহ দিয়েই তো প্রভেদ হয়। দেহজ্ঞান চলে গেলে এক আত্মাই থাকে।

—তাই যদি হয়, তাহলে এই যে যাদের দেহজ্ঞান চলে গেল, তাদের তো এক অনুভূতি হবে, কিন্তু তা না হয়ে এত ভিন্নতা হয় কেন?

মহারাজ : দেহজ্ঞান আছে বলেই ভিন্নতা।

—কিন্তু যাঁরা অনুভব করছেন, তাঁরাও যখন বলছেন, সেইসব মহাপুরুষদের কথাগুলোতেও তো কত ভিন্নতা!

মহারাজ : তাঁদের কী করে চিনলে তুমি? দেহ দিয়েই তো চিনলে?

—কিন্তু তাঁরা যে-অবস্থাটা ব্যাখ্যা করছেন বা বর্ণনা করছেন—সেই অবস্থাটা তো দেহাতীত।

মহারাজ : আরে দেহাতীত হয়ে গেলে আর তুমি চিনতে পারবে না। দেহ দিয়েই তুমি পার্থক্য করছ। দেহ দিয়েই চিনছ। দেহাতীত অবস্থা হলে সকলে এক হয়ে যাবে। আসলে দেহ ভিন্ন ভিন্ন বলেই প্রভেদ হচ্ছে। দেহাতীত হয়ে গেলে আর প্রভেদ কী দিয়ে করবে?

—ঠাকুর যে সব ধর্ম সত্য বলছেন, তাহলে কি সেই অবস্থাতে সব ধর্ম সত্য, বাকি সব মতামত—সেটাকে কি মেলানো যায় মহারাজ?

মহারাজ : ধর্ম মানে তো দেহাতীত অবস্থা নয়। ধর্ম হল সেটি প্রাপ্তির উপায়।

—তাহলে ঠাকুর যে সব ধর্মকে সত্য বলছেন!

মহারাজ : এর অর্থ হল বিভিন্ন পথ দিয়ে তাকে সেই সত্যে পৌঁছাতে হবে। এই পথগুলো আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন বলে মনে হলেও সবগুলিই সেই একত্বে পৌঁছে দেয়।

—যে-অভিজ্ঞতা বা অনুভূতিটি হচ্ছে, সেইটি কি এক? ঐ অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি কি সব ধর্ম থেকে লাভ করা যায়?

মহারাজ : তা যায়।

—সেদিক থেকেই কি সব ধর্ম সত্য?

মহারাজ : হ্যাঁ।

—সব ধর্মে যে এক অনুভূতি হয়, সেটা অনুভূতির আগে যে ধর্মের বিভিন্নতা রয়েছে, সেইখানে ধর্ম তাহলে সত্য নয়।

মহারাজ : না।

প্রশ্ন : স্বামীজী বলছেন, বৌদ্ধরা ছিল সবচেয়ে যুক্তিসম্মত অজ্ঞেয়বাদী। বাস্তবিকই শূন্যবাদ ও অদ্বৈতবাদ—এই দুইয়ের মাঝখানে সত্যিই কোথাও থামতে পার না। এর মানে কী?

মহারাজ : শূন্যবাদ হলেই তা অদ্বৈতে পৌঁছাচ্ছে। অদ্বৈত হলেই তার শূন্যতা অর্থাৎ বৈচিত্র্যের অভাব হচ্ছে।

—এর মাঝে থামতে পার না বলায় ভক্তিপথগুলোকে কি অস্বীকার করা হচ্ছে না?

মহারাজ : না, না। অস্বীকার করা হচ্ছে না। দুইয়ের একত্ব বোঝানো হচ্ছে। কোথাও থামতে পারছ না মানে, দুইয়ের একত্ব আসছে।

—তা হয়তো আসছে, কিন্তু ভক্তিবাদে যারা একত্ব মানছে না তাদের ক্ষেত্রে কী হবে?

মহারাজ : তারা বৃন্দাবনের শেয়াল হবে! (সকলের হাসি)

প্রশ্ন : স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, যখনি অপরের কথা থেকে কোন কিছু শিখছ বা লাভ করছ, জেনো যে, পূর্বজন্মে তোমার সেই বিষয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, কারণ অভিজ্ঞতাই আমাদের একমাত্র শিক্ষক। যা আমরা শিখছি, পূর্বজন্মে আমাদের তার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এইটি একটু পরিষ্কার করে বলবেন, মহারাজ?

মহারাজ : কোন লোককে আমরা তারিফ করি তখনি যখন সে আমার মনের কথা বলে। তাই না?

—তা ঠিক। কিন্তু সেটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল মানে—আমরা তো কিছুটা কল্পনাও করতে পারি?

মহারাজ : মনের কথা মানেই তো অভিজ্ঞতা।

—না, আমরা কল্পনাও তো করতে পারি যে, যেটা বলছে—হ্যাঁ, এটা আমার ভাল লাগছে।

মহারাজ : কল্পনা করতে পারি না, যদি না তা কিছুটাও অভিজ্ঞতার বিষয় হয়। একেবারে অভিজ্ঞতার বিষয় যা নয়, তা কল্পনা করা যায় না।

—কিছুটা অভিজ্ঞতা হল। বাকিটা বহুগুণ বাড়িয়ে আমরা কল্পনা করতে পারি।

মহারাজ : কিছুটা হলেই হল। তাকে আরো বাড়িয়ে দাও—কিছুটাকে।

—আচ্ছা, কিন্তু পূর্বজন্মে এরকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল বললে, আমরা যে ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য চেষ্টা করছি—

মহারাজ : পূর্বজন্মে বা এজন্মে যা-ই হোক, তাতে জন্ম কোন্‌টা—তা তাৎপর্য নয়। তাৎপর্য এতে—যে-বস্তু আমার জ্ঞানের বিষয় নয়, তাকে আমি বুঝতে পারি না, তারিফ করতে পারি না। যখন আমরা দেখি, অমুক লোকটি খুব সুন্দর বক্তৃতা করছে, তার মানে তার বক্তৃতার বিষয়গুলি আমার মনকে স্পর্শ করছে। তার মানে আমার মনে সে-অভিজ্ঞতা ছিল, কিন্তু আমার ভাষা ছিল না ফুটিয়ে বলবার জন্যে। এই এখন সে বলছে, তাই আমার মনে হচ্ছে—ও তো ঠিক কথা বলছে।

—এরকম যখন স্পষ্ট মিলে যায়, তখন আমরা বুঝি। কিন্তু অনেক সময় তো মনে হয়, এরকম তো আগে ভাবিনি! এটা দারুণ বলল! সত্যিই তো এরকম আমি চিন্তা করিনি!

মহারাজ : সেটাকে প্রশংসা করছি কিনা?

—পরে করছি।

মহারাজ : গ্রহণ যখন করছি, তার মানে এটা আমার মনের কথা।

—তাহলে ঈশ্বরলাভ যাকে বলছি, যখন আমাদের ব্রহ্মজ্ঞান হবে, সেই ক্ষেত্রে কি এটা বুঝতে হবে, আমাদের ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল?

মহারাজ : ব্রহ্মজ্ঞান তো নিত্য। তার অভিজ্ঞতা থাকবে কী না থাকবে—মানে কী?

—ঠিক আছে, কিন্তু অজ্ঞানের জন্য যতক্ষণ সেটা আমাদের অনুভব হচ্ছে না, সেই সময়টাতেও অভিজ্ঞতাটা যেন বর্তমান। যদি একবার ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে থাকে, তাহলে আর অজ্ঞান কী করে আসবে?

মহারাজ : যখন সেই জ্ঞানের কথা বললে, আমার মনে লেগে গেল—তার মানে কী? তার মানে এটা আমার মনের ভিতরে ছিল। ভাষায় প্রকাশ হয়নি। এখন সেটা ভাষায় প্রকাশ হওয়াতে আমি প্রশংসা করলাম।

—না, এই তারিফ করার কথাটা শুধু না, মহারাজ।

মহারাজ : তারিফ করার মানেই হচ্ছে, আমার মনের কথার সঙ্গে মিলে যাওয়া।

—সেটা ঠিক। কিন্তু মহারাজ, যখন আমাদের ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে বলছি বা অজ্ঞান দূর হয়ে গেছে বলছি—তা সেটা একবার যদি হয়ে থাকে, তাহলে আবার কেন আমাদের সেই চেষ্টা? এটাই হচ্ছে কথা।

মহারাজ : ভুলে গেছ। দেহবোধের জন্য ভুলে গেছ।

—মহারাজ, জ্ঞান হলে তো আর অজ্ঞান থাকতে পারে না।

মহারাজ : জ্ঞান হয়নি, এটা নয়। যেটা নিত্য জ্ঞান, সেটা হলে অজ্ঞান থাকতে পারে না। নিত্য জ্ঞান যা সেটা অনিত্য হয় না।

—সেটার অভিজ্ঞতা কি আমাদের হয়েছে, এটা মেনে নেব?

মহারাজ : হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। অভিজ্ঞতা মানে নিত্য।

—তাহলে একবার হয়ে গেলে আবার কী করে—

মহারাজ : একবার হয়ে গেলে? হয়ে যাওয়ার প্রশ্নই উঠছে না।

—কেন, মহারাজ? সেইটা একবার অনুভব হয়েছে তো।

মহারাজ : যেটা আবার হয়েছে, সে তো নিত্য নয়।

—নিত্য মানে অজ্ঞানটা দূর হয়েছিল—এরকম একটা অবস্থা তো?

মহারাজ : আবার? অজ্ঞান যদি থাকে তবে তো দূর হবে। নিত্য জ্ঞানের সঙ্গে আবার অজ্ঞান হওয়া, জ্ঞান হওয়া—এসবের প্রশ্ন তো নেই।

—নিত্য বোধ যদি থেকেই থাকে, তাহলে আবার সেটার জন্য চেষ্টা কেন? এইটাই প্রশ্ন মহারাজ।

মহারাজ : "নোদেতি নাস্তমেতি ন সংবিদেসা স্বয়ংপ্রভা।" যা জ্ঞান—সেটা সর্বদা স্বতঃপ্রকাশ—তার উদয়ও হয় না, অস্তও হয় না। এইটা মনে রাখতে হবে তো।

—তাহলে চেষ্টাটা কেন?

মহারাজ : চেষ্টা এইজন্য যে, আমি তার ওপরে অজ্ঞান আরোপ করছি। আরোপিত এটা। বস্তু থাকলে তবে তো তার আরোপ হবে। এক্ষেত্রে বস্তুটা যে নতুন করে হল, তা তো নয়। আরোপটার কথা হলে হয়। বস্তুত, জ্ঞান হয় না। নিত্য সেটি। নিত্য বস্তুর ওপরে অনিত্যতা আরোপ করা হচ্ছে। আরোপ যেটা, সেটাকে দূর করাটাই হল অজ্ঞানের নিবৃত্তি।

॥ ৬৬ ॥

প্রশ্ন : কথামৃত থেকে একটু পড়ছি মহারাজ। "সন্ধ্যার পূর্বে মণি বেড়াইতেছেন ও ভাবিতেছেন—রামের ইচ্ছা, এটি তো বেশ কথা—এতে তো Pre-destination আর Free will, liberty— "

মহারাজ : Pre-destination না, Pre-determination।

—রামের ইচ্ছা গল্পটিতে Pre-determination, free will, liberty-র ঝগড়া মিটে যাচ্ছে বলতে কী বোঝাচ্ছে, মহারাজ?

মহারাজ : সবই যদি রামের ইচ্ছায় হয়, তাহলে মানুষের আর স্বাধীন ইচ্ছা কোথায় থাকে, আর স্বাধীনতাই বা কোথায় থাকে?

—এই ধারণা-দুটো তো বিপরীতমুখী মহারাজ। এই স্বাধীন ইচ্ছা আর দৈব—

মহারাজ : হ্যাঁ। দৈব—যারা ভগবানকে মানে না, রামের ইচ্ছা মানে না, তারা ব্যাখ্যা করে দৈব বলে। কিন্তু দৈব কার দ্বারা নির্দিষ্ট? তারা বলে কর্ম। কর্মই আমাদের দৈবের কারণ। এই মীমাংসকদের মত। আর স্বাধীন ইচ্ছা সবারই অনুভবের মতো মনে হয়। অর্থাৎ আমরা যা ইচ্ছা তাই করতে পারি। আমাদের নিয়ন্ত্রণ করবার কেউ নেই। কিছু নেই। আর মীমাংসকদের মত হচ্ছে—কর্মই আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে। আরেকটি মত হল—রামের ইচ্ছা যাকে বলি, সে-মতে তার (ব্যক্তির) কিছু নয়। রামই সব, তিনি যা করেন তাই হয়। সবই রামের ইচ্ছা।

—সমস্ত আস্তিকই কি মহারাজ দৈবকে মানে? আস্তিক যারা তারা কি সকলেই স্বাধীন ইচ্ছাকে অস্বীকার করে?

মহারাজ : আস্তিক যারা তারা দৈব স্বীকার করে। আস্তিক মানে কী বুঝলে? আস্তিক মানে বেদে বিশ্বাসী। যারা বেদে অবিশ্বাসী তারা নাস্তিক।

—বেদে তো কর্মের কথাও আছে। আবার আত্মার কথাও আছে। পরমাত্মার কথাও আছে।

মহারাজ : বেদে স্বাধীন ইচ্ছার কথা কি নেই কিছু? ইচ্ছাটা তো আরোপিত। সত্য বলে কোন ইচ্ছা নেই, সবই আরোপিত। এই জগৎ-জ্ঞাতৃত্ব দেখে

একটা সিদ্ধান্ত আমরা আমাদের বুদ্ধি দিয়ে করি। সেই সিদ্ধান্ত হচ্ছে—ঈশ্বরই নিয়ন্ত্রণ করছেন, অথবা কর্মই নিয়ন্ত্রণ করছে। এ আমাদের বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে আরোপ করা।

—এগুলিকে তো—সত্যকে খোঁজার জন্য ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ হয়েছে। কিন্তু সত্যকে তাহলে কী করে বোঝা যায়?

মহারাজ : না, সত্যকে খোঁজার জন্য নয়। সত্যকে তারা যেভাবে স্বীকার করে—তার থেকেই ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ হয়েছে।

—সত্য যেটা সেটা তো একরকম। দুটো বিপরীতমুখী মতবাদ সত্য হবে কী করে?

মহারাজ : বিপরীত মতবাদ সত্য হয় না। আসলে মানুষের বুদ্ধি বিপরীত কিনা। কাজেই বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে তারা সেটাকে তৈরি করে ও মানে।

প্রশ্ন : স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, আমাদের ভেতর যেটা 'আমি' 'আমি' করছে—সেটাই ব্রহ্ম। যদিও আমরা তাঁকে দিনরাত অনুভব করছি, তবে তখনি আমরা জানি না যে, তাঁকে অনুভব করছি। যে-মুহূর্তে আমরা ঐ সত্য জানতে পারি, সেই মুহূর্তে আমাদের সব দুঃখ-কষ্ট চলে যায়। সুতরাং আমাদের এই সত্যকে জানতেই হবে। মহারাজ, এই জানার সঙ্গে দুঃখ-নিবৃত্তিটা কী করে হয়?

মহারাজ : "আত্মানং চেদ্বিজানীয়াৎ অয়মস্মি ইতি পুরুষঃ। কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসঞ্জ্বরেৎ।" (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্-৪।৪।১২) —আত্মাকে যদি কেউ জানে যে আমি এই রকম অর্থাৎ সর্ব উপাধিশূন্য, তাহলে দুঃখের নিবৃত্তি হয়।

—এই আত্মানুভূতির সঙ্গে দুঃখ-নিবৃত্তির কী সম্পর্ক? দুঃখ-নিবৃত্তি হয় কিভাবে?

মহারাজ : আত্মাকে জানলে দুঃখ আর কোথায়—কার দুঃখ?

—দুঃখ-নিবৃত্তি—এটা হয় কী করে?

মহারাজ : নিবৃত্তি মানেই হল আর দুঃখ থাকবে না।

—কেন থাকবে না?

মহারাজ : কারণ, দুঃখের যে-হেতু সেটা তখন থাকে না। দুঃখের কারণ অজ্ঞান। আত্মার ওপরে আরোপিত বস্তুকে আমরা সত্য বস্তু বলে মনে করছি—এই অজ্ঞানই হচ্ছে দুঃখের কারণ। কেউ যদি আত্মাকে সর্ব উপাধিশূন্য বলে জানে তাহলে আর দুঃখের কারণটা থাকে না।

—সর্ব উপাধিশূন্য অবস্থাটা আনন্দের কারণ কী করে হয়, মহারাজ? সর্ব উপাধিশূন্য অবস্থাটা আত্মার স্বরূপ, সেটা আনন্দের বস্তু হয় কী করে? আনন্দ দেয় কী করে?

মহারাজ : আনন্দের বস্তু মানে, সেই বস্তুকে তো আর বর্ণনা করা যায় না। কিন্তু, যেহেতু সেই বস্তু আমাদের কাম্য, তাই সেটি লাভ হলে দুঃখের নিবৃত্তি হয়। দুঃখের নিবৃত্তি হলে সে কি গাছ-পাথর হবে? না, তা তো হতে পারে না; সুতরাং আনন্দস্বরূপ বলা হয়। তাকে সচ্চিদানন্দ বলা হয়েছে। তার অস্তিত্ব কখনো লোপ হয় না। তার জ্ঞানের কখনো লোপ হয় না, তার আনন্দের কখনো লোপ হয় না।

—তাহলে কি যখন সর্ব উপাধিশূন্য হল, তখন আমরা তাঁকে আনন্দস্বরূপ বলি?

মহারাজ : হ্যাঁ। সর্ব উপাধিশূন্য হলেই ওরকম হয়।

—না কি, যখন তাঁকে আমরা আনন্দস্বরূপ বলে ভাবছি বা আনন্দের আকর ভাবছি সেটা সেখানে নিত্য।

মহারাজ : একটা কথা মনে রেখো—আনন্দস্বরূপ ভাবছি; আনন্দ উৎপন্ন হচ্ছে—এটা কিন্তু ভাবছি না। আনন্দস্বরূপ ভাবছি। উপাধি হচ্ছে অনিত্য। এখানে যে-আনন্দ তা যেহেতু নিত্য আনন্দ, তাই সর্ব উপাধিশূন্য হয়ে তিনি আনন্দস্বরূপ হতে পারছেন।

প্রশ্ন : ঠাকুরের ছোটবেলায় কয়েকবার ভাবসমাধি হয়েছিল। ভাবতন্ময়তা তাঁর ছোটবেলা থেকেই ছিল। তাঁর যখন বয়স ছ-সাত বছর, একদিন ধানের খেতের আলপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন ঘটনাটা ঘটল—কালো মেঘের কোলে একঝাঁক বক উড়ে যাচ্ছিল। সেই দেখে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। আর লোকেরা সব ধরাধরি করে বাড়িতে নিয়ে গেল।—তা এই জিনিসটা কী?

মহারাজ : এই জিনিসটা—প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে ঠাকুর চিরসুন্দরকে স্মরণ করেছেন।

—চিরসুন্দরকে স্মরণ করেছেন? তার মানে কি, এই যে জড়প্রকৃতি—তার মধ্যে যে-সৌন্দর্য, সেই সৌন্দর্য থেকে চিরসুন্দরের ঘরে পৌঁছানো যায়?

মহারাজ : কবিরা পৌঁছায়। তারা সৌন্দর্য দেখে মোহিত হয়। কিন্তু সেটা খুব—খুব ক্ষণিক। তারপরে আবার যে-কে সেই হয়ে গেল।

—আমরা যে বলি সাধনা করে ঈশ্বরকে দর্শন করা, তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করা; কিন্তু এইখানে ঠাকুরের এই ঘটনা থেকে বোঝাচ্ছে, ঈশ্বরের জন্য যে নির্দিষ্ট সাধনপথ অবলম্বন করা হয়, সেটার প্রয়োজন নেই।

মহারাজ : অবতারের তা প্রয়োজন হয় না। এইজন্যই তো তিনি অবতার। তাঁর এসব সহজাত।

—তার মানে, কোন একটা বিষয়ে মন স্থির হলেই যা সত্য বস্তু—তা উদ্ভাসিত হয়? কোন একটা বিষয়ে মন স্থির হয়ে গেলেই তা থেকে ভগবানলাভ হয়ে যায়?—এখানে কি এইরকম ঘটে?

মহারাজ : না। এক্ষেত্রে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ নেই। জগদীশচন্দ্র বোসের সম্বন্ধে শুনেছি, তাঁর একজন ছাত্র—পরে বিখ্যাত হয়েছে। সে গেছে দেখা করতে। জে সি বোস তখন ছাদের ওপরে সব গাছপালা নিয়ে ভাবনায় মগ্ন হয়ে আছেন। ছাত্র গেছে, তা তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। নিজের ভাবেই আছেন। ছাত্র তাঁর ভাব ভঙ্গ করবে না বলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অনেকক্ষণ পরে জগদীশচন্দ্রের খেয়াল হল। তাকে দেখে বললেন—তুমি কখন এলে? অর্থাৎ জড়বস্তুর চিন্তা করলেও মানুষ বেহুঁশ হয়। সেখানে ভগবানের কোন স্থান নেই।

—স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, যাঁরা প্রকৃতিবিজ্ঞানী, যাঁরা প্রকৃতিকে নিয়ে গবেষণা করছেন, তাঁরাও চরমে সেই একতত্ত্বে পৌঁছাতে পারবেন।

মহারাজ : একতত্ত্বে পৌঁছাতে পারে, কিন্তু মনকে শুদ্ধ করা চাই। খালি একাগ্রতা হলে হবে না। শুদ্ধ হওয়া চাই।

প্রশ্ন : মহারাজ, এইমাত্র যে বললেন, কবিদের সৌন্দর্যানুরাগ ক্ষণস্থায়ী। শরৎ মহারাজ লীলাপ্রসঙ্গে এক জায়গায় লিখেছেন, 'প্রথমে আমাদের মন স্থূল বাসনা কামিনী-কাঞ্চনকে অতিক্রম করার চেষ্টা করে। তার পরেও সৌন্দর্যানুরাগ, মান-যশ এই ধরনের সূক্ষ্ম বাসনাগুলোকে অতিক্রম করতে হয়।' এই সৌন্দর্যানুরাগ বাসনা কেন?

মহারাজ : বাসনা এইজন্য যে মন তাকে আকর্ষণ করে। আবার মনকে সে আকর্ষণ করে।

—কিন্তু ঠাকুরের ছেলেবেলায় ঐ যে ঘটনাটা, সেটা তো প্রথমত সুন্দরের প্রতি আকর্ষণই ছিল।

মহারাজ : ঠাকুরের যা ছিল, সেটা শুদ্ধ মন। তাঁর ক্ষেত্রে যেকোন সৌন্দর্যই সেই পরমেশ্বরের সৌন্দর্যের দিকে নিয়ে যেত। কিন্তু সাধারণের যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অনুরাগ, তাতে ভগবানের দিকে নিয়ে যাবার কোন কথা নেই।

—কিন্তু রাজা মহারাজ এক জায়গায় বলছেন, সুন্দর বা নির্জন পরিবেশে ধ্যানে বসে যেতে হয়। এর মানে কি, সেই জায়গাটার প্রভাব মনের ওপরে পড়ে?

মহারাজ : যোগসূত্রে আছে, 'মনাকূলেন চ চক্ষুপীড়নে'—এমন জায়গায় যোগসাধন করতে হয়।

—তাহলে তো প্রকৃতির মধ্যেও একটা অনুকূল পরিবেশের প্রয়োজন।

মহারাজ : প্রকৃতির বিরুদ্ধভাব যেন না থাকে, এই।

—কিন্তু সেটাকে সুন্দরের প্রতি অনুরাগ বলা যাবে না?

মহারাজ : না।

—এই যে পাহাড় বা সমুদ্র যেমন আমরা দেখতে যাই—

মহারাজ : তা যদি হতো তাহলে তো সুন্দরী মেয়ের প্রতি আকর্ষণও ভগবৎ আকর্ষণ হয়ে যেত।

—ঠাকুর যেখানে মন দিচ্ছেন, সেখানেই ঈশ্বরদর্শন করছেন। ঈশ্বর-দর্শনের উপায় বলতে, মহারাজ, আপনি তো দুটোই বলছেন। একটা হচ্ছে, মনের একাগ্রতা, আরেকটা হচ্ছে মনের শুদ্ধি।

মহারাজ : হ্যাঁ, একাগ্রতা শুধু নয়—সঙ্গে চাই শুদ্ধ মন। একাগ্রতা বিষয়ের দিকেও হতে পারে। যারা তাস বা দাবা খেলে তাদের মন তাতে একেবারে এত ডুবে যায় যে শুনতে পায় না, দেখতে পায় না। কাজেই ওটাও মনের একাগ্রতা বটে, কিন্তু শুদ্ধি নয়।

—যদু মল্লিকের কথা ঠাকুর একবার বলেছিলেন। সে বলে, আমার এরকম হয় যে, খাবার সময় নুন দিয়েছে কিনা খেয়াল থাকে না। ঐরকম মনই আবার বিষয়চিন্তা করে!

মহারাজ : রসগোল্লার রস আর ভগবৎ রস এক হবে নাকি?

—মনের শুদ্ধি, সেটা কিরকম?

মহারাজ : মনের শুদ্ধি মানে, তাতে বিষয়-বাসনা থাকবে না। একেই বলে শুদ্ধ মন। বাসনা মনকে রঞ্জিত করে দেয়। বাসনাশূন্য হলেই সেটা শুদ্ধ মন হয়। কথায় কথায় লোকে বলে, আমার কোন বাসনা নেই।

—তা বলে মহারাজ।

মহারাজ : মানে, মনের খবরই তাদের নিজেদের জানা নেই।

—ছেলেবেলায় ঠাকুরের ঐ ঘটনার পরে ঠাকুর উল্লেখ করেছিলেন যে, তারপর থেকে কেমন যেন হয়ে গেলুম। এই যে একটা পরিবর্তন—এটা কী মহারাজ?

মহারাজ : পরিবর্তন মানে—অনুভব করলেন যে, মনটা ভগবানের দিকে বেশি আকৃষ্ট হয়ে গেছে।

—তাঁর মন তো সেইরকম শুদ্ধ ছিল বলেই ঐরকম একটা ভাবান্তর হল।

মহারাজ : তা তো বটেই, তা তো বটেই।

—তারপরে আবার পরিবর্তন হয়ে গেল বলছেন?

মহারাজ : পরিবর্তন হয়ে গেল মানে আর বিষয়ের দিকে মন গেল না।

—বিষয়ের ভিতর আর কিছু দেখতে পেলেন না?

মহারাজ : তা, ঠাকুরের মন কি বিষয়ের দিকে ছিল? না, তা ছিল না ঠিকই। তবে বাল্যলীলাতে আনন্দ করছেন লোকের সঙ্গে। এ সব তো ছিলই।

—সে তো পরেও ছিল। ছেলেদের সাথে ফস্টিনস্টি।

মহারাজ: তাঁর মানবভাবও ছিল।

—এই ঘটনা দিয়ে তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁর মনের ধারাটা ঈশ্বরের দিকে—এই ঘটনার পর থেকে তিনি সেসম্বন্ধে সচেতন হলেন?

মহারাজ: সচেতন হলেন মানে, প্রবলভাবে অনুভব করলেন।

—আরো বলেছেন যে, তখন থেকেই নিজের ভেতরে আর একজনকে দেখতে পেলুম।

মহারাজ: অবতারদের বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, তাঁদের ভেতর একটি মানবভাব আর একটি দেবভাব বিরাজ করে। ঠাকুর বলছেন, এর ভেতরে দুটি আছে—একটি ভক্ত, একটি ভগবান। সে তো আমরা সাধারণভাবে বুঝতে পারি না। তাঁর ভেতর দুটি ভাব আছে। তা আবার পাশাপাশি আছে। একটির সঙ্গে আরেকটিকে মিশিয়ে দিলে হবে না। একটির সঙ্গে আর একটির সহাবস্থান আছে। কখনো তিনি দেবভাবে চলে যেতে পারেন, আবার কখনো মানবভাবে থাকতে পারেন।

—কিন্তু দুটি যে বিপরীত, মহারাজ! একটি হল পূর্ণ, আরেকটি অপূর্ণ। তাহলে দুটিই একই জায়গায় থাকবে, একই ব্যক্তিতে অবস্থান করবে—এ কী করে সম্ভব?

মহারাজ: এইজন্যই তো অবতার। অবতারের ভেতরে যদি মানবভাব না থাকত, তাহলে তাঁর অবতারত্ব কিছু হতো না। মানুষের ভিতরে মানুষের মতো হয়ে তাঁকে ব্যবহার করতে হয়। তা না হলে তিনি কী করে সাধারণ মানুষকে আকর্ষণ করবেন? এজন্য তাঁকে মানবভাবে থাকতে হয় এবং শুধু মানবভাব নয়, মানবভাব থেকে দেবভাবে ইচ্ছে করলেই নিজেও যেতে পারেন এবং অপরকেও নিয়ে যেতে পারেন।

॥ ৬৭ ॥

প্রশ্ন: খ্রিস্টানদের সম্বন্ধে স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, প্রত্যেকের মাথার ওপর একটা প্রকাণ্ড গির্জা চাপানো রয়েছে। আর তার ওপরে

একটা ধর্মগ্রন্থ। কিন্তু তবুও মানুষ বেঁচে রয়েছে। আর তার উন্নতিও হচ্ছে। এতে কি প্রমাণিত হচ্ছে না, মানুষ ঈশ্বরস্বরূপ?—এর অর্থ কী? প্রতিষ্ঠান বা ধর্মগ্রন্থ মানুষের ওপর রয়েছে, তবুও মানুষ বেঁচে আছে—বলতে কী বোঝাচ্ছে?

মহারাজ : তবুও সে বেঁচে আছে—মানে এসব ঠেলে সে তার ব্যক্তিত্বকে মাঝে মাঝে প্রকাশ করছে। ভাল দিকেই হোক বা মন্দ দিকেই হোক। একটা দৃষ্টান্ত বলছি। সেন্ট ফ্রান্সিস অব অ্যাসিসি—তাঁকে খ্রিস্টানরা বিতাড়িত করেছিল। তারপরে মৃত্যুর অনেকদিন পরে তাঁকে সেন্ট করে দিল। এখন তিনি যদি বিতাড়িত হয়ে ধর্মজীবন ছেড়ে দিতেন, তাহলে আর তিনি সেন্ট হতে পারতেন না। কাজেই ব্যক্তিত্ব সব ভেদ করে বেরিয়ে আসে। এরকম যেখানে যত সেন্ট আছেন, এই যে সেন্ট বলছি, সেন্ট ছাড়া অন্যেরা নন—অসাধারণ সাধু তাঁরা সকলেই। এরকম করে তাঁরা সব বাঁধন ছিঁড়ে উঠেছেন। একটা কথা আছে—

"জ্ঞানানুবর্তনং ত্যক্ত্বা
ত্যক্ত্বা লোকানুবর্তনং
শাস্ত্রানুবর্তনং ত্যক্ত্বা
ত্রয়ং ত্যক্ত্বা সুখী ভবেৎ।"

এই তিনটিকে অতিক্রম করে গেলে সে সুখী হবে। আবার শঙ্করাচার্যও একটা শ্লোকে বলেছেন—

"লোকানুবর্তনং ত্যক্তা ত্যক্তা দেহানুবর্তনম্।
শাস্ত্রানুবর্তনং ত্যক্তা স্বাধ্যসাপনয়ং কুরু।।"

(বিবেকচূড়ামণিঃ-২৭১)

অর্থাৎ, লোকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বাসনা ত্যাগ করে, দেহের সুখ সাধনের বাসনা ত্যাগ করে, মোক্ষশাস্ত্র ছাড়া অন্যান্য শাস্ত্রের অভ্যাসের বাসনা ত্যাগ করে অনাত্মাতে আত্মবুদ্ধিরূপ শাস্ত্রের অভ্যাসের বাসনা ত্যাগ করে অনাত্মাতে আত্মবুদ্ধিরূপ অধ্যাস দূর কর।

যে-শাস্ত্র মানুষকে তার কল্যাণের পথ দেখায়, সেই শাস্ত্রকে পর্যন্ত অতিক্রম করতে হবে।

—শাস্ত্রকে অতিক্রম করা কি মহারাজ?

মহারাজ : শাস্ত্রের বন্ধনের ভিতর আবদ্ধ না থাকা।

—কিন্তু গীতাতে যে ভগবান বলছেন, 'তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যে ব্যবস্থিতৌ।'

মহারাজ : এ হল গোড়ার কথা।

—তখন তার কাছে শাস্ত্রের আর প্রয়োজন নেই?

মহারাজ : স্বামীজী বেলুড় মঠের নিয়মাবলি করবার সময় বলছেন, নিয়ম করা নিয়মকে অতিক্রম করবার জন্য। নিয়মের দ্বারা বন্ধন সৃষ্টি করা নয়। বন্ধন থেকে মুক্তি মানে নিয়মের বন্ধন থেকেও মুক্তি।

—তখন তার ব্যবহারগুলি কিরকম হবে? নিয়মগুলি পালন করবে না, তা তো নয়?

মহারাজ : স্বচ্ছন্দ ব্যবহার। তার স্ব-টা শুদ্ধ। সে যে সৎকর্ম করে, তা শাস্ত্রের চাপে পড়ে করে না—স্বভাবতই করে।

—শাস্ত্রের উপদেশগুলো তো আমাদের অনুকূলেই। সেগুলোকে বন্ধন বলে কেন মনে হয়?

মহারাজ : দেখো, সকলেই খেটে খায়। কিন্তু কয়েদিকে যখন জেলে ভরে তখন তাকে খাটতে হয়। সেটা স্ব-ইচ্ছায় নয়, কর্তৃপক্ষের অনুশাসনে। এই হল তার দাসত্ব। যখন সেগুলো তার স্বভাব হয়ে যায়, তাকে চাপ দিয়ে করাচ্ছে মনে হয় না। ব্রহ্মচারীদের ট্রেনিং সেন্টারে তোমরা যেসব আইনকানুন করে দাও, তাতে প্রথম জীবনে ব্রহ্মচারীরা সব হাঁপিয়ে ওঠে। তারপর অভ্যস্ত হয়ে গেলে সেটাই তাদের কাছে স্বাভাবিক হয়ে যায়।

—কেউ চাপিয়ে দিচ্ছে না, আমার নিজের জন্যেই প্রয়োজন—এই বোধটা তখন আসে।

মহারাজ : যেজন্য প্রয়োজন, সেই প্রয়োজন একদিন তার মিটে যাবে।

—স্বামীজী এক জায়গায় বলেছেন, ইচ্ছা বা সঙ্কল্প বাসনার অধীন। তবুও

আমরা স্বাধীন ও মুক্তস্বভাব। সকলেই এটা অনুভব করে থাকে। ইচ্ছাবন্ধ হওয়ার আগে যেরূপ ছিল সেটাই মুক্ত-স্বভাব।

মহারাজ : তা তো বটেই। তার মানে ইচ্ছা যেখানে নেই, সেখানে মুক্ত স্বভাব তো বটেই। ইচ্ছা হয় বাসনা থেকে। যে বাসনামুক্ত, সে-ই মুক্ত।

—কিন্তু এই বাসনা থাকা সত্ত্বেও বলছে, আমরা স্বাধীন বা মুক্ত-স্বভাব।

মহারাজ : বলছে এইজন্য যে, স্বভাবটা আমাদের নষ্ট হয় না। বাসনা আসে, যায়। স্বভাবটা নিত্য। স্বভাব যেটা সেটা নিত্য। বাসনা মাঝে মাঝে আসে যায়, তাতে নিত্যত্বের কোন ব্যাঘাত হয় না।

—কিন্তু এই বাসনাই তো বন্ধ করছে, তাহলে মুক্ত-স্বভাব থাকছে কী করে?

মহারাজ : 'স্বভাব' বলছে। স্বভাব মানে স্বরূপ। স্বরূপত আমরা মুক্ত।

—মানুষ যে সুখের অন্বেষণ করছে, সেটা আর কিছু নয়, সে যে সাম্যভাব হারিয়েছে, সেটা ফিরে পাবার চেষ্টা করছে।

মহারাজ : হ্যাঁ। যখনি আমরা বাসনা করি, তার মানে অপ্রাপ্ত বস্তু খুঁজি। বাসনা কেন? এটা চাই, ওটা চাই। সব পেলেই বাসনা মিটে যায়। আর সেইসব পাওয়ার জন্যই বাসনা। সেই বাসনাটা পরিচ্ছিন্নভাবেই মনে উঠছে। অপরিচ্ছিন্ন যে-বাসনা, সেটাই পরিচ্ছিন্নভাবে মনে উঠছে—এটা চাই, ওটা চাই বলে।

—সেই অবস্থাটা ফিরে পাবার যে-চেষ্টা সেটা কি সেই অপরিচ্ছিন্ন অবস্থা?

মহারাজ : চেষ্টাটা অপরিচ্ছিন্ন নয়। ফিরে পাই যাকে সেটা অপরিচ্ছিন্ন।

প্রশ্ন : লীলাপ্রসঙ্গে শরৎ মহারাজ বলছেন, পশ্চিমের দেশগুলোতে প্রচণ্ড শীত, সেইজন্য সেখানকার মানুষের দেহবুদ্ধি বেশি। এটা কেন হয় মহারাজ?

মহারাজ : যেখানে তীব্র তাপমাত্রা সেখানেও মানুষের দেহবুদ্ধি বেশি হয়।

—হিমালয়ে এত ঠান্ডার মধ্যেও দেখি সাধুরা ঐখানেই থাকেন। কিন্তু সাধুরা তো সাধনভজন করেন যাতে দেহবুদ্ধি কম হয়।

মহারাজ : ওখানে গিয়ে দেহবুদ্ধি কম হয় না। দেহবুদ্ধি কম নিয়ে ওখানে যায়।

—দেহবুদ্ধি কম হয় না, কিন্তু চেষ্টা করেন।

মহারাজ : না। দেহবুদ্ধি কম নিয়ে ওখানে যায়। মানে, দেহের প্রতি দৃষ্টি কম রাখে। তিতিক্ষা করে।

—তেমনি আমরা শুনি, অনেক খ্রিস্টীয় সন্ত মরুভূমিতে ছিলেন। সেটাও তো খুব চরম পরিবেশ।

মহারাজ : সে তো আবহাওয়ার জন্য নয়, নির্জন প্রদেশে যাওয়ার জন্য।

—সেইখানেও তো দেহবুদ্ধি বেড়ে যাবার কথা।

মহারাজ : দেহবুদ্ধি এরকম তীব্র আবহাওয়ায় থাকলে বেড়ে যায়। কিন্তু যদি দেহবুদ্ধি কমিয়ে নিয়ে যায়, তাহলে আর কোন অসুবিধা হয় না। যখন হিমালয়ে যায় সাধুরা, ওখানে গেলে তাদের দেহবুদ্ধি কম হয়, তা নয়। দেহবুদ্ধি কম নিয়ে ওখানে যায় সহ্য করবার জন্য।

প্রশ্ন : ঈশ্বর চিরসুন্দর—এরকম কোন কথা কি আমাদের সংস্কৃত শাস্ত্রে আছে মহারাজ? ঈশ্বর সৌন্দর্যস্বরূপ।

মহারাজ : আমাদের শাস্ত্রে তো আছেই এসব। ভগবানের সৌন্দর্যের বর্ণনা কত দেওয়া আছে!

—ঈশ্বর সুন্দর, তার বর্ণনা আছে অনেক!

মহারাজ : ঈশ্বর মানে মূর্তিধারী ঈশ্বর। কৃষ্ণ, রাম—এঁদের কত রূপের বর্ণনা আছে।

—হ্যাঁ, আমাদের শাস্ত্রাদিতে সেরকম কথা বলা আছে। যেমন আমাদের ঈশ্বরের স্বরূপের কথা বা ব্রহ্মের স্বরূপের কথা—তিনি শুদ্ধস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ বলা হয় বা ব্রহ্ম সৎ, চিৎ, আনন্দ-স্বরূপ বলা হয়। কিন্তু তিনি যে সৌন্দর্যস্বরূপ—এরকম কোন কথা তো পাওয়া যায় না।

মহারাজ : একরকম করে তো প্রকাশ করা হয় না। বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন রকমের বর্ণনা। যেমন মুসলমানদের ঈশ্বর খুব শাস্তা। খ্রিস্টানদেরও তাই—সেমেটিক ধর্ম যাদের তাদেরও এরকম বিশ্বাস।

ঐটি ওদের মধ্যে খুব প্রবল ভাব ধারণ করেছে। আর ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ, স্বামীজীও বলেছেন তাঁর ভক্তিযোগে। ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ—এরকম কথাও কি আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে আছে?

মহারাজ : আমাদের শাস্ত্রে তো আছেই। ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ তো বটেই।

-হ্যাঁ, আমরা তো বলছিই। নারদীয় ভক্তিসূত্রে আছে, কিন্তু উপনিষদ্ বা অন্যত্র এর উল্লেখ পাওয়া যায় কি?

মহারাজ : নারদীয় ভক্তিসূত্রে ঈশ্বরকে প্রেমস্বরূপ বলা হয়নি, ভক্তির লক্ষণ প্রেমস্বরূপ। 'সা তস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা'।

—হ্যাঁ। ওখানে আছে অনির্বচনীয় প্রেমরূপ। বাইবেলের মধ্যে পাওয়া যায়—God is love. আমরা ঈশ্বরের প্রেমের স্বরূপের কথার অনেক বর্ণনা পাই। আমাদের হিন্দুধর্মের মধ্যে ওগুলো সব বিবৃতিরূপে পাই।

মহারাজ : পাদরিরা বর্ণনা করত—ঈশ্বর মানুষকে এমন প্রেম করিলেন যে, তাঁহার একমাত্র সন্তানকে তাহাদের জন্য উৎসর্গ করিলেন।

—ঈশ্বর প্রিয়স্বরূপ—তাতেও কি প্রেমস্বরূপের কথা বলা যায়, মহারাজ?

মহারাজ : 'সর্বে বিষয়ানন্দা স্পৃশ্য মাত্রামুপজীবন্তি।' তাহলে তুমি আনন্দস্বরূপ।

—আনন্দস্বরূপ আছে, রসস্বরূপ আছে, প্রিয়র কথাও বলা হয়েছে। তিনি অস্তি, ভাতি, প্রিয়—একথাও আছে।

মহারাজ : "অস্তি-ভাতি-প্রিয়ং নামরূপঞ্চ তত্ত্বপঞ্চকম্।
আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততদ্বয়ম্।।"

আর কী বল।

—আমাদের মনে হচ্ছিল যে, গীতার দশম অধ্যায়ে ভগবান সবই বলছেন। তাই এখানে কয়েকটি জিনিস মাত্র নিয়ে তাঁর স্বরূপের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে।

মহারাজ : "সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥" (গীতা, ১৩।১৪)

—তিনি তো সবই। শুভটাও তিনি, অশুভও তিনি। তা শুভর এত প্রশংসা করা হচ্ছে, আলোচনা করা হচ্ছে। অশুভের কথা তো তেমন বলা হয়নি।

মহারাজ : কারণ, শুভ আমরা চাই। ঈশ্বরের ভেতরে ভাল-মন্দ কিছুই নাই। আমরা ভাল-মন্দ কল্পনা করি বা দেখি। আমরা মন্দ চাই না। ভালটা চাই। তাই তাঁর ভাল গুণ ও রূপের বর্ণনা করি।

—ভাল রূপের বর্ণনা করে তাঁকে পাওয়া যায়। যেটা মন্দ রূপ সেটার আরাধনা করে কি তাঁকে পাওয়া যাবে?

মহারাজ : না। কারণ তিনি নিখিল হেয়গুণবর্জিত বলে পরিচিত। কাজেই হেয়গুণ দিয়ে তাঁকে পাওয়ার কথা নয়।

—কিন্তু এই যে ভাগবতে পড়ি, কংস—সে তো কৃষ্ণকে দ্বেষ করেছিল।

মহারাজ : হ্যাঁ, সেটা শত্রুভাবে।

—সেইজন্য সে সর্বত্র কৃষ্ণকে দেখতে আরম্ভ করল।

মহারাজ : সেখানে ঐ যে সে তাঁর অবিরাম চিন্তা করেছিল, যেভাবেই চিন্তা করুক—তাঁর বস্তু-ধর্ম অনুসারে তার কল্যাণ। তার চিন্তা বা ধ্যানের বিষয় তো তিনি।

—শাস্ত্র কি ঈশ্বরের অসুন্দর দিকটা বর্ণনাও করেছেন?

মহারাজ : হ্যাঁ, অসুন্দর দিকটা বর্ণনা করেছেন। কত বর্ণনা আছে। স্বামীজীর 'Kali the Mother' কবিতার মধ্যে আছে তাঁর ভয়ঙ্কর রূপের বর্ণনা। ওখানে ভয়কে অতিক্রম করার জন্য ভয়ের আরাধনা। বাঘের বাচ্চা তো বাঘকে ভয় করে না।

—বাঘের বাচ্চাই পারে ওরকম ভয়ঙ্কর রূপের বর্ণনা করতে, আরাধনা করতে।

মহারাজ : একবার রেডিওতে একটি কথিকায় শুনেছিলাম যে, তন্ত্রে অত ভয়ঙ্কর রূপের বর্ণনা ভয়কে অতিক্রম করবার জন্যই।

॥ ৬৮ ॥

প্রশ্ন : গতকাল রামনবমী গেল। রামনবমীর তাৎপর্য কী মহারাজ?

মহারাজ : রামের জন্মতিথি।

—কৃষ্ণের জন্মের সময়ে অনেক সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। তা রামচন্দ্রের যখন জন্ম হয়েছিল, তখন কি এই ধরনের কিছু অলৌকিকতা ছিল, মহারাজ?

মহারাজ : আমার জানা নেই। রামচন্দ্র তো বাল্মীকির রামচন্দ্র। বাল্মীকি-রামায়ণে রামচন্দ্রকে মানুষরূপে দেখানো হয়েছে।

—রামচরিতমানসে রামচন্দ্র ভগবান—এই ভাবটাই বেশি ফুটে উঠেছে।

মহারাজ : রামচরিতমানস তো অনেক পরে। তুলসীদাসের লেখা।

—অধ্যাত্মরামায়ণ বহু পুরনো।

মহারাজ : পুরনো, তবে বাল্মীকির মতো নয়।

—অধ্যাত্মরামায়ণ সম্পর্কে ঠাকুর বলতেন, সেখানে জ্ঞান, ভক্তি দুইয়ের কথাই আছে।

মহারাজ : ঠাকুর মাঝে মাঝে অধ্যাত্মরামায়ণের কথা বলতেন। সেখানে রামকে ঈশ্বররূপেতেই দেখা হয়েছে।

—কৌশল্যা ও অন্য রানিদের সন্তানাদি হচ্ছিল না। দশরথ যজ্ঞ করেছিলেন। যজ্ঞের অবশিষ্ট চরু খেয়েছিলেন রানিরা। তাতেই রামচন্দ্রাদির জন্ম হয়েছিল।

মহারাজ : হ্যাঁ, চরু খেয়ে জন্ম। যজ্ঞের চরু।

—চরু জিনিসটা কী মহারাজ?

মহারাজ : চরু হল, যজ্ঞে একটা জিনিস আহুতি দেওয়া হয়, সেই জিনিসটা।

—সেই ধরনের যাগযজ্ঞ এখন আর নেই। ঠাকুর বলছেন কলিতে, বেদমত চলে না।

মহারাজ : না। যা আছে তা-ও সেই পূর্বের স্মৃতি অনুসারে করা হয়। আগের মতো ধারণা নেই। প্রধান কথা, সোমযাগ যে করবে, সোমই

নেই। সোমলতা ছেঁচে, তার রস করে, সেই রস ব্যবহার হতো যজ্ঞে।

—মহারাজ, সেই কী যেন একটা গল্প আছে সোমলতা সম্বন্ধে—

মহারাজ : এরকম আছে, যে যজ্ঞ করবে তার সোমলতা চাই। তা গাড়ি করে একজন সোমলতা বিক্রি করতে এসেছে। তা বলে, কত দাম দেবে? সে বলে—তুমি বল। রাজা বলছে—এত। তার উত্তরে সে বলল—'রাজা সোম ততয়ো ভূয়ান্'—রাজা সোমের দাম তার চেয়েও বেশি। এরকম করে বাড়তে বাড়তে তাঁর সর্বস্ব দিয়ে—তাতেও 'রাজা সোম ততোয় ভূয়ান্'। তখন রাজা সোমলতা লুটে নিল। অর্থাৎ ভাব হচ্ছে এই, সোমলতা অমূল্য। তাকে মূল্য দিয়ে কেনা যায় না।

—লুটে নেওয়ার তাৎপর্য কী?

মহারাজ : মানে হচ্ছে, তাকে কেনা যায় না। কেউ কেউ বলে, সোমলতা পুঁইশাকের মতো। পুঁইশাককে অনেকে অপছন্দ করে। বলে, পূতিকা ব্রহ্মঘাতিনী—তা জীবকে ভুলিয়ে দেয়। আর সোমলতার রসকে ফারমেন্ট করে খেত—মাদক হিসেবে।

প্রশ্ন : শ্রীমর লেখা কথামৃত পড়লে আমাদের মনে হয় যে, ঠাকুর বলছেন—ভগবানের নামগুণগান কর, তাঁর ভজনা কর, তাঁকে দর্শন কর। আর ওদিকে স্বামীজীর বই পড়লে মনে হয়—লোকের উপকার কর। তার দ্বারাই জগৎ-হিত হবে এবং নিজেরও হিত হবে।

মহারাজ : ও, তাহলে জপধ্যান করো না!

—আমি সেটা বলিনি। আমাদের মনে যেটা বেশি প্রভাব বিস্তার করে, সেটাই বললাম। এক ঠাকুরের কাছ থেকে কথা শুনে দুজন দুরকম কথা ভাবছেন কেন, সেটাই হল কথা।

মহারাজ : কথা হচ্ছে, যিনি যেরকমভাবে ঠাকুরকে হাজির করেছেন। মাস্টারমশাই একরকমভাবে উপস্থাপন করেছেন।

—আবার স্বামীজী তাঁর মতো প্রচার করেছেন। তাঁরা যেরকমভাবে বুঝেছেন সেরকম উপস্থাপন করেছেন।

মহারাজ : তাই তো।

—কিন্তু ঠাকুর তো আদর্শ সম্পর্কে একরকম কথাই বলবেন। একজনের কাছে যেরকম বলবেন, অন্যের কাছেও তো সেইরকমই বলবেন।

মহারাজ : যে যেমন বোঝে। মাস্টারমশাই কর্মের দিকটা প্রথমদিকে স্বীকার করতে পারেননি। শ্রীমা যখন বলেছেন, তখন বলছেন—তাহলে না মেনে আর উপায় নেই।

—কিন্তু তার পরেও কথামৃতের যে শেষ খণ্ড বেরিয়েছিল—পঞ্চম খণ্ড, সেখানেও ভগবদ্দর্শনের কথাই বেশি করে বলেছেন। আগে যো সো করে কালীদর্শন কর। তারপরে না হয় কাঙালী বিদায় করা যাবে—যত খুশি পার। মাস্টারমশাই সেবাভাবটা নিতে পারেননি। আর শুধু তিনি কেন, স্বামীজীর গুরুভাইরাও এটাকে প্রথমে নিতে পারেননি।

মহারাজ : না, তা বলব না। গুরুভাইরা স্বামীজীকে গুরুর মতো মনে করতেন। কাজেই—

—মেনে নিয়েছেন।

মহারাজ : খুব, খুব মেনে নিয়েছেন।

—তবে সকলেই নয়। যেমন শরৎ মহারাজের কাছে এধরনের কোন ভাবের বৈপরীত্য আমরা পাই না।

মহারাজ : শরৎ মহারাজের লীলাপ্রসঙ্গের ভিতর পাও না কিছু?

—না, আমরা বলছি স্বামীজীর ভাবের বিপরীত ভাব শরৎ মহারাজের মধ্যে কখনো দেখি না। শরৎ মহারাজ দেখছি স্বামীজীর চিন্তার সাথে একই পর্যায়ে রয়েছেন।

মহারাজ : আর গঙ্গাধর মহারাজ?

—আর কয়েকজন, লাটু মহারাজ বিশেষ করে যেন অন্যরকম।

মহারাজ : আর বাবুরাম মহারাজ?

—বাবুরাম মহারাজ প্রথমে নাকি স্বামীজীর কর্মযোগ নিতে পারেননি।

মহারাজ : কে বলেছে?

—ঐরকম ওঁর জীবনীতে আছে। তার মধ্যে পাওয়া যায়। যখন তিনি কাশীতে গেলেন, স্বামীজীর বইগুলো খুব পড়লেন তখন উনি স্বামীজীর

কর্মযোগের মাহাত্ম্য বুঝলেন। তখন উনি বললেন—না, না, আমি স্বামীজীর শিষ্য। স্বামীজীর কাজ আমি পছন্দ করি।

মহারাজ : তাহলে নিতে পারেননি বলা যায় কি?

—মানে মনেপ্রাণে গ্রহণ করা—সেইটা তাঁকে প্রথমদিকে ততটা টানেনি। পরে স্বামীজীর সেবার ওপরে বক্তৃতা দিলেন মালদাতে। তখন উনি সেবাধর্মের কথা খুব প্রচার করলেন। কিন্তু প্রথম পর্যায়ে তিনি তো একটু অন্যরকমই ছিলেন।

মহারাজ : প্রথম পর্যায়ে যেকেউ যেমনই হোক, কিছু যায় আসে না। স্বামীজীও তো বলেছিলেন, আমি সমাধিতে ডুবে থাকতে চাই। স্বামীজীও তো তাহলে প্রথম পর্যায়ে নেননি।

—লাটু মহারাজ মঠের নতুন নিয়মকানুন পালন করতে পারবেন না বলে বেরিয়ে গেলেন।

মহারাজ : লাটু মহারাজের ক্ষেত্রে স্বামীজী বলেছিলেন, ওর ক্ষেত্রে কোন নিয়মকানুন নেই। লাটু মহারাজ বেরিয়ে গেলেন না। কোনদিন ঢুকেছিলেন কি? (সকলের হাসি)

—মহারাজ, আপনি লাটু মহারাজকে দেখেছেন?

মহারাজ : না, লাটু মহারাজ সম্বন্ধে আমার একটা অস্পষ্ট স্মৃতি যেন আছে। কিন্তু সেটা ঠিক নির্ভরযোগ্য নয়। মনে হয়, যখন বলরাম মন্দিরে ছিলেন, সে-সময় তাঁকে একবার দেখেছি।

—তাহলে আপনি দেখেই থাকবেন। উনি এখান থেকে গেলেন ১৯১৯ না ১৯২০ সালে।

মহারাজ : কাশীতে চলে গেলেন। তারপর আর আসেননি। কাজেই ঐরকম সময় হলে আমার দেখার কথা। একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে, বলরাম মন্দিরে হরি মহারাজ যেদিকে থাকতেন, তার বিপরীত দিকে উনি থাকতেন।

—বিবেকানন্দ-ভাইয়ের মঠ করা সার্থক হয়েছে—উনি নাকি ভক্তদের এই কথাও বলতেন।

মহারাজ : হ্যাঁ, বলতেন—লোরেনভাইয়ের মঠ করা সার্থক হয়েছে। কত ছেলেরা আসছে। তবে শোন, আমাদের সময়ে অনেকেই কাজ করত না। জপধ্যান করত।

—আপনি বলেন কৃষ্ণলাল মহারাজের কথা।

মহারাজ : কৃষ্ণলাল মহারাজ ঠিক কী কর্ম করতেন, জানি না। তবে সকালে কুটনো কুটতেন এসে। আর ফুল তুলে দিতেন।

—আপনারা তো ওঁকে অনেক দেখেছেন।

মহারাজ : তা দেখেছি। আর তিনিও আমাকে খুব দেখেছেন।

—মহারাজ, আপনি তো বলেন, ঠাকুরের পার্ষদদের মধ্যে আপনার সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে। তা মহাপুরুষ মহারাজ নিজে থেকে স্বামীজীর প্রসঙ্গ কিছু করেননি আপনাদের সঙ্গে?

মহারাজ : খুব করেছেন। স্বামীজীর ওপরে খুব শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন—এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

॥ ৬৯ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, কয়েকদিন একটু একটু করে আমরা আপনার কাছ থেকে মহাপুরুষ মহারাজের কথা কিছু শুনব—

মহারাজ : দেখা যাক, কতটা মনে পড়ে।

—আজ বুদ্ধপূর্ণিমা মহারাজ।

মহারাজ : মঠে বুদ্ধের পুজো হয় তো? মূর্তির সামনে?

—বুদ্ধদেবের মূর্তি আমাদের আছে। ওপর থেকে নামিয়ে সাজানো হয়।

মহারাজ : মূর্তিকে রঙ করা হয়?

—হ্যাঁ। শুনেছি এক-আধবার রঙ করা হয়েছিল।

মহারাজ : এখন আর হয় না?

—সম্প্রতি হয়েছিল কিনা জানি না, আগে হয়েছিল একবার।

মহারাজ : যাহোক, তোমরা কখন এলে?

—কিছুক্ষণ আগে।

মহারাজ : কিছু বল।

—কোন্নগরে কাঞ্চীপুরমের শঙ্করাচার্য এসেছেন, তাই দেখতে গিয়েছিলাম।

মহারাজ : দেখে এসেছ?

—হ্যাঁ।

মহারাজ : তারপর?

—তারপর আমরা আপনার কাছে চলে এলাম।

মহারাজ : শঙ্করাচার্যকে প্রণাম করেছিলে?

—না, আমরা দূর থেকে দর্শন করেছিলাম।

মহারাজ : নিরাপদ দূরত্ব থেকে? (সকলের হাসি)

—আমরা যেরকম প্রণাম করি, ঐরকম প্রণাম নাকি ওঁদের মধ্যে প্রচলিত নেই। ঐ হাতজোড় করা মাত্র।

মহারাজ : হাত জোড় করে না। ভক্তরা গড়াগড়ি দিয়ে প্রণাম করে। ভূলুণ্ঠিত হয়ে।

—ও আচ্ছা। গড়াগড়ি? ভূলুণ্ঠিত হয়ে? একজন সাধু আর একজন সাধুকে কিরকমভাবে প্রণাম করে?

মহারাজ : কোন্ সাধু, সাধারণ না শঙ্করাচার্যকে? আমি একবার আমাদের ওখানে—কালাডিতে জুনিয়র শঙ্করাচার্যকে দেখতে গিয়েছিলাম। মাটিতে বসতে হল। মেঝেতে। তিনি সিংহাসনে বসে ছিলেন। আমরা মেঝেতে বসে রইলাম।

—ঐরকমই। এখনো ঐরকমই শুনি।

মহারাজ : হ্যাঁ। আমিও এরকমই শুনি। এরকমই দেখেছি। একবার আমি—যদিও আমার নিজের আগ্রহে যাইনি, আমাদের কালাডি আশ্রমের মঠাধীশ আমাকে জোরাজুরি করে নিয়ে গেলেন। তারপরে ফিরে আসার পর বললাম, তুমি যে নিয়ে এলে—আমি সন্ন্যাসী, আমার নিজের জন্য কোন কথা নয়, কিন্তু আমি একটা মঠের অধ্যক্ষ—প্রতিনিধি। আমাকে তো সেজন্যে সম্মান দেখানো উচিত ছিল। তা কিছু তো দেখালেন না। বলে—তাই তো। এটা কী হল?

—আপনি মহারাজ, শঙ্করাচার্যের সাথে কথা বলেছিলেন?

মহারাজ : কথা বলা বিশেষ হয়নি। তিনি ভক্ত নিয়ে কথা বলছিলেন। আমি কথা বলেছিলাম কিনা, মনে নেই।

—কথা বললে কিসে বলতে হয়, সংস্কৃতে?

মহারাজ : হুঁ। না হলে ওদের ভাষায়।

—মানে স্থানীয় ভাষায়?

মহারাজ : হ্যাঁ, স্থানীয় ভাষায়। তা দেখলাম, ভক্তরা আসছে, গড়াগড়ি দিচ্ছে। সংস্কৃত কলেজ দেখতে গিয়েছিলাম। তিনি তখন কলেজে অধিষ্ঠান করছিলেন। আর একবার মাইশোরে একজন শঙ্করাচার্য এসেছিলেন। তা আমাদের সিদ্ধেশ্বরানন্দ স্বামী ওখানকার মঠের অধ্যক্ষ। বললেন—চলুন যাই, দর্শন করে আসি। আমি বললাম যে, আমি কিন্তু গড়াগড়ি দিতে পারব না। আর তা না করলে ভক্তদের মনে আঘাত লাগবে। সুতরাং যাওয়াই উচিত নয়। তবে আমাদের উত্তর ভারতের প্রথামতো 'ওঁ নমো নারায়ণায়' করলে ভক্তরা যদি আপত্তি না করেন, তাহলে আমার আপত্তি নেই। তা আমি গেলাম ওখানে, আর 'ওঁ নমো নারায়ণায়' করলাম। তার উত্তরে তিনি 'ওঁ নমো নারায়ণায়' বললেন না। বললেন না এই কারণে যে, যাদের বলছেন তারা তো তাঁর চেয়ে অধস্তন। কাজেই তিনি 'নারায়ণায়' বলে ছেড়ে দিলেন। উত্তরাখণ্ডেও এরকম প্রচলিত।

প্রশ্ন : পার্বণ-শ্রাদ্ধ নাকি সন্ন্যাসীকে করতে হয়?

মহারাজ : অ্যাঁ?

—মৃত সন্ন্যাসীর উদ্দেশে পার্বণ-শ্রাদ্ধ নাকি করতে হয়?

মহারাজ : কী? পার্বণ-শ্রাদ্ধ?

—হ্যাঁ।

মহারাজ : মৃত সন্ন্যাসীর? মৃত সন্ন্যাসীর আবার করণীয় কী আছে?

—কিন্তু ওঁরা সব বলছেন যে, 'যতিধর্ম নির্ণয়' নামে যে-বই আছে, তার মধ্যে বলা আছে—অশৌচ পালন, তর্পণ, একোদ্দিষ্ট, সপিণ্ডীকরণ এগুলো নিষিদ্ধ।

মহারাজ : কোন্‌টা সিদ্ধ?

—বলছেন যে, এগারো দিনে পার্বণ-শ্রাদ্ধ করতে।

মহারাজ : সে আবার কী?

—মৃত সন্ন্যাসীর প্রীতির জন্য ব্রাহ্মণভোজন, নারায়ণ-বলি—এগুলো করতে বলেছেন।

মহারাজ : কিসে বলেছে?

—'যতিধর্ম নির্ণয়' আর 'বশিষ্ঠ স্মৃতি'।

মহারাজ : এরা কিরকম জান?

—কিরকম?

মহারাজ : এরা আধা সন্ন্যাসী।

—আধা সন্ন্যাসী মানে?

মহারাজ : আধা সন্ন্যাসী মানে গৃহস্থের সংস্কার এখনো ভুলতে পারেনি। সন্ন্যাসীর দেহত্যাগের পর একটা ভাণ্ডারা হয়, এইমাত্র।

—ভাণ্ডারা আমাদের এখানে তেরো দিনের দিন কী করে হয় মহারাজ?

মহারাজ : ঐ তো সংস্কার অনুযায়ী হয়। কোন বিধান আছে নাকি?

—শুনেছি উত্তরাখণ্ডে নাকি এগারো দিনে বা ষোলো দিনে হয়।

মহারাজ : ষোলো দিন—ও।

—আমরা শুনেছি, তেরো দিনে নাকি বেলুড় মঠেই শুধু হয়, অন্য কোথাও হয় না। আর দু-এক জায়গায় হয় ষোলো দিনে। গৃহস্থদের হয় তেরো দিনে।

মহারাজ : কোনখানে দশ দিনেও হয়। গৃহস্থদের দশ দিনেও হয়। আমাদের তার ওপর চড়িয়ে দিল আরো তিন দিন। যাহোক, সন্ন্যাসীর শ্রাদ্ধ করতে হবে—এমন কোন বিধান নেই। বিধান আবার কী! ত্যাগ হল, বৈরাগ্য হল, আর দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ রইল না। আর করবার কী আছে তাহলে? এই কি আজ ভাল কথা হল?

—আমরা তাই ভাবছি, খারাপ কথা কোন্‌টা হল?

মহারাজ : সকাল থেকে শ্রাদ্ধ করছি। আসল কথা কী জান, এসব কথাগুলো মনের ভিতরে গজগজ করছে, কাজেই ভাল কথা আর বেরচ্ছে না।

—তাই।

মহারাজ : আর ভাল কথা মানেই হচ্ছে, বেদান্ত। বল, কী prompt করল, বল না।

—কী prompt করল? বলছে যে—সাধারণ মানুষের যে প্রারব্ধ ভোগ করতে হয়, জ্ঞানীরও কি সেই প্রারব্ধ ভোগ করতে হয়?

মহারাজ : একটা কথা আছে—

"প্রারব্ধ সিদ্ধ্যতে তদা যদা দেহাত্মনা স্থিতি।
দেহাত্মভানৈবে স্যাৎ প্রারব্ধ কুতঃ?"

প্রারব্ধ মানে দেহটাকে যদি আমি বলে মনে হয়, তাহলে তার প্রারব্ধ আছে। আর দেহটাকে আমি বলে মনে করাটা তো সন্ন্যাসীর পক্ষে যোগ্য নয়। সুতরাং প্রারব্ধ ছেড়ে দাও। কার প্রারব্ধ? যে কর্ম করে তার প্রারব্ধ। আমি কর্ম করিনি, আমার আবার প্রারব্ধ কী? বুঝেছ?

—জ্ঞান হওয়ার পরে এই বোধটা হল যে, আমি কর্ম করিনি।

মহারাজ : জ্ঞানের আবার আগে-পরে হয় নাকি? জ্ঞানটা কি অন্য কিছুর জ্ঞান? তাহলে তার নাশও হয়ে যাবে।

—ঠিক কথা। কিন্তু এই আমরা যে অজ্ঞানের পর্যায়ে আছি, সেক্ষেত্রে তো জ্ঞান হয় আর যায়।

মহারাজ : আরে, জ্ঞান হয়েছে যখন, তখন জ্ঞানের ফল বলতে হবে তো। জ্ঞান মানেই দেহাত্মবুদ্ধি ত্যাগ। এখন না তখন বলে কোন কথা নেই। কোন দিনও দেহকে আত্মা বলে মনে করাটা সত্য ছিল না। ভ্রম—মিথ্যা, ভ্রমের পরিণামে যে ক্রিয়া হয়, সেগুলি কী করে সত্য হবে?

—ভ্রমের ক্রিয়া যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ ভ্রমের ক্রিয়া তো ভোগ করতে হবে—

মহারাজ : তা বলে সন্ন্যাসী স্নান করবে না? খাবে না? ভিক্ষা, শৌচ এগুলি করবে না? কে, করবে কে? দেহ দিয়ে এগুলি করতে হবে। তার দেহ নেই। তাহলে কী করে করবে?

—কিন্তু করেন তো দেখতে পাচ্ছি।

মহারাজ : যা দেখতে পাই এ তো অজ্ঞানীর দেখার মতো। সেটা ভ্রম-দৃষ্টি।

—আমরা দেখছি, আবার যিনি করছেন, তিনিও তো বলছেন—আমি খাচ্ছি, আমি চলছি—এমনটা তো জ্ঞানীও বলছেন।

মহারাজ : এ আরোপিত।

—জ্ঞানী নিজেরটাই নিজে আরোপিত ভাববে? ভুল ভাববে?

মহারাজ : তাঁর 'আমি'টা যে মিথ্যা সেটা মানা উচিত তো? 'আমি' তো নেই তাঁর।

—কিন্তু তিনি তো বলছেন, আমি আছি।

মহারাজ : না না। কথা হচ্ছে তার জ্ঞান হয়েছে কিনা। যদি জ্ঞান হয়েছে বলে থাকে তাহলে সে অজ্ঞান—কারণ জ্ঞানটা উৎপন্ন হয় না, বিনাশ হয় না। কাজেই তার জ্ঞান হয়েছে মানে—জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, তাহলে জ্ঞানের বিনাশও হবে।

—জ্ঞান বলতে মহারাজ, কিরকম জ্ঞান?

মহারাজ : তত্ত্বজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞান মানে, সেটা কি তার বৃত্তিতে উদ্ভাসিত হয়েছে? বৃত্তিজ্ঞান? বৃত্তিটাই তো একটা ভ্রম। আরোপ।

—বৃত্তিটা একটা ভ্রম। তাহলে এই যে তত্ত্বজ্ঞান, এটা তাহলে বৃত্তিজ্ঞান নাকি? কিন্তু এই যে ব্রহ্মের নির্বিকল্প জ্ঞান হয়, সেটা কী? সেটাও বৃত্তিজ্ঞান নাকি?

মহারাজ : জ্ঞান হয় বললেই বুঝতে হবে জ্ঞান নাশ হয়। যাকিছু হয়, তার নাশও হয়।

—তা এইখানে যে বৃত্তিজ্ঞান, সেই বৃত্তিজ্ঞান কি তবে নাশ হবে?

মহারাজ : সবই নাশ হয়।

-ব্রহ্মাশ্রিত বৃত্তিজ্ঞান?

মহারাজ : চিন্তাধারাটা আছে, সেইজন্যে সেখানে ব্রহ্মের বৃত্তিজ্ঞান। সেটাও বৃত্তিজ্ঞান আর যদি তা হয় তো সে-বৃত্তি নাশ হবে।

—সে সবই হবে।

মহারাজ : তা বলে জ্ঞান নাশ হবে কী করে? তখন মুশকিল, বিপদে পড়ে যায়। বলে, তার নাশ করবে কে? বৃত্তি দ্বারা বৃত্তিনাশ তো হবে না। তাহলে তার নাশ করবে কে? ফিটকিরি যেমন জলে মিশে নিজে আপনা-আপনি নিঃশেষিত হয়, তেমনি ব্রহ্মাকারা বৃত্তি অজ্ঞান দূর করে নিজে লুপ্ত হয়ে যায়। মৃন্ময়ী কলেবর—এইসব কথা বলে।

—সেটাই যখন তার বৃত্তিজ্ঞান আসে, বৃত্তিজ্ঞান তো হয়। বৃত্তিজ্ঞান দিয়ে সে তার অজ্ঞানটা নাশ করে।

মহারাজ : হ্যাঁ, ঐ যে বলে বৃত্তিজ্ঞান আপনি নাশ হয়ে যায়। তা যদি হয়, তো কিরকম করে হয়? দৃষ্টান্ত একটা দেখিয়ে দিল। এই বিজ্ঞানের যুগে ওকথা বলা চলে না। ফিটকিরির আকারটা বদলে যায়, নাশ হবে কোথায়? জলে তা মিশে রইল! আসল কথা কী জান? জ্ঞানের কচকচিতে কিছু হবে না। কারো হয়নি, কারো হবেও না। জ্ঞানের কচকচি একবার তোমার মত খণ্ডন করছে, অতএব আমাকে তোমার মত খণ্ডন করতে হবে। এরকম করে খণ্ডন-মণ্ডন চলবে। কাজেই জ্ঞান একে বলে না। শোন, দেহাত্মবুদ্ধি যদি চলে যায় তবে তাকে বলে জ্ঞান। দেহাত্মবুদ্ধি চলে গেলে জ্ঞান উৎপন্ন হল—এমনটা নয়। দেহাত্মবুদ্ধি চলে যাওয়া মানে—আত্মার উপর যে দেহরূপ আবরণ ছিল, সেটা চলে গেল। কাজেই জ্ঞানটা নাশও হল না, উৎপাদ্যও হল না।

—আসি মহারাজ।

॥ ৭০ ॥

প্রশ্ন : আজ আপনি কিছু বলুন।

মহারাজ : আমি বলব কী! আমি তো তোমার কাছে শুনতে চাই।

—মহারাজ।

মহারাজ : তেমন ভাল কথা কিছু হবে নাকি?

—হবে, মহারাজ।

মহারাজ : বল বল, তাড়াতাড়ি বল।

প্রশ্ন : আমরা যে 'ভগবানলাভ' 'ভগবানলাভ' কথাটা বলি, প্রকৃতপক্ষে এর অর্থ কী? আমাদের কী লাভ হয়?

মহারাজ : ভগবানলাভ? এর একটা মজার গল্প আছে—গোপাল ভাঁড়ের। (সকলের হাসি) গল্পটা হচ্ছে—গোপাল ভাঁড় ছেলেকে রাজার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। বলতে বলেছে—বাবার কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়েছে। সে তো গিয়ে বলেছে। রাজা সে-সংবাদ শুনে খুব দুঃখিত হলেন। বললেন—ভাল করে শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা কর। টাকাকড়িও দিয়েছেন। তারপরে একদিন গোপাল ভাঁড় এসে হাজির। রাজা বললেন—কী ব্যাপার? ছেলে এসে আমায় বলে গেল, তোমার কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়েছে। তখন গোপাল কাপড়ের কোঁচড়ে লুকানো কৃষ্ণ বার করল। বলল—এটা প্রাপ্ত হয়েছি, মহারাজ। (সকলের হাসি)

—কী বলছেন, মহারাজ? এরকম ভগবানলাভ?

মহারাজ : তোমরা তো শুধু গল্প শুনতে চাও, তাই বললাম। এবার তোমরা একটা গল্প বল।

—বলব? এইমাত্র একটা গল্প শুনলাম। আকবর জিজ্ঞাসা করছেন বীরবলকে যে, আমাদের উপুড়হাতে লোম থাকে, আর চিৎহাতে লোম থাকে না কেন?

মহারাজ : অ্যাঁ?

—হাতের চেটোতে লোম নেই কেন? বীরবল বলে—আপনি কত দান করছেন, সেইজন্য এখানে লোম গজাতে পারছে না। আকবর বললেন, তা তুমি তো দান কর না। তাহলে তোমার হাতেও এইখানে লোম নেই কেন? বীরবল বললেন—মহারাজ, আপনি দান করছেন, আর আমরা তো তা গ্রহণ করছি। তখন আকবর বললেন—এরকম লোক দেখা যায়

যারা দানও করে না, গ্রহণও করে না; তাদের হাতের চেটোতে লোম থাকে না কেন? বীরবল বললেন—তারা দানও করতে পারছে না, আবার নিতেও পারছে না। তখন মনের দুঃখে কপাল চাপড়াচ্ছে। সেইজন্য এখানে লোম গজাচ্ছে না। (সকলের হাসি)

প্রশ্ন : ঠাকুরকে স্বামীজী বলেছেন—অবতারবরিষ্ঠ। আবার ঠাকুর বলেছেন, যে রাম যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'—ভাগবতে বলেছে। তাহলে ঠাকুর অবতার এবং ভগবান দুইই?

মহারাজ : যাঁর থেকে সব অবতারেরা আসেন, তিনি হলেন ভগবান স্বয়ং। স্বামীজী এক জায়গায় ঠাকুরকে বলেছেন—অবতারের বাবা।

—কারণ, ঠাকুর একইসঙ্গে ভগবান এবং অবতার?

মহারাজ : ভগবান এবং অবতারের বাবা।

—স্বামীজী বললেন, অবতারবরিষ্ঠ।

মহারাজ : ঐ হল, বরিষ্ঠ মানে বাবা।

॥ ৭১ ॥

মহারাজ : অ— তোমাকে খুঁজছিলাম। কোথায় তুমি? খালি তোমার মিষ্টি গলাটা শুনতে পেলাম।

—বলছি মহারাজ, স্বামীজী ছোটবেলায় একবার নিজেদের বাড়িতে খেলতে খেলতে পড়ে গিয়েছিলেন। তাতে জোর আঘাত পান। খুব রক্ত পড়েছিল। দাগ হয়ে গিয়েছিল। সারা জীবন সেই দাগটা ছিল। পরে যখন ঠাকুরের কাছে এসেছেন, ঠাকুর কারণ জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন, কী কারণে দাগটা হয়েছিল। তখন ঠাকুর বলেছিলেন, প্রচুর রক্তপাত হয়ে শক্তি যদি ওর না কমে যেত তাহলে—

মহারাজ : জগৎটাকে উলটে দিতেন।

—সামান্য একটুখানি অজ্ঞান হয়ে গেলেন, আর রক্তপাত হল। তাতে জগৎটাকে উলট-পালট করার মতো শক্তি কমে গেল!

মহারাজ : সামান্য একটু—তুমি কী করে জানলে?

—আমরা যা বইতে পড়ছি, আধঘণ্টা অজ্ঞান হয়ে ছিলেন।

মহারাজ : আধঘণ্টা অজ্ঞান হওয়া কি একটু রক্তপাতে হয়? পৃথিবী উলট-পালট করে দিতেন মানে কি এই পৃথিবীটাকে ধরে অন্য কক্ষে ছুঁড়ে ফেলে দিতেন?

—সেইরকম একটা কিছু হবে? না, ভাবজগতে বিরাট একটা আন্দোলন হবে? কোন্‌টা?

মহারাজ : একটা আন্দোলন হবে, আলোড়ন হবে। এই আর কী।

—আলোড়ন। তা আমরা তো বলছি, তিনি একটা আলোড়ন তুলেছেন।

মহারাজ : এর থেকে বিরাট আকারে হতো।

—আরও বিরাট আকারে হতো! কিন্তু এধরনের একটুখানি দুর্ঘটনা হল—আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে সেটার কী সম্পর্ক?

মহারাজ : না, তা নয়। তবে ঠাকুরের দৃষ্টি নিয়ে দেখতে হবে তো! আমাদের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে হবে না।

—আর এঁরা তো আধিকারিক পুরুষ। এঁরা যে-উদ্দেশ্যে এসেছেন, সে-উদ্দেশ্য তো সফল করবেনই।

মহারাজ : এই তোমাদের আধিকারিক পুরুষ কোত্থেকে নিয়ে এলে আবার!

—স্বামীজী সম্পর্কে ঠাকুর তো বলেছেন, সে সপ্তর্ষির ঋষি।

মহারাজ : "যাবৎ অধিকারং আধিকারিণাং"—অধিকারীরা কতকটা অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন।

—সেই তো। সেই অধিকারটা হল জ্ঞানের পর শরীর থাকা।

মহারাজ : আধিকারিক পুরুষ যাঁরা তাঁদের যতদিন অধিকার আছে ততদিন দেহ থাকবে। তা সেটা কি স্বামীজীর পক্ষে প্রযোজ্য হবে?

—স্বামীজীর বেলায় তো ঠাকুর বলছেন, তিনি ঈশ্বরকোটি—মানে নিত্য পুরুষ। তাঁরা এই জগতে অবতারের সঙ্গে আসেন একটা বিশেষ কার্য সাধন করতে। তাঁরা জ্ঞানলাভ করেই আসেন।

মহারাজ : তাহলে মিলল না তো।

—আপনি বলছেন, সাধনা করে জ্ঞানলাভ করে তারপর দেহ থাকবে—আপনি বলছেন, এটা আধিকারিক পুরুষের কথা। স্বামীজীর বেলায় সেটা মিলছে না।

মহারাজ : তাহলেই তো হল। আমি তাই-ই বলছিলাম।

—কিন্তু আধিকারিক পুরুষের কথায় বলা হয়, শুধু এক জন্ম কেন, কয়েক জন্ম নিয়ে তাঁরা—

মহারাজ : আমি কি একটা জন্ম বলেছি? 'যাবৎ অধিকারং আধিকারিণাং'—যতদিন অধিকার ততদিন তিনি থাকবেন। দেহ থাকবে। অর্থাৎ এক দেহে না হলে দু-চার দেহও হতে পারে।

—না, যেহেতু আমরা ওঁদের কথার মধ্যে পাচ্ছি যে, তাঁরা নিত্যসিদ্ধ পুরুষ, জ্ঞানী পুরুষ। এটাই বলতে চাইছি আমি।

মহারাজ : সপ্তর্ষির এক ঋষি।

—এসব কথা তো বলা হয়েছে, তার মানে তাঁরা—

মহারাজ : তাঁরা অখণ্ডের ঘর। এসব কোন জায়গায় মিলিয়ে নেওয়া যায় না। অসুবিধা হয়। অখণ্ডের আবার ঘর কী?

—বিশ্বরূপানন্দ স্বামী অখণ্ডের ঘর সম্বন্ধে বিশাল article লিখেছিলেন। তিনি মনে করেছেন, অখণ্ডের ঘর বলতে ব্রহ্মলোক বোঝায়।

মহারাজ : ব্রহ্মলোক মানে যেখানে সাধন করে পৌঁছানো যায়।

—উনি বলেছেন, অখণ্ড যে ব্রহ্ম, তাঁকে যাঁরা লাভ করেছেন—তাঁরাও অখণ্ড বা ব্রহ্মস্বরূপ হয়েছেন এবং তাঁরা অখণ্ডের ঘরে যাবেন।

মহারাজ : তাঁতে বাস করবে কী করে?

—তাঁদের অধিকারলাভ হয়েছে বলে, তাঁদের এক জায়গায় তো থাকতে হবে। সেটা। তাঁদের তো ব্রহ্মলোকে থাকতে হবে।

মহারাজ : কী যে বলে তার ঠিক নেই। ব্রহ্মলোক মানে কি? 'লোক্যতে ভুজ্যতে ইতি লোক।' কাজেই তা তো আর ভৌগোলিক অবস্থান কিছু নয়।

—না।

মহারাজ : তবে?

—তাঁদের তো মায়ার আবরণে ঢেকে রাখতে একটা লোক, মানে জায়গা চাই।

মহারাজ : তাঁদের মায়ার আবরণ রাখতে হলে তো একটা স্থান দরকার হয় না।

—না, স্থানের কথা হচ্ছে না। ব্রহ্মলোকের অবস্থানের কথা নয়।

মহারাজ : ব্রহ্মলোক স্থান তো।

—না, স্বামীজীও বলেছেন—কোন ভৌগোলিক স্থান নয়।

মহারাজ : হ্যাঁ, ঠিক বলেছ।

—এরকম কোন স্থানের অস্তিত্বের কথা স্বামীজীও অস্বীকার করেছেন।

মহারাজ : কাজেই 'লোক' মানে ওরকম নয়। তার একটা মানস অবস্থান বোঝানোর জন্য বলা হয়। তাই এরকম উল্লেখ আছে। ধ্রুবলোক, অমুক লোক, তমুক লোক—এসব আছে। ধ্রুব জ্ঞানলাভ করেছিলেন। তারপর একটা লোক হয়ে গেল।

—আমরা তো ব্রহ্মলোক বা সত্যলোক বা অমুক লোক সব বলি—

মহারাজ : শুধু তা কেন, রামকৃষ্ণলোকও বলি।

—যেমন বৃহদারণ্যকে আছে, আত্মলোক। আত্মার তো কোন লোক হয় না। আত্মলোক বলতে আত্মাকেই বোঝায়।

মহারাজ : আত্মলোক সবই তো নয়। ব্রহ্মলোকেরও প্রয়োগ আছে।

—'লোক' শব্দটার অর্থ অনেক রকম, নরলোকও আছে।

মহারাজ : পরলোকও আছে।

—যাহোক মহারাজ, যাবৎ অধিকারের কথা যেটা বললেন, যাবৎ অধিকার—সেটা কি প্রারব্ধ বলে ব্যাখ্যা করা যায়?

মহারাজ : যতদিন তাঁর লোকহিতকর কাজের জন্য দেহ রাখা দরকার, ততদিন তিনি থাকবেন।

—তাকেই আমরা প্রারব্ধ বলি তো।

মহারাজ : তাঁদের ক্ষেত্রে প্রারব্ধ নয়। প্রসঙ্গ বুঝে বলতে হবে। 'যাবৎ অধিকারং আধিকারিণাং'—যাঁরা অধিকারী পুরুষ তাঁদের যতদিন অধিকার ততদিন তাঁরা থাকবেন।

—এই যে যতদিন অধিকার, মানে জ্ঞানলাভের পরেও শরীর থাকছে, দেহ থাকছে বলেই তো আমরা একে প্রারব্ধ বলি।

মহারাজ : কার শরীর থাকছে?

—অধিকারীর।

মহারাজ : হ্যাঁ। অধিকারী মানে তিনি জ্ঞানী কিনা?

—প্রসঙ্গটা তো জ্ঞানীর ক্ষেত্রেই।

মহারাজ : জ্ঞানী যদি হয়, তার দেহ কোথায়?

—সে-প্রসঙ্গটাই তো এসে যাচ্ছে। তাহলে কি জ্ঞান হয়নি বলব? যাঁদের আধিকারিক পুরুষ বলছি—

মহারাজ : এটা আমাদের লৌকিক ব্যাখ্যাতে বলছে।

—জনক রাজাকে বলা হয় জ্ঞানী।

মহারাজ : জনক রাজা?

—জনক রাজা কি আধিকারিক পুরুষ?

মহারাজ : তাঁকে জিজ্ঞেস করতে হবে। (সকলের হাসি)

—জনক রাজার কথা কেন, স্বামীজীর কথাই ধরি না। স্বামীজীর কথা তো আমরা জানি, ঠাকুর তাঁকে নিত্যসিদ্ধ বলেছেন।

মহারাজ : তাহলে আধিকারিক মানে—স্বামীজীর শরীর কবে যাবে?

—যতদিন তাঁর অধিকার থাকবে।

মহারাজ : তারপরে যাবে তো?

—গেছে তো।

মহারাজ : কী জানি, যদি না যায়? (হাসি)

—তাহলে সাধারণ প্রারব্ধের সঙ্গে এটার তফাত কী?

মহারাজ : না, এই যে তুমি বললে, অধিকারী পুরুষের তো তিন-চার জন্ম হতে পারে। তো স্বামীজী আবার কোন্ জন্ম নেবেন, তা কে জানে! তুমি জান নাকি?

—তা জানি না। কিন্তু তাঁর যদি অধিকার বাকি থেকে থাকে তাহলে আসবেন, ঠিক আছে। কিন্তু যখন থাকছেন, সে-প্রসঙ্গটুকু, মানে জ্ঞানলাভের পরে যতক্ষণ দেহ আছে তাঁদের সেটাকে প্রারব্ধবশে বলা যায় কিনা—

মহারাজ : জ্ঞানলাভের পরে যতক্ষণ দেহ আছে? মোটেই থাকে না।

—মোটেই থাকে না?

মহারাজ : না।

—তাহলে কে জ্ঞানদান করছে? তাহলে তাঁর জ্ঞান—তাঁর কথাগুলো কি জ্ঞানীর কথা বলে ধরা হবে?

মহারাজ : যদি দেহ তাঁর বলে বোধ হয়, তাহলে তাঁর দেহবোধ থাকে। কিন্তু দেহ তাঁর বলে বোধ হয় না তো। 'অহংমমাভিমানরহিতবিশেষ', তাহলে?

—তিনি দেহবুদ্ধিরহিত কিনা আমরা কী করে বুঝব?

মহারাজ : তোমার কথায় তাই তো বলছ?

—তাতে তো আমরা ঠাকুরের কথা দিয়ে বলছি যে, ঠাকুরের—

মহারাজ : তিন-চার পুরুষ ধরে জন্মান তিনি। তিন-চারটে দেহ যদি হয় তাঁর, দেহবুদ্ধি তাঁর আছেই ধরে নিতে হবে।

—দেহবুদ্ধি থাকলে দেহধারণ, এটা সাধারণের ক্ষেত্রে, সাধারণ বুদ্ধিতে আমরা মানছি। কিন্তু অধিকারীদের ক্ষেত্রে সেটা কি মানব? এটাই হচ্ছে আমার কথা।

মহারাজ : দেহবুদ্ধি থাকলে জ্ঞান হবে না।

—তাহলে তাঁদের আমরা জ্ঞানী ধরব না? তাহলে শাস্ত্র উপদেশ করছেন যাঁরা, প্রেমের কথা বলছেন—

মহারাজ : সবই আরোপিত। "ন যুপতে গুঞ্জাপুঞ্জান অন্যান্যারোপিত বহ্নিনা।"

—মানে মহারাজ? অর্থ?

মহারাজ : গুঞ্জাফল পেকে আছে। লাল রং। দূর থেকে দেখে মনে হয় আগুন লেগেছে। সেই আগুনে কি গুঞ্জাফল পোড়ে? কাজেই জ্ঞানীর

দেহ আছে বলে যে বলছি, সেটা অপরের আরোপিত কথা। তাতে কি জ্ঞানীর কিছু আসে যায়?

—মহারাজ, একটা কথা আমাদের বলুন, এই যে আধিকারিক পুরুষের কথা বলা হচ্ছে—তাঁর যতদিন অধিকার থাকবে, ততদিন তিনি তাঁর শরীর নিয়ে থাকবেন, এটা বলা হচ্ছে—মুক্ত তিনি হবেন না। তাহলে এই অধিকারের কালটা কী করে নির্ণয় করছে? বা কে নির্ণয় করছে?

মহারাজ : অধিকারের কাল আমরা নির্ণয় করতে পারব না।

—আমরা পারছি না! কেন?

মহারাজ : জ্ঞান হয়েছে, তাও কি আমরা নির্ণয় করতে পারি?

—না, তা-ও পারি না।

মহারাজ : তবে? প্রথম কথা হচ্ছে, জ্ঞান যে হয়েছে—তা যদি নির্ণয় করতে না পারি, তাহলে তাঁর অধিকার নির্ণয় করব কী করে?

—না, আমরা করছি না।

মহারাজ : তাহলে?

—তাঁর অধিকার যে রয়েছে, বলা হচ্ছে, অধিকার যতদিন থাকবে ততদিন শরীর নিয়ে থাকবেন।

মহারাজ : যতদিন থাকবেন ততদিন তাঁর অধিকার ছিল বলা হল।

—এই অধিকারটা কে কাকে দিচ্ছে, কে নির্ণয় করছে, এটাই আমরা বলছি।

মহারাজ : নির্ণয় কেউ করছে না। কথা হচ্ছে, নির্ণয় করছি আমরা। দিচ্ছে না কেউ। তিনি নিজে রাখছেন জগৎ-কল্যাণ করবার জন্য।

—তাতে কি জ্ঞানের সঙ্গে বিরোধ হচ্ছে না?

মহারাজ : জ্ঞানের সঙ্গে বিরোধ হচ্ছে না। তাঁর যে ক্রিয়াটা আছে, তাঁর জ্ঞানের সঙ্গে সেটার বিরোধ নেই। যেহেতু, সেখানে কারণ নেই কার্যও নেই। মিথ্যা কার্যেতে জ্ঞানের সঙ্গে বিরোধ হয় না। আজ এই অবধি থাক।

—ঠিক আছে মহারাজ।

মহারাজ : থাক, তবে তুমি কিন্তু পালিয়ে যেও না। তোমাকে ধরে রেখেছি।

—যাচ্ছি না, মহারাজ।

॥ ৭২॥

মহারাজ : কিছু ভাল কথা হোক।

—বলা হয় যে, সাধনার সিদ্ধি নির্ভর করে সাধকের আন্তরিকতার ওপর।

মহারাজ : 'যৎসাধন তৎসিদ্ধি'—সাধনাই সাধনার সিদ্ধি।

—সিদ্ধি নির্ভর করে সাধকের ব্যাকুলতার ওপরে। তার কতটা চেষ্টা, আন্তরিকতা—সেটার ওপরে। কারণ এব্যাপারে খ্রিস্টানরা বলেন—আমাদের ধর্মে বলা হয়েছে, এই জন্মটাই আছে, এর পরের জন্মে ঠিক হবে স্বর্গে যাব, না নরকে যাব।

মহারাজ : তাঁদের মতে, পরের জন্ম বলে কিছু নেই। গোর থেকে যথাস্থানে (স্বর্গ অথবা নরক) নিয়ে যাবে।

—এই ভাবনার মধ্যে তীব্র প্রচেষ্টার তো একটা কারণ আছে। খুব চেষ্টা করবার জন্য আমরা একটা আগ্রহ বোধ করব। কারণ, এর পরে আমার আর সুযোগ থাকবে না। হিন্দুদের এই পুনর্জন্মবাদ মানার ফলে, তাদের এই সুযোগটা থাকে।

মহারাজ : কোন্‌টা ভাল? সুযোগ থাকাটা, নাকি না থাকাটা?

—এটা আমাদেরও প্রশ্ন মহারাজ। পরপর সব জন্ম থাকবে, ধীরে-সুস্থে হবেখন। এত তাড়াহুড়ো করে কী হবে! এরকম একটা মনের ভাব এসে যায় আমাদের।

মহারাজ : তোমরা একেবারে বাজে।

—এধরনের যুক্তির পিছনে তাৎপর্য কী মহারাজ?

মহারাজ : কিসের তাৎপর্য?

—এই যে—এই ধরনের ভাবনা বা তত্ত্ব দেওয়া হচ্ছে।

মহারাজ : আমাদের ভাবনা বা তত্ত্ব যেটা আছে সেটা তো খুব বাস্তব ও যুক্তিপূর্ণ।

—কিরকম?

মহারাজ : এই যে সকলের সুযোগ আছে।

—সুযোগ আছে, তবে এত চেষ্টা এত লড়াই এই জন্মেই করতে হবে, তার তো দরকার নেই। এরকম একটা শিথিলতা এসে যায়।

মহারাজ : যদি এই জন্মেই করতে হবে—এই বোধ না থাকে, তাহলে প্রবল আন্তরিকতা থাকবে কেমন করে?

—থাকবে না তো। প্রবল আন্তরিকতাহীনদের তো থাকার সুযোগ দেখছি না। এটা বলছি।

মহারাজ : তুমি কি হিন্দু, না মুসলমান, না খ্রিস্টান?

—হিন্দুও নই, মুসলমানও নই—কিছুই নই। এখন কথাটা যেরকম উঠেছে, সেরকম প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি। এইরকম প্রশ্নটা করা হচ্ছে যে, খ্রিস্টান-মতে এইরকম পরবর্তী জন্মের সুযোগ কোথায়? এটা বললাম। ওরা মানে পুনর্জন্ম? যেটা আমরা বলছি সেটা?

মহারাজ : মানে, Life after death—এবিষয়ে সকলে এক মত। তবে মৃত্যুর পর যে কী হবে, তা—সে-সম্বন্ধে সন্দেহ সকলের আছে। মরে দেখতে হয়। কিন্তু মরবার পর কে দেখবে, তা জানি না।

—কিন্তু মহারাজ, এই ধরনের যে বিভিন্ন সব মত, এগুলো তো প্রকৃত সত্যকে পরিবর্তন করতে পারে না। যেটা বস্তু, সেটা তো তার স্বরূপেই থাকবে। পুনর্জন্ম আছে কিনা, তা কি আমাদের মত বা ওদের মতের ওপর নির্ভর করবে?

মহারাজ : না।

—তবে? এই তো কথা।

মহারাজ : এগুলো মত। এগুলো তত্ত্ব নয়।

—আমরা এটা নিয়ে মারামারি করছি। কিন্তু আমার তো মনে হয় যে, যেটা আছে, সেটা আছে। তাকে আমরা পরিবর্তন করব কী করে?

মহারাজ : মারামারি যে খুব করছি, তা-ও নয়। বরং ভাবছি, আচ্ছা ঠিক আছে। দেখা যায়েগা।

—এইরকম। হ্যাঁ।

মহারাজ : দেখা যায়েগা।

প্রশ্ন : মহারাজ—

মহারাজ : বল।

—বলছি। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, আমার সমগ্র জীবনটাই স্বপ্নের সমাবেশ। সচেতন স্বপ্নচারী হওয়া আমার জীবনের উচ্চাভিলাষ।

মহারাজ : সচেতন— ?

—স্বপ্নচারী।

মহারাজ : হ্যাঁ।

—'সচেতন স্বপ্নচারী' বলতে কী বোঝাচ্ছে?

মহারাজ : ও আন্দাজে হবে না। মূল জায়গাটা দেখতে হবে। তাহলে বোঝা যাবে—কী।

—তাহলে এই জায়গাটা পড়ছি, মহারাজ। Context-টা একটু পড়ছি। "এই সকল পার্থিব সংগ্রাম ও দ্বন্দ্বের জন্য আমি জন্মাইনি। স্বভাবত আমি স্বপ্নচারী ও শান্তিপ্রিয়। আমি আজন্ম আদর্শবাদী। স্বপ্নজগতেই আমার বাস। বাস্তবের সংস্পর্শ আমার স্বপ্নের বিঘ্ন ঘটায় ও আমাকে অসুখী করে তোলে। ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।" এর পরেই বলছেন— "আমার সমগ্র জীবনটাই স্বপ্নের পর স্বপ্নের সমাবেশ। সচেতন স্বপ্নচারী হওয়াই আমার উচ্চাভিলাষ।"

মহারাজ : স্বপ্নের পর স্বপ্ন মানে—প্রত্যেকটা দিনের অভিজ্ঞতাই স্বপ্ন। স্বপ্নের পর স্বপ্ন পরপর চলছে।

—প্রত্যেকটা দিনের অভিজ্ঞতাই স্বপ্ন, মানে? এটা তো বাস্তব সত্য। স্বপ্ন কেন?

মহারাজ : সত্য নয়। সত্য যেটা, সেটা অপরিবর্তনশীল। পরিবর্তনশীল মানেই সেটা সত্য নয়।

সচেতন স্বপ্নচারী হওয়া বলতে— ?

মহারাজ : সচেতন স্বপ্নচারী স্বামীজী কেন বলেছেন, সেটা আমরা জানি না। আমরা আমাদের বুদ্ধি দিয়ে বলতে পারি। এই জীবনটা যদি স্বপ্ন হয়, আর যদি আমি এবিষয়ে সচেতন থাকি, তবে জীবনটাকে সদ্ব্যবহার করবার জন্য একটা আগ্রহ মনে থাকবে। এই হল সচেতনতার মানে।

—যদি জীবনটা স্বপ্ন হয়, তাহলে তো সেটা মিথ্যাই। তাহলে কেন আগ্রহ থাকবে?

মহারাজ : আমরা অসুখ হলে ডাক্তারের কাছে যাই। অসুখ বা রোগটা স্বপ্ন বলে বসে থাকি কি? আমার যেমন রোগের বোধ হলে সেটা সারাবার জন্য চেষ্টা হয়। রোগটাও যদি স্বপ্ন হয়, সারাবার চেষ্টাও স্বপ্ন হয় তাহলে স্বপ্নের স্বপ্ন হল এবং এই রোগরূপ স্বপ্ন সারানো যায়—তার জন্য একটা ব্যাকুলতা। এটাই হল খুব effective life-এর চিহ্ন। এই যে অনেকে বলে—আমরা সংসারী জীব, আমাদের কি আর ওসব হবে? তার মানে, কোনদিন হবে না। যে ভাববে সংসারী জীব, তার সংসার কখনো ঘুচবে না। আমি যা আছি, তার চেয়ে better হতে পারি। একথা আমাদের মনে বিশ্বাস আছে বলে আমাদের সমস্ত কাজকর্ম চলছে। তা না হলে তো আমাদের আর আশা নেই।

—শুধু সংসারীদের কেন, আমাদেরও সেরকম ব্যাকুলতা, আগ্রহ আসছে কোথায়?

মহারাজ : আমাদের, ওদের কথা নয়। কথা হচ্ছে যে, যুক্তির। ব্যক্তির কার্য-কারণ মিলিয়ে দেখতে হবে। একজন সমস্ত জীবনটা সৎভাবে কাটাল, আর মৃত্যুকালে তার হয়তো কষ্ট বেশি হল। তার মানে কি? তাহলে এর পর কী হবে? কষ্টই হবে। কষ্টের প্রতিকারের জন্য কোন সুযোগ তো তার হল না। এজন্যেই আশাবাদী হতে হবে। বলা হয়, 'Every saint has a past and every sinner has a future.' যা হয়ে গেছে তাতে আমাদের আর হাত নেই। কিন্তু যা হবে তার জন্য আমাদের জীবনের প্রস্তুতি প্রয়োজন, সচেতনতা আনতেই হবে। একি তোমরা যে চললে—

—হ্যাঁ। মহারাজ, সময় হয়ে গেছে। আমরা আসি।

মহারাজ : এস। শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।

॥ ৭৩ ॥

মহারাজ : কি হল আজ তোমাদের আসতে দেরি হল?

—হ্যাঁ মহারাজ, জেনারেল সেক্রেটারি মহারাজ ডেকেছিলেন।

মহারাজ : একটা কথা তোমাদের বলি, আমাদের সাধুদের এই যে designation দিয়ে বলা—জেনারেল সেক্রেটারি, প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট—এগুলো আগে ছিল না। কবে থেকে যে আরম্ভ হল, এ আমি এখনো ভাবতে পারছি না। এটা আমাদের ভাল লাগে না।

—গম্ভীর মহারাজও বলতেন, আমরা তো প্রেসিডেন্ট মহারাজ—এরকম বলতাম না, নাম ধরেই তো বলতাম।

মহারাজ : হ্যাঁ, তাই তো।

—উনি বলতেন, আমাকে তো সবাই গম্ভীর মহারাজই বলত; জেনারেল সেক্রেটারি—এরকম তো কেউ কখনো বলত না।

মহারাজ : এই যে এখন এরকম বলা হচ্ছে—আর কি বদলানো যাবে?

—কেন মহারাজ? চেষ্টা করলেই এটা অন্যরকম হবে। করলেই হয়।

মহারাজ : তাহলে চেষ্টা কর আজ থেকে।

—তারপর প্রাচীন সাধুদের মধ্যেও এ বিষয়ে কথাবার্তা হয়। যেসব শব্দ আজকাল আমরা ব্যবহার করি, এতে আমাদের ভাবজগতের কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। আমরা আগের ভাব থেকে সরে যাচ্ছি—এরকম পুরনো সাধুরা বলেন। এটা তাঁরাও পছন্দ করেন না।

মহারাজ : গতানুগতিক যেন না চলে।

—এটা এসে গেছে কয়েক বছরের মধ্যে। এটা যেতে সময় লাগবে একটু।

মহারাজ : যাওয়ার জন্য চেষ্টা চাই তো।

—তা তো বটেই।

মহারাজ : সচেতনতা চাই। মহাপুরুষ মহারাজকে আমরা এভাবে কেউ প্রেসিডেন্ট মহারাজ বলতাম না। শরৎ মহারাজকেও কেউ সেক্রেটারি মহারাজ বলতেন না।

—মহাপুরুষ মহারাজই বলতেন? ওনার তো একটা common নাম ছিল, মহাপুরুষ মহারাজ। কিন্তু আমাদের যেন মহারাজদের নাম ধরে বলতে একটু সঙ্কোচই হয়।

মহারাজ : তা জেনারেল সেক্রেটারি বললে সঙ্কোচটা চলে যায়?

—আপনারা শরৎ মহারাজকে কী বলতেন—শরৎ মহারাজই তো বলতেন।

মহারাজ : হ্যাঁ। আর কী বলব? তা তাঁর কাছে কি 'আপনি শরৎ মহারাজ'—এইরকম বলব?

—সেই কি কখনো হয়, মহারাজ? আমরা অপরের সাথে যখন কথা বলছি—

মহারাজ : তখন শরৎ মহারাজই বলি।

—ঠিক আছে, আপনি যখন কথাটা বললেন, তখন ভালই হয়েছে।

মহারাজ : আমি এটা শুধু বললামই না—আমার অন্তরে এটা লাগছে। প্রাচীন কাল থেকে মহারাজকে জানি, সবাই 'মহারাজ' বলে। প্রেসিডেন্ট বলে জানতাম না। শরৎ মহারাজকে 'শরৎ মহারাজ' বলেই জানি। সেক্রেটারি বলে জানতাম না। এ তো সব designation, পরিবর্তনশীল designation রয়েছে। কাজেই এতে তাঁর নিজের পরিচয় কিছু নেই।

—এই designation ব্যবহারে নিজেদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্কটা কমে যায়?

মহারাজ : হ্যাঁ। একেবারে formal হয়ে যায়।

—হ্যাঁ, official, formal হয়ে যায়। ঠিক আছে মহারাজ।

মহারাজ : এখন থেকে সঙ্কল্প কর—আর এরকম বলব না।

—আমরা চেষ্টা করব, মহারাজ। তারপর confusion হচ্ছে ভাইস প্রেসিডেন্ট মহারাজদের নিয়ে।

মহারাজ : হ্যাঁ।

—কোন্ ভাইস প্রেসিডেন্ট বোঝা যায় না।

মহারাজ : তিনজন ভাইস প্রেসিডেন্ট আছে, ভাইস প্রেসিডেন্ট মহারাজ বললে কি বোঝা যাবে কিছু?

—হ্যাঁ, ওরকম বললে অসুবিধা হয়। ঠিক আছে, চেষ্টা করব।

মহারাজ : আচ্ছা, বেশ।

॥ ৭৪ ॥

মহারাজ : বার্মা যাবে?

—বার্মা কী করতে যাব মহারাজ? আবার ভিজিট শুরু হচ্ছে নাকি?

মহারাজ : বার্মাতে ওরা ভিসা দেয় না।

—ও, ভিসা দেবে না! তাহলে?

মহারাজ : সুতরাং ওখানে যাওয়া যায় না। তবে আমি গিয়েছিলাম। তা আমাকে এরোড্রামে বসিয়ে রাখল কিছুক্ষণ। ওরা ওদিকে সরকারের লোকেদের সঙ্গে, কাস্টম ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে যে, আমাদের অনুমতি দেওয়া হবে কিনা। তারপর শেষপর্যন্ত অনুমতি দিলেও আমাকে একটা লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে হল—কোনরকম ধর্মীয় কাজকর্ম করব না।

—ওরা তো ভয় পেয়ে গেছিল religious leader-দের সম্পর্কে।

মহারাজ : হ্যাঁ, ভাবল যে এরা বিক্ষোভ করবে। ধর্মান্তর করবে। Conversion কর, তাতে আপত্তি নেই। Burmese করতে হবে। Non-Burmese-দের স্থান নেই। হিন্দু যারা আছে, তারা Burmese Civilian হয়ে আছে। কাজেই তাদের থাকতে বাধা নেই। একজন হিন্দু প্রচারক আছে। সরকার থেকে মাইনে পায়। আর বিনা পয়সায় ঘোরে সব জায়গায়। কিন্তু বাইরের লোক যেতে পারবে না।

—মানে এরা Burmese race। এটাতেই ওরা stick করে।

মহারাজ : Burmese race-এ বাঙালি সব। আমি উঠেছিলাম। বাঙালি মেয়ে সব। তারপর ভক্ত। তারা বারবার, বাংলাদেশে যেমন হয়, প্রণাম

করে এসে। তারা বলল যে, আপনারা আসুন—আমরা একটু বাঁচি তাহলে। বললাম, আমি কী করে আসব, ভিসা দেবে না। তোমাদের খরচ করতে হবে না। আমি নিজের খরচে আসব। কিন্তু ভিসা তোমাদের জোগাড় করে দিতে হবে।

—মহারাজ, যে-হাসপাতালটা আমাদের ছিল, ওটা আছে এখনো?

মহারাজ : হ্যাঁ। যারা ওখানকার নাগরিকত্ব নিয়েছে, তারা আছে।

—তারা আছে! হাসপাতালটা চলছে?

মহারাজ : হাসপাতালটা সরকার নিয়ে নিয়েছে।

—সরকার চালাচ্ছে?

মহারাজ : চালাচ্ছে, কিন্তু তার অবস্থা বেহাল। হাসপাতালের কর্মীরা বলতে লাগল, আপনারা আগে যখন ছিলেন, কী সুন্দর হাসপাতাল ছিল। এখন সব নষ্ট হয়ে গেছে। আমি হাসপাতালে গিয়েছিলাম। আমি যখন গেলাম তখন ওখানে আমাদের কর্মী ছিল যারা, একজন তার ঘরে নিয়ে গিয়ে দেখাল। ঠাকুরের ছবিটবি আছে। কিন্তু বাইরে কিছু করার উপায় নেই।

—ঠাকুরের ভক্তরা তো এখনো আছেন সব?

মহারাজ : হ্যাঁ, কিছু আছে। আর বেশি থাকবে না। ক্রমশ ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে তো। একজন Burmese গৃহিভক্ত, নাম পি তান। আমাকে বলল যে, আমার এই ছেলেপুলেদের আপনি দীক্ষা দিন। আমি বললাম, আমি অঙ্গীকার করেছি, এইখানে ধর্মীয় কার্যকলাপ করব না। কী করে দেব? সে বলল যে, বাইরে দেবেন না। আমার ঘরে আমার টেবিলে বসে দিন। তাই দিলাম। তার অনুনয় দেখে আর থাকতে পারলাম না। গেলাম। তার স্বামীর দীক্ষা হল, তার ছেলের দীক্ষা হল, তার পুত্রবধূর দীক্ষা হল। তাদের ছজনের দীক্ষা হল।

—মহারাজ, ওখানকার লোক এইখানে এসে দীক্ষা নিয়ে যেতে পারবে? নাকি, তাও পারবে না?

মহারাজ : আসতে পারলে তবে তো।

—আসতেও দেবে না?

মহারাজ : ফৌজি সরকার সহজে দেবে না। এই দেখ না, কেউ আসে না।

—আমাদের সঙ্গে সম্পর্কটা আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে আর সেই সম্পর্কটা থাকছে না।

মহারাজ : না। কিন্তু ভক্ত রয়েছে। আর ঐ আমাদের Association যেটা ছিল, Society-র সেক্রেটারি যে—সে আবার Burmese বিয়ে করেছে। বিয়ে করে সে আবার more than a Burmese। এখনো সেখানে ঠাকুরের মন্দিরটা আছে। মন্দিরের কিছু করেনি। কিন্তু তার পাশে একটা হল ছিল। সেখানে বুদ্ধকে বসিয়েছে বিস্তর জাঁকজমক করে। ঠাকুরের ঐ একই রকম অবস্থা। কোণঠাসা হয়ে আছেন। ভক্তরা খুব দুঃখিত। কিন্তু কী করবে!

—এই একবারই গিয়েছিলেন আপনি বার্মায়?

মহারাজ : ঐ একবারই যথেষ্ট।

—কোন্ বছর, মহারাজ?

মহারাজ : কোন্ বছরে তা বলতে পারব না।

—জাপান থেকে ফেরবার সময়?

মহারাজ : হ্যাঁ। জাপান থেকে ফেরবার সময় গিয়েছিলাম। ফিজি হয়ে।

—যখন আমাদের আশ্রম ছিল, তখন গিয়েছিলেন?

মহারাজ : না। এখনো সেই Society আছে—চারতলা বিশাল বাড়ি। কিন্তু সেটা আর আমাদের নেই।

—আমাদের নেই। এই তো মুশকিল।

মহারাজ : ওরা বলে, আপনারা যদি এটাকে সরকারের হাত থেকে বাঁচাতে চান, তাহলে এখানকার ভক্তদের নামে রেজিস্ট্রি করে দিন। Society-তে আমাদের নাম ছিল। শেষে ওটাই করবার permission দেওয়া হল। রেজিস্ট্রি করে নাও।

—আচ্ছা, সেটা এখন ওরা রেজিস্ট্রি করেছে।

মহারাজ : জানি না, তবে ওখানে গিয়ে খুব কষ্ট হল দেখে।

—সে-তুলনায় বাংলাদেশে বরং একটু ভাল। সেখানে আমাদের কয়েকটা আশ্রম আছে, সাধুরাও আছে।

মহারাজ : কোথায়?

—বাংলাদেশে।

মহারাজ : হ্যাঁ, বাংলাদেশে আছে।

—ওখানে আমাদের সাধুরাও আছেন, আশ্রমও আছে।

মহারাজ : যতদিন ভেঙে না দেয়, ততদিন আছে।

—তা তো বটেই। যখন খুশি বললেই হল, আর কী!

মহারাজ : সিলেটে তো ঠাকুরের মূর্তি ভেঙে-টেঙে একাকার করে দিল।

—সিলেটে তো করেছিল। আবার হবিগঞ্জেও।

—রেঙ্গুন আশ্রম কত সালে নিয়েছে আমাদের কাছ থেকে?

মহারাজ : কত সালে তা আমার মনে নেই।

—ছয়ের দশকে নিয়েছে?

মহারাজ : দশক-টশকও মনে নেই।

—এক নোটিশেই সমস্ত কিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে আসতে হয়েছে।

মহারাজ : হ্যাঁ। স্বামীজীর statue ছিল, সেও সরিয়ে আনতে হল।

—রেঙ্গুনে কি এমনটা হয়েছিল, মহারাজ? রেঙ্গুনের স্বামীজীর মূর্তি এখন মাইশোরে রাখা আছে।

মহারাজ : মাইশোরে?

—হ্যাঁ, মাইশোরে। রেঙ্গুন থেকে আনা।

মহারাজ : হসপিটালে মূর্তিটা প্রতিষ্ঠিত ছিল। Hospital hand over করা হল। বলল—মূর্তিটা সরিয়ে নাও। তা মূর্তি আমরা সরিয়ে নিলাম।

—তা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, ভালই হয়েছে।

মহারাজ : না, ভেঙে দেবে এরকম নয়। আসলে, ওখানে আর Non-Burmese কিছু থাকবে না। কিছু না। Non-Burmese হওয়ার উপায় নেই।

—অর্থাৎ, হিন্দু হোক, বৌদ্ধ হোক, Burmese হতেই হবে।

মহারাজ : হ্যাঁ।

—পাকিস্তানের করাচিতে আমাদের centre ছিল। লাহোরে ছিল?

মহারাজ : করাচিতে ছিল, কিন্তু সব লুট করে নিল।

—আর লাহোরেও ছিল? আমাদের centre?

মহারাজ : লাহোরে আরো মারাত্মক। লাহোরের সন্ন্যাসীরা ওখান থেকে পালিয়ে কোনরকমে বেঁচেছিলেন। অবশ্য আশ্রয় পেয়েছিলেন মুসলমানদের ঘরেই। লুকিয়ে রাত্রে পথ চলত। আর দিনের বেলায় কোথাও লুকিয়ে থাকত। কিন্তু aggressive যারা—তারা দেখতে পেলে আর প্রাণে রাখত না।

—রেঙ্গুনেও তো হয়েছিল?

মহারাজ : ওখানে সেরকম নয়। ওখানে Non-Burmese থাকতে দেবে না—এটাই মূল কথা।

—ওখানে violence কিছু করেনি। করাচিতে তো একেবারে লুট করে নিয়েছে। সামনে থেকে জিনিস নিয়ে চলে গেছে।

মহারাজ : লাহোরে আইন ছিল না। রেঙ্গুনে আইন ছিল। তবে ফৌজি আইন। আমাকে এরোড্রোমে অপেক্ষা করতে হল। কাস্টমস-এর অফিসাররা ক্ষমা চাইল। বলল, আমরা কী করব বলুন! সরকারের এই রকম আইন। তারা লজ্জা বোধ করল।

—ওরা খুব অসুবিধা বোধ করছিল।

মহারাজ : হ্যাঁ। এই অবস্থা।

—তবে এই এখন তো martial law। সেটা পরিবর্তন হলে যদি কিছু উন্নতি হয়।

মহারাজ : একবার হয়েছিল। ওখানকার একজন Judge, সে আমাদের মঠে লিখেছিল যে, এখন আইন-কানুন অনেকটা বদলেছে। আপনারা আবার আসুন। তা আর হল না। অবশ্য সে একটু বেশিই আশাবাদী ছিল।

—ওখানকার অবস্থা ভালরকম পরিবর্তন না হলে ওখানে গিয়ে আবার আমরা একটা ঝামেলায় পড়ে যাব।

মহারাজ : তারপর যখন আমাদের হসপিটালটা ওদের হাতে দিয়ে চলে আসছে, সত্যকৃষ্ণ (স্বামী আত্মস্থানন্দ) তখন ছিল—তা ওরা বলল, আমরা আপনাদের যাবার ভাড়া দেব। ও বলল, আপনাদের ভাড়া দিতে হবে না। আমরা চলে যাব।

—এভাবে একটু কৃতজ্ঞতা জানাল আর কী!

মহারাজ : সত্যকৃষ্ণ বলল, এত মেহেরবানী করতে হবে না। আশ্চর্য, Burmese সরকার হিন্দু ধর্মপ্রচারকদের মাইনে দেয়! ধর্মপ্রচারের জন্য।

—আসছি মহারাজ।

॥ ৭৫ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, নতুন সন্ন্যাসীরা আজ সব দলবেঁধে ভিক্ষায় বেরচ্ছে—

মহারাজ : দলের ভেতর তোমরাও ঢুকে পড়।

—আমরা তো আগে ঢুকে পড়তাম।

মহারাজ : এত উৎসুক কেন?

—ইচ্ছে তো হয় ঢুকি। তবে এবার যাব না মহারাজ। ওসব জানা হয়ে গেছে। গেলে এমন অবস্থায় পড়ি, না-ও করতে পারি না। মঠের গেটে ভক্তরা দাঁড়িয়ে থাকেন। না নিলেও ছাড়বেন না।

মহারাজ : পুরনোরা আবার নতুন সাজতে চায়। বেরতে উস্‌খুস্‌ করছে। আমি বলি কী বাবা, যে যাবে—General Secretary-র কাছ থেকে permission নিয়ে যাও।

—ওরে বাবা! আপনি একেবারে General Secretary—

মহারাজ : High Court। আমাকে তো সোজা মানুষ পাবে। আদায় করে নেবে। আমার তো ওদের সঙ্গে ঘর করতে হবে।

—ঠিকই তো। তবে ভিক্ষা করতে মহারাজ সাধ করে যেতে ইচ্ছা করে না। ঐ কষ্ট করে যাওয়া।

মহারাজ : না। তবু নানারকম আছে কিনা। দুরকম আছে—একটা, কষ্ট করব, অন্যটা ঔৎসুক্য বাহাদুরী। কতরকম আছে।

—ঔৎসুক্য বাহাদুরী—এসব আছে। সত্যি বলছি। ঔৎসুক্য এমন—গতবার এলাহাবাদে যখন পূর্ণকুম্ভ হল, তখন গিয়েছিলাম। টিকিট দিত বিভিন্ন সব আখড়া থেকে। ভাণ্ডারা হবে। তা এক একদিন দুটো তিনটে করে টিকিট আসত। (হাসি) আমি যেতাম। দেখতাম—সাধুরা কী করে।

মহারাজ : তা, প্রণামী কী পরিমাণ দিত?

—সে এমন কিছু না। ৫ টাকা, ১০ টাকা—এই।

মহারাজ : তোমাদের কাছে কিছু নয়, অ্যাঁ? তোমাদের কাছে কিছু নয়। অন্যদের কাছে অনেক কিছু।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঠিকই। তবে দেখতাম—আমাদের সম্মান করত, মহারাজ। অন্যদের হয়তো ৫ টাকা। আমাদের বলত—১০ টাকা দিয়েছি। আপ রামকৃষ্ণ মিশন সে আয়া হ্যায়।

মহারাজ : তার মানে জান তো? আবার এদের কাছে তো যেতে হবে। সেবাশ্রমের সেবা নিতে হবে। ওটা যে দিত, ওটা দাদন দিত। (সকলের হাসি)

প্রশ্ন : ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাসের আগে, মুণ্ডনের পরে আগের জামাকাপড় ছাড়তে হয়—

মহারাজ : মুণ্ডনের পরে?

—হ্যাঁ, ঐ জামা কাপড়—

মহারাজ : সেই সময় ত্যাগের জীবন আরম্ভ করল। তবে যা নিয়ে আরম্ভ করল—তার মাথা মুড়িয়ে দিল—

—তারপর—

মহারাজ : জামাকাপড় ত্যাগ। একটা একটা করে ছাড়তে হবে তো! (সকলের হাসি) প্রথমে চুলগুলো ছেড়ে দিলে। তারপর জামা-কাপড়ও ছেড়ে দিলে!

—কাপড় না। ঐ জামা—সেলাই করা জামা।

মহারাজ : জামা আবার সেলাই না করে হয় নাকি? (সকলের হাসি)

প্রশ্ন : "রাজরাজেশ্বর দেখা দাও। করুণাভিখারী আমি করুণা নয়নে চাও।"—এরকম প্রার্থনা করব কেন?

মহারাজ : তা না হলে তো উপায় নেই। তিনি রাজরাজেশ্বর যদি না হতেন, তাঁর কাছে চেয়ে লাভ কী? তিনি যদি করুণাময় না হন, তা আমায় করুণা করবেন কোথা থেকে? এইজন্য এরকম প্রার্থনা করতে হয়।

—যারা ঈশ্বরবিশ্বাসী নয়, যারা ঈশ্বরকে মানে না, তাদের কাছে তো এই সব কথার কোন—

মহারাজ : তারা বলেও না কিছু। ঈশ্বরকে মানে না, তা আবার দয়াময় আর করুণাময় বলবে কেন?

—যিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না তিনি যদি প্রশ্ন করেন, তাকে কী করে বোঝাবেন?

মহারাজ : আমার বিশ্বাসের কথা না বললে কপটতা হবে।

—যিনি ঈশ্বরকে দয়াময় বলছেন তাকে যিনি ঈশ্বরকে মানেন না তিনি যদি প্রশ্ন করেন যে, কেন তুমি ঈশ্বরকে দয়াময় বলছ?

মহারাজ : সে বলবে, আমরা তাঁর দয়ার ওপর নির্ভর করি বলে তাঁকে দয়াময় বলি। জেনে বলি না। প্রার্থনা করি।

—একেই বলে বিশ্বাস।

মহারাজ : বিশ্বাস থাকলে আর দয়াময় বলতে হবে কেন? অ্যাঁ? "ছাগকণ্ঠ রুধিরের ধার ভয়ের আকার। নাম দেয় দয়াময়ী।"

—কোন যুক্তি দিয়ে বোঝানো যায় না?

মহারাজ : যুক্তি এই যে—আমরা যা চাই সেই গুণে তাঁকে ভূষিত করি। এই যুক্তি।

—তাঁর এই গুণটা কী করে ঠিক করছি? আমরা যদি আমাদের মনের যা ভাব সেটাই বলছি তাহলে সেটা তাঁর গুণ কী করে বুঝব?

মহারাজ : মনের পাপ?

—মনের ভাব। আমাদের যেরকম মনের ভাব, সেগুলিই ঈশ্বরেরই গুণ বলে আমরা বলছি, তাহলে ঈশ্বরকে যে দয়াময় বলি বা অন্যান্য যে-সমস্ত গুণ সেগুলোর তো বাস্তবতা থাকছে না—সত্যতা থাকছে না।

মহারাজ : সে, ঈশ্বরকে যে জেনেছে সে বলতে পারবে। যে জানেনি সে কী করে বলবে যে তিনি কেমন?

—তা বলতে পারবে না।

মহারাজ : কাজেই যে বলে দয়াময়, সে প্রার্থী বলে বলছে—দয়াময়।

—বাস্তবিক যখন তাঁরা ঈশ্বরকে দর্শন করছেন, তখন তো বলেন যে, হ্যাঁ, তিনি দয়াময়। না শুধুই যে তার মনের ভাবটাই চাইছে, তাও নয়।

মহারাজ : শিখ সেপাইরা ঠাকুরকে বলছেন যে, তিনি দয়াময়। ঠাকুর বলছেন, কেন দয়াময়? তাঁর সন্তান তিনি পালন করবেন, তাতে আর বাহাদুরী কী আছে?

—ভগবানের কাছে ঠিক ঠিক প্রার্থনা কী করে হয়?

মহারাজ : ঠিক ঠিক মানে কি আন্তরিকভাবে? আসল কথা হল তাঁর কৃপার ওপর বিশ্বাস রাখা। তাকেই বলে সত্যনিষ্ঠ হওয়া।

—এটার অর্থটা কী?

মহারাজ : অর্থটা হলো, আমি কপটাচারী নই। আমি এমন কিছু বলব না যাতে আমার কোন বিশ্বাস নেই।

॥ ৭৬ ॥

প্রশ্ন : রবীন্দ্রনাথের একটা গল্পে আছে ঐশ্বর্যের মধ্যে থেকে কিভাবে বাসনামুক্ত হতে চাইছে মৃত্যুঞ্জয়—

মহারাজ : পায়ে ধরে সাধা।
রা নাহি দেয় রাধা॥
শেষে দিল রা,
পাগোল ছাড়ো পা॥

— তেঁতুল-বটের কোলে
দক্ষিণে যাও চলে॥ (হাসি)

—আরো আছে মহারাজ—

— ঈশানকোণে ঈশানী,
কহে দিলাম নিশানী।

মহারাজ : কি হল? আবার বল তো।

— ঈশানকোণে ঈশানী,
কহে দিলাম নিশানী।

মহারাজ : মানে কী?

—ঈশানকোণে ঈশানী—দেবী-টেবী কোন কিছু হবে। দেবীর মন্দির ছিল।

মহারাজ : তারপর?

—কহে দিলাম নিশানী। নিশানা থেকে নিশানী। ঠিকানা।

মহারাজ : কহে দিলাম ঈশানী?

—নিশানী।

মহারাজ : ওমা! (সকলের হাসি)

—ঈশানকোণে ঈশানী,
কহে দিলাম নিশানী।

মহারাজ : নিশানী?

—হ্যাঁ।

মহারাজ : এ বার বুঝলাম। গল্পটার নাম মনে আছে?

—হ্যাঁ মহারাজ, রবীন্দ্রনাথের 'গুপ্তধন'।

প্রশ্ন : মহারাজ, একবার দোলের সময় রাজকোট থেকে এসে মঠে ছিলেন। সেসময় মহারাজরা রং মাখিয়ে আপনাকে ভূত বানিয়েছিলেন—সে-ঘটনাটা একটু বলুন।

মহারাজ : সে এক ঘটনা। দোল-টোল আমি খেলতাম না। দুপুরে মন্দির বন্ধের আগে স্নান করে পরিষ্কার জামা-কাপড় পরে ঠাকুর প্রণাম করতে গেছি। করে মন্দিরের বাইরে এসেছি। ঐ-দিকের বারান্দায়। তা, ঠাকুরমন্দিরে একজন কাজ করত কমলা বলে। সে বললে—মহারাজ, মন্দিরে কোন ভয় নেই। এখানে কারো উঠবার নিয়ম নেই। ঠিক আছে, আমি নিশ্চিন্ত—এখানে কেউ আর আসতে পারবে না। দেখছি—তা, ওরা

ওখান থেকে আমাকে দেখেছে। পুণ্যানন্দ আর বিমুক্তানন্দ। দুজন এসেছে। আমি ভাবলাম—এলে কী হবে? এখানে উঠে রং দিতে পারবে না। ও বাবা! উঠে চলে এল। এসে আমাকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে চলে গেল। (সকলের হাসি) আমি বলি, আরে শোন শোন! আরে, থাম থাম। আমার জামা-কাপড় সব নতুন। আর কে কার কথা শোনে? নিয়ে গিয়ে মঠ-চত্বরে গোলা রঙের ড্রামে ফেলে চুবিয়ে ধরল। (সকলের হাসি) আমি ভাবছি, আমার চশমা ভেঙে যাবে। কলমটা যাবে। কী হবে! নখ-টখগুলো রঙিন হয়ে গেল। আর কী করব। ওদের কিছু বলে লাভ নেই তো!

—মহারাজ, চিন্তাহরণ মহারাজ তখন রোগা ছিলেন?

মহারাজ : চিন্তাহরণ মহারাজের কথা—রোগা নয়, এই রকমই।

—তা, এরকমই ভুঁড়িটা ছিল? (সকলের হাসি)

মহারাজ : ভুঁড়ি ছিল। তবে এত ছিল না। ক্রমশ বেড়েছিল। ক্রমশ—ক্রমবর্ধমান।

—তা আপনাকে পুণ্যানন্দ মহারাজ, বিমুক্তানন্দ মহারাজ ধরে নিয়ে গেল?

মহারাজ : হ্যাঁ। আমি যতই বলি, আরে থাম থাম! করছ কী! তা কে কার কথা শোনে!

—আপনি নতুন জামা-কাপড় পরেছিলেন কেন ঐ দিনে?

মহারাজ : আমি তো আর ঐ দিন যোগ দেব বলে পরিনি। যোগ দেব না বলে পরেছি।

—ভরত মহারাজ, সূর্য মহারাজ—ওঁরা দোল খেলতেন?

মহারাজ : সূর্য মহারাজ তো ঐ দলের ভেতরে ভিড়ে যেতেন। কিন্তু ভরত মহারাজ নয়। ভরত মহারাজ একেবারে ঘরের দরজা বন্ধ করে থাকতেন। বেরতেন না। কেউ বার করতে পারত না। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে বসে থাকতেন।

—সূর্য মহারাজ ওপর থেকে রঙ দিতেন পিচকারি দিয়ে। এগুলো ছিল।

মহারাজ : উনি ওপর থেকে দিতেন, নিচে এসেও দিতেন।

—তখন তো উনি সমর্থ ছিলেন। আজ আসি, মহারাজ।

মহারাজ : এস। আর তোমাদের দেরি করে দেব না। (সকলের হাসি)

—মহারাজ, আপনি বললেন আর সবাই সুবোধ বালকের মতো চলে যাবে—এটা হবে না। মহারাজ, আজকে কিছু লজেন্স দিন।

মহারাজ : আজ আর লজেন্স হবে না।

—আচ্ছা, সকালে দেওয়া হয়েছে। বিকালে বন্ধ থাকবে, এমন কোন—

মহারাজ : দুপুরেও দেওয়া হয়েছে।

—আজকে কিছু—

মহারাজ : না, এখানে—তাহলে যা হয়নি, সেই অঘটন ঘটবে। (সকলের হাসি)

—মহারাজ, একটা দিয়ে দেখুন।

মহারাজ : শিখরেশ! তুমি বল। তুমি কী—কথা বল। (সকলের হাসি)

—না। একটা একটা সবাইকে দিয়ে দিন মহারাজ।

মহারাজ : না, একটা একটা দেবো না। (সকলের হাসি)

—মহারাজ, দিতে বলুন না—

মহারাজ : আজ কোন বিশেষ দিন নয়। লজেন্স দেওয়ার কথা নয়। পালাও, পালাও, নতুবা 'ব্যা-আ-আ-আ' করে দেব।

—ব্যাপারটা কী বুঝতে পারলাম না। কী বললেন, 'ব্যা-আ-আ-আ' করে দেবেন?

মহারাজ : (হেসে) জান না সেই 'ব্যা-আ-আ-আ' করার গল্পটা?

—না। বলুন না—

মহারাজ : এক গ্রামে একটি দরিদ্র লোক মহাজনের কাছ থেকে পাঁচশো টাকা সুদে ধার নিয়েছে। সে এত দরিদ্র যে সুদ বা আসল কিছুই ফেরত দিতে পারে না। শেষে রেগে-মেগে মহাজন কোর্টে কেস করেছে। গরিব মানুষটি তো পড়ল ফ্যাসাদে। তার হয়ে কে আর ওকালতি করবে? টাকা-পয়সা তো কিছু দিতে পারবে না। শেষমেশ এক চতুর উকিল তার সঙ্গে পরামর্শ করল। সে একটা শর্তে ওকালতি করতে রাজি হল যে,

সে কেসটায় তাকে জিতিয়ে দিলে অর্থাৎ টাকা ফেরত দিতে না হলে লোকটি তাকে একশো টাকা দেবে। গরিব লোকটি তাতেই রাজি হল। এবারে উকিল-ভদ্রলোক তাকে একটা কৌশল শিখিয়ে দিয়েছে। সেইমতো ব্যবহার করলেই সে কেসে জিতে যাবে। গরিব মানুষটি কৌশল রপ্তও করে ফেলেছে। এবারে কোর্টে কেসের দিন জজসাহেবের সামনে বিচার চলছে। মহাজনের উকিল সবিস্তারে কেসের বিষয়টি বলে সুদসমেত আসল টাকা দাবি করল। এবারে জজসাহেব এ-পক্ষের চতুর উকিলকে বললেন, তাঁর আসামীর কিছু বলার থাকলে বলুক। এবারে উকিল আসামীকে পিছন থেকে ইশারা করছে যে ঐ শেখানো কৌশলটা প্রয়োগ করতে। আসামী 'ব্যা-আ-আ-আ' করতে করতে জজসাহেবের সামনে এগিয়ে গেল। জজসাহেব কিছু বলতে বলায় সে শুধু 'ব্যা-আ-আ-আ' করছে। চতুর উকিল এবারে বলছে—'দেখলেন তো ধর্মাবতার, এ লোক দারিদ্রের জ্বালায় টাকা ধার নিয়েছে। আর কেসের ভয়ে একেবারে বদ্ধ পাগল হয়ে কেবল 'ব্যা-আ-আ-আ' করে ছাগলের গলার আওয়াজ করছে।' জজসাহেব সব বিবেচনা করে রায় দিলেন যে, আসামী পাগল। অতএব পাগলের ওপর কোন আইন জারি করা যাবে না। কেস ডিসমিস। প্রচ্ছন্ন পাগল আবার 'ব্যা-আ-আ-আ' করতে করতে কাঠগড়া থেকে নেমে বেরিয়ে এল। সকলে চলে গেলে চতুর উকিল খুব আনন্দের সঙ্গে লোকটির কাছে এসে তাঁর প্রাপ্য একশো টাকা চাইল। তাই না শুনে লোকটি আবার উকিলকেও তার রপ্ত করা 'ব্যা-আ-আ-আ' শুনিয়ে হনহন করে চলে গেল। (সকলের উচ্চ হাসি)

—মহারাজ! আমাদের পাগলের দলে ফেললেন!

প্রশ্ন : মহারাজ, সোমনাথ দর্শন করে এলেন—

মহারাজ : পুরনো সোমনাথ মন্দির ভেঙে নতুন সোমনাথ হলো। পুরনো সোমনাথের ভাঙা মন্দির। আর অহল্যা বাঈয়ের নতুন সোমনাথ। এখন আবার একটা নতুন মন্দির হয়েছে। তখন উল্টে গেছে। পুরনো সোমনাথের হলো নতুন মন্দির। আর অহল্যা বাঈয়েরটা পুরনো মন্দির।

—আর ঐ ভাঙাটা?

মহারাজ : ভাঙাটা তো আর নেই। ভাঙাটার জায়গায় ঐ নতুন মন্দির হয়েছে। কাজেই পুরনো মন্দিরটা এখন নতুন মন্দির হয়েছে। আর নতুন মন্দিরটা পুরনো মন্দির হয়েছে। আপেক্ষিকতা।

—এই তো নতুন সোমনাথ।

মহারাজ : এরপরে আবার সোমনাথ আসবে। তখন নতুন যে সে পুরনো হয়ে যাবে। আর যে নতুন আসবে সে নতুন থাকবে। তখন আবার উলটো হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : মহারাজ, ঐ যে মহারাজরা চলে যাচ্ছেন, ওরা অনেকে বলাবলি করেন—আমাদের বেগুনীটার কী হল?

মহারাজ : বেগুনীটা বে হয়ে গেছে। (সকলের হাসি)

—বেগুনীটা বে হয়ে গেছে!

মহারাজ : খালি গুণী রয়েছে। (হাসি)

—ঠিক, খালি গুণী বটে!

॥ ৭৭ ॥

প্রশ্ন : ঠাকুর সম্পর্কে ভৈরবী ব্রাহ্মণী বলেছিলেন—এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব। এই কথাটার তাৎপর্য কী?

মহারাজ : শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর নিত্যানন্দ—দুটি ভাব ছিল তাঁদের। চৈতন্যের ভেতরে খুব গাম্ভীর্য ছিল। নিত্যানন্দ আরও চঞ্চল ছিলেন। বল, কি বললে, চৈতন্যের খোলে—

—নিত্যানন্দের খোলে—

মহারাজ : নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্য। ভেতরে ভাবগম্ভীর আর বাইরে যেন উচ্ছ্বলতা রয়েছে। যদিও সাধারণত বাইরে খুব সংযতভাবে ঠাকুর থাকতেন। তবে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ ও নর্তন-কীর্তনে ঠাকুরের বাহ্যত খুবই উন্মাদনা হতো। এই একটা উপায়ে বলা যায়। আর অন্য যে, নিত্যানন্দের খোল—নিত্যানন্দ প্রচার করতেন। ঠাকুর প্রচার করেছেন খুবই সংযত

ও সীমাবদ্ধভাবে। নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্য। ভেতরে গাম্ভীর্য রয়েছে। সেই ভাবগাম্ভীর্য রয়েছে। এইজন্য।

—শরীরটা নিত্যানন্দের মতো, যেমন নিত্যানন্দের শরীর শক্ত ছিল বা সবল ছিল, প্রচারের পক্ষে অনুকূল ছিল—সেই রকম?

মহারাজ : তা, ঠাকুরের তো অত শক্তি ছিল না। নিত্যানন্দের চরিত্র—খুব লাফানো ঝাঁপানো চরিত্র ছিল। উচ্ছল ভাব। প্রচারের দিক দিয়ে সে যেন খুব উপযুক্ত—তাঁকে প্রচারের জন্য রাখলেন। আর চৈতন্য ছিলেন স্থির গম্ভীর। ঐ উচ্ছলতা তাঁর ছিল না। স্থির গম্ভীর। কখনো ভাবেতে থাকতেন, বেশিরভাগ গম্ভীরভাবে থাকতেন। তাঁর কাছেই যেতে পারত না কেউ। পাহারা দিয়ে রাখত। এইজন্যে নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্য। চৈতন্য হচ্ছেন ভেতরে। সারতত্ত্ব হলেন চৈতন্য। বাইরেটা নিত্যানন্দের মতো। তাই, নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্য। নিত্যানন্দ বাইরে—ঐ প্রচারের দিক দিয়ে আছে। কিন্তু ভেতরে তিনি স্থির—গম্ভীর ভাবসমৃদ্ধ। এই ভাবেতে হবে।

—জ্ঞান-ভক্তি দুটোর সমন্বয় ঠাকুরের জীবনে আছে। এই দিক থেকে কি—

মহারাজ : তাহলে তো ওদের দুজনকে—জ্ঞান আর ভক্তি—আলাদা করতে হবে। তার থেকে আমরা জানি যে, নিত্যানন্দ ছিলেন প্রাণচঞ্চল। আর চৈতন্য তার চেয়ে তুলনায় ভিতরেতে স্থিরগম্ভীর।

প্রশ্ন : মহারাজ, আর একটি প্রশ্ন।

মহারাজ : বল।

—ঠাকুরকে একদিন একজন বলছে, মশাই আশীর্বাদ করুন। তখন ঠাকুর বলছেন—

মহারাজ : আমার আশীর্বাদ করতে নেই।

—আমার আশীর্বাদ করতে নেই। আশীর্বাদ তিনিই করবেন।

মহারাজ : হ্যাঁ।

—তা, ঐ যে একজন বলছেন—আপনিই গৌরাঙ্গ। তাতে বলছেন, ওকথা বলতে আছে? গঙ্গারই ঢেউ, ঢেউয়ের কি গঙ্গা হয়? ঠাকুর এই রকম বললেন কেন?

মহারাজ : তার কারণ আছে। তিনি আবার অন্য জায়গায় বলেছেন—এর ভেতরে দুটি আছে। একটি ভক্ত আর একটি ভগবান। ভগবানরূপেও তিনি আছেন। আর ভক্তরূপে তিনি যেন সেটা অস্বীকার করছেন। বুঝলে?

—মানে এগুলি ভক্তভাবে—দীনভাবে তিনি বলছেন।

মহারাজ : আর বলছেন—বল কী? আমি তোমাদের রেণুর রেণু। একগাছি লোমের উপযুক্ত নই। এইরকমভাবেও বলেছেন।

—আবার কখনো কেশব সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী—এঁদের বলছেন, তোমাদের কী জিজ্ঞাসা আছে বল।

মহারাজ : যখন যেমন ক্ষেত্র—যে যেমন অধিকারী সেই অনুসারে বলতেন।

—তখন তাঁর মধ্যে গুরুভাবের কাজ লক্ষ করা যায়?

মহারাজ : "তদ্বৈতৎ পশ্যন্নৃষির্বামদেবঃ প্রতিপেদেহহং মনুরভবং সূর্যশ্চেতি।" (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ১।৪।১০) ঋষি বামদেব বলছেন যে, জ্ঞান লাভ করার পর আমি মনু হয়েছিলাম, আমি সূর্য হয়েছিলাম।

—মহারাজ, আরেকটি জায়গায় আপনি একবার বলেছিলেন যে, কর্মের কর্তৃত্ব নাশ করা যায়। তার প্রধান দুটি উপায় হল—জ্ঞান আর ভক্তি। এছাড়া অন্য আর কী উপায় থাকতে পারে কর্মের কর্তৃত্ব নাশ করতে? আপনি বলেছিলেন জ্ঞান একটি প্রধান উপায়, ভক্তিও আরেকটি প্রধান উপায়।

মহারাজ : এ দুটিই তো প্রধান কথা।

—এছাড়া অন্য আর কি কোন পথ আছে? বা অন্য উপায়?

মহারাজ : নিষ্কাম কর্ম করতে করতে কর্তৃত্ব চলে যায়। কামনা ছাড়তে ছাড়তে আর যখন কামনা থাকে না, তখন কর্তৃত্বও থাকে না।

—মহারাজ, আমরা তো নিষ্কাম কর্ম করছি—এই আমাদের ভাব আছে। বা আমরা চেষ্টা করছি, এর লক্ষ্য কী, উদ্দেশ্য কী? আমাদের জীবনে কী দেখে বোঝা যাবে এটি জীবনে গৃহীত হয়েছে?

মহারাজ : ও, সেটা আত্মবিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে। "সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।" (গীতা, ২।৪৮) এই। এই হলে তখন বুঝতে হবে সেটি নিষ্কাম কর্ম হচ্ছে।

—আমি অসিদ্ধ হলেও আমার তো মনে হতে পারে আমি ঠিক আছি।

মহারাজ : পার না। তোমার নিজের মনে আঘাত লাগে। এইজন্যে পারা যায় না।

—একজনের নিজের ব্যবসায় যেমন লোকসান হলে দুঃখ হয়, কষ্ট হয়। আমাদের অনেক সময় মনে হয়—ধুর! যা হয় হল!

মহারাজ : না, না। কষ্ট হয়। কিন্তু সেটা হবে না।

—হবে না। কিন্তু এইরকম তো আমরা মনে করতে পারি—ও, আমরা করব? ঠিক আছে কি? ওরকম তো মনে হতে পারে।

মহারাজ : না, 'আমার বুদ্ধি' থাকার জন্য কষ্ট হচ্ছে।

—যেহেতু এখানে সবকিছু সংঘের, আমার ব্যক্তিগত কিছু না, আমাদের তো একটা উপেক্ষার ভাব হতে পারে?

মহারাজ : উপেক্ষার?

—দূর! ও ঠিক আছে। তাতে আমার কী আছে!—এরকম ভাব।

মহারাজ : আমার কী আছে?—সবই আছে। আমি করছি, আর আমার নেই?

—না, তাতে লাভ হোক, লোকসান হোক—আমার কী? এইরকম একটা ভাব আমাদের থাকতে পারে।

মহারাজ : এরকম একটা মুখে বলি বটে, কিন্তু অন্তরে লাগে!

—না, সেটা sincerity-র জন্য মনে হয়।

মহারাজ : যখন তোমাকে কেউ স্তুতি করে, মনটা ফুলে ওঠে না? নিন্দা করলে মনটা বিরোধ করে না? ফোঁস করে ওঠে না ভেতরে?

—হ্যাঁ, কাজ যে আমরা করছি সেটার এইটাই test যে—

মহারাজ : 'তুল্যনিন্দাস্তুতিমৌনী'—কিনা দেখবে। দেখলে বুঝবে।

—সেটা নিষ্কাম কর্মের—তাছাড়া এমনি সাধুজীবনের এইটাই আদর্শ তো।

মহারাজ : সেই তো। সাধুজীবন মানে কী?

—না, আমাদের কথা এই যে, নিষ্কাম কর্ম করার যে-test, সেটা কী—

মহারাজ : Stage আলাদা নয়।

—না, Test, test। যে-কাজটা আমরা নিষ্কাম করার চেষ্টা করছি, তার প্রকাশ আমাদের জীবনে কেমন হবে? যে-জিনিসগুলোকে মাপকাঠি বলছি, সেইগুলো তো জপ-ধ্যান করে বা যারা ঐ মাঠে সারাদিন কাজে ব্যস্ত রয়েছে তাদেরও হবে। জ্ঞানপথে বা ভক্তিপথে, যে নিষ্কাম কর্ম করছি তার ছাপ তো পড়বে।

মহারাজ : তা ভক্তিপথে নিষ্কাম হতে পারে, জ্ঞানের পথে হতে পারে, কর্মের পথেও হতে পারে। এই তো হচ্ছে কথা। সেটাই তো তোমার সাধ্য।

—সাধ্য যেহেতু এক—ওটাই মাপকাঠি।

মহারাজ : সাধন—ঐ তিনটিই সাধন। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম—তিনটিই সাধন।

—নিষ্কাম কর্ম করতে করতে মানে—ঐ কামনা ত্যাগ করতে করতেই এটা আসবে?

মহারাজ : আর কামনা আসবে না।

—আসবে না। তাহলে আমি করছি—এই বোধটাও যাবে। আচ্ছা। আজকে এই পর্যন্ত থাক, মহারাজ।

মহারাজ : কী কিছু বল?

—বলছে, গান হবে নাকি?

মহারাজ : কে গান করবে?

—আছে, আমাদের গায়ক সব আছে, গান জানে। ওকে দেখে রাখুন। ও উত্তম। ভাল খোল বাজায়। এখন তিনজন উত্তম হয়েছে Training centre-এ। মনসাদ্বীপ থেকে একজন, নরেন্দ্রপুর থেকে একজন, যোগোদ্যান থেকে একজন।

মহারাজ : ও।

—এ হচ্ছে মনসাদ্বীপের। সবরকম কীর্তন জানে।

মহারাজ : সবরকম জানে!

—একটু বেশি হয়ে গেল। সবরকম না। অনেক রকম।

মহারাজ : এখানে হ্যারিকেন নেই। হারমোনিয়মের বদলে আমি বলছি হ্যারিকেন। (হাসি) হারমোনিয়ম নেই, কী করে গান হবে—এরা সব অমনি মনে করে। গান—যন্ত্র ছাড়া গান হয়?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। গলা থাকলেই কি গান হয়? গলা কি জানে—

মহারাজ : তোমার মতো গলা তো সবার নয়। (সকলের হাসি)

॥ ৭৮ ॥

প্রশ্ন : ঠাকুর বলছেন, মা-ই এই সব হয়েছেন। মা-ই এই সব হয়েছেন মানে, এই জড়, চেতন—এই সমস্ত যে-জগৎ দেখতে পাচ্ছি, এই সব হয়েছেন। এর মানেটা কী করে বোঝা যাবে?

মহারাজ : হয়েছেন মানে কোন্ মতে?

—কোন্ মতে? এটা কী করে আমরা বুঝব?

মহারাজ : পরিণামবাদী মতে, না অদ্বৈত মতে? পরিণামবাদী মত এই যে, তিনি ইচ্ছা করলে বহুরূপে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন। তিনি বিভু হতে পারেন, বহুরূপে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন। আর অদ্বৈতবাদীর মতে—বহু যে দেখছি, তা তাঁর ওপর অধ্যস্ত। সুতরাং তাঁকেই দেখছি। কিন্তু তিনি-রূপে দেখছি না—অন্যরূপে দেখছি। বহুরূপে দেখছি। তার ওপর বহুত্ব আরোপিত। দুরকম ভাষায় বলা যায়।

—এটা কি মহারাজ? আরোপ করা হয়েছে, বিবর্ত হয়েছে—এটা একটা মত। সেটাই বলছি।

মহারাজ : এ্যাঁ?

—বিবর্ত।

মহারাজ : বিবর্ত।

—আচ্ছা। তা, এইখানে ঠাকুর এরকম বলছেন, অন্য জায়গায় বলেছেন—বাজিকরই সত্য, বাজি মিথ্যা।

মহারাজ : হ্যাঁ।

—তা, সমুদ্র দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি—নীল। কাছে গিয়ে দেখ—কোন রঙই নেই। তাহলে এখানে, এই যে আরোপের কথাটা বললেন সেটাই তিনি অর্থ করেছেন উদাহরণ দিয়ে।

মহারাজ : সমুদ্রের যে-দৃষ্টান্তটা দিলে—

—হ্যাঁ, মহারাজ।

মহারাজ : সমুদ্রের দৃষ্টান্ত—কতগুলো শর্তের দ্বারা বস্তুর প্রকাশ ভিন্ন রকম হয়। সেখানে Raman effect-এর দ্বারা সমুদ্রের রং নীল হয়। আলোকের বিকিরণ দ্বারা—Raman effect বলে, তার দ্বারা রং পরিবর্তন হয়। সেটা আরোপিত বলা চলবে না। তবে সমুদ্র যে বিকৃত হয়ে যাচ্ছে, তা নয়। সমুদ্রের প্রকাশ ওর ভেতর দিয়ে হলে সেই প্রকাশটা তার শর্তকে অপেক্ষা করে।

—ঠিক।

মহারাজ : এইরকম। তা, ব্রহ্মকে জগৎ-রূপে যখন দেখছি, তখন দেখতে গিয়ে তার একটা শর্ত আছে। সেই শর্তের দ্বারা জগৎ-রূপে প্রকাশ—আভাস—অবভাস বলে। আরেক মতে—ওসব কিচ্ছু নেই। জগৎ-টগৎ নেই। এক তিনি আছেন। তার ওপরেতে আরোপ করছে। কে আরোপ করছে? সে তার থেকে ভিন্ন না অভিন্ন? তার থেকে যদি ভিন্ন হয় তাহলে সে তাতে অরোপ করবে কী করে? যদি অভিন্ন হয়, তাহলেও বা আরোপ করবে কী করে? বাস্তবিকই তাই। এই রকম অনেক তর্ক আছে। তুমি কথাটা তুললে, কিন্তু বিষয়টা অনেক হ্যাঙ্গামের ব্যাপার।

—হ্যাঁ মহারাজ, কিন্তু বাজিকর সত্য বললে তিনিই সব হয়েছেন—এ তো বিরোধ হয়ে গেল।

মহারাজ : রামানুজের মতে—তিনিই সব হয়েছেন। ঠাকুরের মতে—বিজ্ঞানী দেখে, তিনিই সব হয়েছেন। আর অদ্বৈতবাদী দেখে তাতে জগৎ-দৃষ্টি করে। জগৎ-দৃষ্টিটা কোথায় হচ্ছে? তাতে। যেমন সর্প-দৃষ্টিটা কোথায় হচ্ছে? রজ্জুতে। হ্যাঁ? সেইরকম। মরীচিকার দৃষ্টি হচ্ছে কোথায়? মরুভূমিতে। এইরকম।

—এখন যেহেতু ঠাকুর দুটোই জেনেছেন—দুটো বিরোধই সত্য হল।

মহারাজ : এরা আসলে বিরোধী নয়। দ্রষ্টার অপেক্ষায় বিরোধী। আপাতদৃষ্টিতে।

—তাহলেও, আমরা একটা একটা বিষয় থেকে তো দেখতে পারি। একই সঙ্গে তো দুটো বিষয় দেখতে পারি না।

মহারাজ : না।

—সেইটাই সমস্যা যে, বাজিকরই সত্য। এটা একটা মত। অদ্বৈত—

মহারাজ : বাজিকর সত্য। জগৎটাও সত্য, সত্য ব্রহ্ম। "যদিদং জগৎ তৎ ব্রহ্ম এব।"

—হ্যাঁ। সে তো আছে। আবার অদ্বৈতীদের সঙ্গে বাজি মিথ্যা বলছি—তখন বিরোধটা আসে।

মহারাজ : জগৎটা যদি ব্রহ্ম হয়—তাহলে এদিকে ব্রহ্ম অপরিণামী, জগৎটা পরিণামী—তা কেমন করে হবে? তার উত্তরে বলছে, জগৎটা ব্রহ্মে আরোপিত। ব্রহ্ম আধার। ব্রহ্মে পরিবর্তন ঘটে না। এইজন্য আরোপ্যের অধিষ্ঠান ব্রহ্ম হতে পারে। তাতে ব্রহ্মের পরিবর্তন হয় না।

—আমরা কোন্‌টাকে মানব? এটাই সমস্যা হয়। আমরা কোন্‌টাকে অনুসরণ করব, যেহেতু ঠাকুর দুটোকেই সত্য বলেছেন—বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত।

মহারাজ : যেটা আমার পক্ষে অনুকূল হবে সেটা করব।

—সিদ্ধান্ত যদি ঐ দুরকম—

মহারাজ : সিদ্ধান্তরূপে একটাই মানবে—তুমি যদি অদ্বৈতবাদী হও অদ্বৈত মানবে। অন্যটা বোধ হলে সেটা করবে।

—শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব এরকম—তাহলে কিছু বলা যাবে না।

মহারাজ : শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব কোন্‌টা? কাকে বলছেন, তার ওপরে নির্ভর করবে।

প্রশ্ন : লোকৈষণা কী মহারাজ?

মহারাজ : লোকৈষণা?

—পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা আর লোকৈষণা।

মহারাজ : লোক মানে—ইন্দ্রলোক, চন্দ্রলোক—এইসব আছে না? এটাই লোকৈষণা। সেখানে যাওয়া ও থাকার ইচ্ছা লোকৈষণা।

—তা, এখন আমাদের—মানে বর্তমানে আমরা যখন শাস্ত্র পড়ছি, লোকৈষণা বলতে কী বুঝব?

মহারাজ : লোক মানে মানুষ নয়। লোক মানে ধ্রুবলোক, চন্দ্রলোক, বিষ্ণুলোক, শিবলোক। এইসব লোক।

—মহারাজ, আমাদের লোকৈষণার ধারণাটা কিরকম?

মহারাজ : তোমাদের লোকৈষণা—কী জানি কার কী ধারণা, তা কে জানে? কে কোন্ লোকে যেতে চায়, তা তো জানি না।

—মহারাজ, স্বামীজী যখন চিঠি লিখেছেন, সেখানে ঐসমস্ত লোকের কোন নাম বলেননি। এ লোকৈষণা বলতে স্বামীজী—

মহারাজ : হ্যাঁ, তিনি বলছেন লোক।

—হ্যাঁ। নামযশ বলেছেন।

মহারাজ : হ্যাঁ। লোকৈষণা। তা, হোক। শাস্ত্রের কথা—লোকৈষণা মানে ঐ। "বিত্তৈষণায়াঃ চ লোকৈষণায়াঃ চ ব্যুত্থায় অথ ভিক্ষাচর্যং চরন্তি।" ওখানে লোক মানে ঐ।

—ওটাই তো প্রধান তাৎপর্য।

মহারাজ : ভোগ আর কী! পরলোকের ভোগ।

প্রশ্ন : কর্মনিষ্ঠা কী আর জ্ঞাননিষ্ঠাই বা কী? এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

মহারাজ : কর্মনিষ্ঠা—নিষ্ঠা মানে বিশ্বাস। কর্মে অবিচলিত থাকা—এই কর্মনিষ্ঠা। গীতাতে কর্মনিষ্ঠা বলতে বলছে যে, নিষ্কাম কর্মে নিষ্ঠা। আর

জ্ঞাননিষ্ঠা বলতে বলছে, সব ত্যাগ করে বিচারপূর্বক আত্মজ্ঞান লাভ করা। তাতে নিষ্ঠা। আত্মজ্ঞানে নিষ্ঠা। এটাই জ্ঞাননিষ্ঠা। স্বাভাবিকভাবেই কেউ কেউ এই দুটো পথের একটাকে অনুসরণ করে, কেউবা অন্যটা।

—না মহারাজ, আমরা যে-কর্ম করি তার পিছনে আছে ঈশ্বরে ভক্তি, কারণ কর্মটাও ভগবানের আর যিনি কর্ম করছেন তিনিও ভগবানের—এটাই কি অর্থ হচ্ছে না?

মহারাজ : শঙ্কর-মতাবলম্বীরা বলবেন, ভগবানকে সন্তুষ্ট করার জন্য কোন কর্মের দরকার নেই। এদের মতে, সাধারণভাবে কর্ম মানে—নিন্দামূলক কর্ম, অর্থাৎ সকাম কর্ম। এখানে কর্ম মানে সুখ উপভোগ করা—হয় এই জন্মে, না হয় পরের জন্মে। এরকম সকাম কর্মকে আচার্য শঙ্কর নিন্দা করেছেন। আর জ্ঞাননিষ্ঠা ঠিক এর উলটো।

—কর্মনিষ্ঠা কি জ্ঞাননিষ্ঠার সহায়ক?

মহারাজ : না না, তেমন কোন কথা নেই। তবে এখানে কর্ম মানে নিষ্কাম কর্ম।

প্রশ্ন : তুরীয়ানন্দজী বলছেন যে, ব্রহ্ম সত্য জগৎ সত্য—সত্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত।

মহারাজ : সত্যে সত্য প্রতিষ্ঠিত। এবার বল।

—এটা কী বলতে চেয়েছেন?

মহারাজ : কী বলতে চাচ্ছ তুমি? তুমি কী বুঝতে চাচ্ছ?

—কোন্ stage থেকে এই কথাটা বলছেন?

মহারাজ : আবার কোন্ stage! আমি তাঁর stage-এর বিচার করব নাকি? বলছেন—ব্রহ্ম সত্য জগৎ সত্য। সত্যে সত্য প্রতিষ্ঠিত। এই কথা বলেছেন শেষ কালটায়।

—জগৎ সত্য কী করে হবে?

মহারাজ : জগৎ সত্য—জগৎ যদি ব্রহ্মের থেকে ভিন্ন না হয়, তাহলে জগৎ সত্য। জগৎ ব্রহ্মরূপে সত্য। জগৎ-রূপে সত্য নয়। ব্রহ্মরূপে সত্য। সত্যে প্রতিষ্ঠিত। আমাদের যে-সত্য—জগৎ-রূপ দেখছি, সেটা ব্রহ্মরূপ।

সেটা ব্রহ্মরূপ সত্যতে প্রতিষ্ঠিত। যাতে প্রতিষ্ঠা, সেটা থাকলে যে প্রতিষ্ঠিত সে-ও থাকবে। দোষ হচ্ছে তাঁকে জগৎ-রূপে দেখলে। জগৎকে ব্রহ্মরূপে দেখলে জগৎ বন্ধনের কারণ নয়।

॥ ৭৯ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ—

মহারাজ : বলো—

—কালকে যে-কথাটা হয়েছিল—ঠাকুর যেহেতু অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈত—সব মতকেই সত্য বলে জেনেছেন, তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবটি কী হবে—আমি জিজ্ঞাসা করলাম। আপনি তখন বললেন যে, কাকে বলছেন, তার ভাবকে অপেক্ষা করে বুঝতে হবে। তাহলে কি অধিকারিভেদে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন ভিন্ন ভিন্ন হবে?

মহারাজ : দর্শন ভিন্ন ভিন্ন মানে—তার বৈচিত্র্য হচ্ছে। তিনি বলছেন, আমি ঝোলে খাই, ঝালে খাই, অম্বলে খাই। আমি সবেতে আছি।

—ঠিক আছে। কিন্তু যখন আমার ভাবকে অবলম্বন করে বুঝব, সেটা একরকম, আরেকজন তার মতো করে বুঝলে দর্শনটা অন্যরকম—

মহারাজ : না। এটা দর্শন যদি কিছু হলো—এটাই দর্শন। আমি সবেতেই তাঁকে আস্বাদন করতে চাই। পোঁ ধরে থাকতে চাই না।

—কিন্তু আপাতত সিদ্ধান্তগুলি তো বিরোধী।

মহারাজ : আপাতত সিদ্ধান্ত তোমার বুদ্ধির সিদ্ধান্ত। তা তোমার প্রবণতার তফাৎ আছে। যেটা তোমার ভাল লাগে সেটাকে তুমি ধরবে। ঠাকুর বলছেন যে, কোন কোন জায়গায় এমন আছে যে, জল বরফ হয়ে যায়, বরফ আর গলে না, আবার জ্ঞানসূর্যের তাপে বরফ গলে জল হয়। অবস্থাভেদে দুটোই সত্য, এরকম। একটা সাকার, আরেকটা নিরাকার। একটা লীলা, অপরটা নিত্য। দুটোকেই ঠাকুর নিয়েছেন।

—মানে ভক্তির দিক দিয়ে—

মহারাজ : নিত্যলীলা।

—না। এখন কথাটা হল, তাহলে দর্শনটা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হচ্ছে।

মহারাজ : দর্শনটা যাই হোক—ব্যক্তির জন্য প্রয়োজনটা। তাই ভিন্ন ভিন্ন। ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভগবানকে আস্বাদন করা যায়। এই। দর্শনটা কার জন্যে? দর্শন কি প্রয়োজনহীন হয়? তোমার—কার জন্য দর্শন?

—কোন কোন ব্যক্তির জন্য। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন।

মহারাজ : দর্শন কি বস্তুনিষ্ঠ, না ব্যক্তিনিষ্ঠ?

—ব্যক্তিনিষ্ঠ, যেহেতু অধিকারিভেদে দর্শনের কথা বলছি।

মহারাজ : ব্যক্তিনিষ্ঠ নয়।

—কিন্তু এখানে ব্যক্তিনিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছে।

মহারাজ : এখানে ব্যক্তিনিষ্ঠ হচ্ছে—যদি বল, অদ্বৈত। অদ্বৈত কে বলছে? অদ্বৈতের কেউ বক্তা আছে?

—শ্রীরামকৃষ্ণই সেখানে বক্তা।

মহারাজ : না। অদ্বৈতের ভেতর আবার শ্রীরামকৃষ্ণ আসবেন কোথা থেকে? যেখানে দ্বৈত নেই, সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণও নেই।

—কিন্তু তাঁর উপদেশে যখন অদ্বৈতের কথা বলছেন তিনি—

মহারাজ : তখন সেটা শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাখ্যা হতে পারে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণনিষ্ঠ তত্ত্ব নয়।

প্রশ্ন : মহারাজ, অনেকেই কথা বলছে, কারো কথাই শোনা যাচ্ছে না—

মহারাজ : পুত্রাভান শব্দবৎ। একসঙ্গে ছাত্ররা সব পড়ছে। তার ভেতর মাস্টারের ছেলেও পড়ছে। বেশ তো। ভানেপি অভান। ছেলের শব্দটা সে নিশ্চয়ই শুনেছে। শুনেও সে বুঝতে পারছে না যে, তার ছেলে কিনা। ভানেপি অভান। সেইরকম তোমাদের যখন দেখি তখন ব্যক্তিগতভাবে অনেককে খুঁজে পাই না। কিন্তু, দেখি তো একসঙ্গে সবাইকে। কিন্তু হয়তো কাউকে খুঁজছি, খুঁজে পাই না। বাঁশ বনে কানা ডোম। (হাসি)

প্রশ্ন : মহারাজ, ঠাকুর একজনকে প্রশ্ন করেছিলেন—পঞ্চদশী-টশী পড়েছ? বলছে—না।

মহারাজ : সে আবার কী?

—হ্যাঁ। বলছে—না মশায়, সে আবার কী? ঠাকুর বলছেন, বেশ করেছ। না পড়ে ভালই করেছ।

মহারাজ : না। ঠাকুর বললেন, পঞ্চদশী-টশী পড়েছ? বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল বলছেন—সে আবার কী মশাই?

—তখন ঠাকুর বলছেন, না পড়ে ভালই করেছ।

মহারাজ : বাঁচিয়েছ বাবা!

—না, সান্যাল মশাই বলছেন, সেটা আবার কার নাম? তখন ঠাকুর বুঝে ফেলেছেন। বলছেন—বাঁচিয়েছ! বলছেন—এসব পড়ে আসে, আর আমার হাড় জ্বালায়!

মহারাজ : হঠাৎ মনে পড়ে গেল। "উধ্যেতৃবর্গমধ্যস্থে পুত্রাভানশব্দবৎ। ভানেপি অভানং"—তারপরে কী মনে নেই। (সকলের হাসি) মানে সকলেই বেদপাঠ করছে, তার ভেতরে নিজের ছেলেও আছে। কিন্তু ধরতে পারছে না। মানে বিশেষ নেই। বিশেষত্বটা হারিয়ে গেছে। সেটাই বলছিলাম যে, সবাইকেই দেখছি, তাও দেখছি না।

প্রশ্ন : ঠাকুর কেন বলেছিলেন যে, না পড়ে ভালই করেছ, বাঁচিয়েছ।

মহারাজ : এসে যত বিদঘুটে তর্ক করে। মূল জিনিসটা বুঝতে পারে না। খালি তর্ক করে।

প্রশ্ন : মহারাজ—

মহারাজ : বল।

—ঠাকুর বলছেন, শক্তিরই অবতার। শক্তিরই অবতার—এটা কী? ভগবানের অবতার বলে আমরা সাধারণত শুনে থাকি।

মহারাজ : ভগবান শক্তিরূপ। সৃষ্টি-স্থিতি-লয় শক্তির দ্বারা হয়। তা, ভগবান যখন শক্তিরূপ তখন তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করছেন। তাঁরই অবতার হন।

—ও, ঈশ্বরের অবতার মানে যে নির্গুণ ব্রহ্ম—

মহারাজ : তার অবতার হয় না।

—তার মানে, যিনি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করছেন, সেই শক্তিমান বা শক্তি তাঁকেই বলা হচ্ছে। আর একটা বৈষ্ণবদের ভাবে আছে যে, এই বিষ্ণু হলেন অবতারের অবতার—অবতারেরা তাঁর থেকে আসেন।

মহারাজ : যত অবতার, বিষ্ণু থেকে হয়েছেন। দশ অবতার। বিষ্ণু থেকে কেন? না, বিষ্ণু হচ্ছেন রক্ষাকর্তা। স্থিতিরূপ তাঁরই। তাঁর স্থিতির জন্য অবতাররা আসেন বলে সকলেই বিষ্ণুর অবতার।

—ও। তার মানে, অবতারপুরুষরা জগতের স্থিতি করার জন্যই আসেন। আর ধর্মটা রক্ষা করার জন্য স্থিতি প্রয়োজন।

মহারাজ : হ্যাঁ।

—কিন্তু মহারাজ, শুধু স্থিতির জন্য তো তাঁরা আসেন না। তাঁরা ধ্বংসের বা দুষ্টজনের দমনের জন্যও তো আসেন।

মহারাজ : তা, স্থিতি করতে হলে তো ঐরকম করতে হবে। চণ্ডীতে আছে—

"বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে।" (১।৭৬-৭৭)

—মানেটা?

মহারাজ : সৃষ্টির সময়েতে তুমি সৃষ্টির কারণ হয়ে আস। স্থিতিরূপা চ পালনে। আর সংহৃতিরূপা—জগতের অন্তে। তুমিই এই জগৎ-ময়। সুতরাং সৃষ্টিতেও আছ, স্থিতিতেও আছ, লয়েতেও আছ। আর আমাদের ঘরে দু-চার ঘা চাপড় মা কি দেয় না?

—হ্যাঁ। সেটাতেই হয়ে গেল জগৎ। চড়-চাপড়টা তো স্থিতি করতে হলে লাগে।

মহারাজ : এটা আমি গোড়ায় বুঝিনি, অবতার সব কেন বিষ্ণুর অবতার। অনেক পরে বুঝেছি। বুদ্ধি আরূঢ় হয়েছে।

—আরো একটা জিনিস মহারাজ আমাদের মাথায় পরিষ্কার হয় না। ঠাকুর মাস্টারমশাইকে বলছেন, সাকারও সত্য, নিরাকারও সত্য। আমরা এটা কিন্তু বুঝিনি।

মহারাজ : ঠাকুর বলছেন, ভগবানের ইতি করতে নেই। তিনি এই হতে পারেন, আর ঐ হতে পারেন না—এরকম ভাবতে নেই। তিনি সবই হতে পারেন। কাজেই তিনি সাকারও বটে, নিরাকারও বটে। আবার সাকার-নিরাকারের পারও বটে।

—আবার একটা সমস্যায় পড়লাম। সাকার-নিরাকারের পার আবার কি হতে পারে?

মহারাজ : যাকে সাকারও বলা যায় না, নিরাকারও বলা যায় না।

—বুদ্ধিতে আসে মহারাজ, এরকম? বুদ্ধিতে বোঝা যায়?

মহারাজ : বুদ্ধিতে বোঝা যায়। কিন্তু প্রত্যক্ষ, অনুমান—এসবেতে বোঝা যায় না।

—তবে আমরা বলি, একটা হয় মিথ্যা নতুবা সত্য। তা, মহারাজ, আর একটা কথা। এই যে তিনি সাকার এবং নিরাকার—এটা কি একই ক্ষণে, একই মুহূর্তে?

মহারাজ : তা, একই ক্ষণে বৈকি! তুমি কি ভাবছ তিনি ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলাচ্ছেন?

—সেটাই তো আমরা জানতে চাই। যেমন ঠাকুর উদাহরণ দিচ্ছেন—জল আর বরফ।

মহারাজ : যখন তাকে জলরূপে দেখছি, তখন তাকে বরফরূপে দেখছি না।

—হ্যাঁ। যেমন মহারাজ, ঠাকুরের যে-গল্পটা আছে—বহুরূপীর গল্প। ঐ গিরগিটি এক এক সময় রঙ বদলাচ্ছে।

মহারাজ : সে তো আমরা যখন লাল দেখছি, তখন নীল দেখছি না। যেখানে লাল, সেখানে নীল, সেখানে হলুদ—সবই তো সূক্ষ্মরূপে সেখানে আছে।

—তার মানে, একই লোকের কাছে ভিন্ন সময়ে তিনি সাকার এবং নিরাকার।

মহারাজ : তা বৈকি!

—সাকার-নিরাকার একই সময়েও হয়?

মহারাজ : একই সময়ে হয়।

—একই সময়ে হলে তো বিরোধটা হয়।

মহারাজ : কেন? কারো কাছে সাকার, কারো কাছে নিরাকার। একই সময়ে।

—হ্যাঁ। সেটা ঠিক আছে। সেটা ঠিক আছে।

মহারাজ : সেটা ঠিক আছে। তাহলে তুমি ভিন্ন ভিন্ন সময় ভাবছ কেন?

—না। একই ব্যক্তির কাছে না। একই সময়ে! একই সময়ে ভিন্ন ব্যক্তির কাছে সাকার নিরাকার হতে পারে—এটা বোঝা যায়। কিন্তু একই ব্যক্তির কাছে, একই সময়ে—

মহারাজ : আবার একই সময়ে। তুমি সময় আনছ কেন?

—না, এটা তো একটা সম্ভাবনা হতে পারে। এইরকম—

মহারাজ : ঠাকুর তুমি ফয়তা জান! কোথাকার কথা কোথায় আন! (সকলের হাসি)

—তিনি সাকারও বটে নিরাকারও বটে। সেটি কি একই ব্যক্তির ক্ষেত্রে?

মহারাজ : তাঁর কথা হচ্ছে। ব্যক্তির কথা হচ্ছে না। তাঁর কথা। ঠাকুর বলছেন—তাঁর কথা। ঈশ্বরের কথা।

—তিনি হতে পারেন। তাঁর কাছে একরকম। আমার কাছে একরকম—এটা তো হতে পারে।

মহারাজ : কেউ তাঁকে সাকার দেখছে, কেউ তাঁকে নিরাকার দেখছে।

—না, এভাবে যে একজন দেখছে সে জানে যে, তাঁকে তো একই সময়ে উভয়ে দেখতে পারে কিনা।

মহারাজ : একজনের কথা হচ্ছে না। ভিন্ন ভিন্নের কাছে।

—আমরা এইভাবে ধরে নিচ্ছি যে, উভয়ের একই সঙ্গে হলে তো বিরোধ হয়। ভগবানের দিক থেকে দুজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে দুরকম হতে পারে।

—ভিন্ন ভিন্ন মন।

মহারাজ : না না। যেন একই মুহূর্তে—একই সময়ে সৃষ্টিও হচ্ছে, স্থিতিও হচ্ছে, লয়ও হচ্ছে। এটা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হচ্ছে না।

—ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে না। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে হচ্ছে।

মহারাজ : ভিন্ন ভিন্ন দ্রষ্টা দেখছে।

—সে তো বটেই।

মহারাজ : এই, এই। আর কিছু নয়।

—একজনের ক্ষেত্রে তো হচ্ছে না।

মহারাজ : একজনের কাছে সৃষ্টি, স্থিতি, লয়—কী করে হবে? তা তো হতে পারে না।

॥ ৮০ ॥

মহারাজ : এত দেরি কেন?

—মশলা-মুড়ি ছিল মহারাজ। তার জন্যে দেরি হয়ে গেছে। মুড়ি খেতে সময় লাগে যে! তবু তো এই কটা খেয়েছি।

মহারাজ : তুমি একেবারে আড়ালে রয়েছ যে, 'ভয়ে অগ্নি ভস্ম মাঝে ঢাকে কলেবর।' এদিকে এস—

—মহারাজ, ভাল কথা হোক। মশলা-মুড়ির কথা হচ্ছে। ও কোন কাজের কথা নয়।

মহারাজ : তাহলে এখন একটু ব্রহ্মচিন্তা কর।

—মহারাজ, কলিতে অন্নগত প্রাণ।

মহারাজ : তাহলে মুড়ির দরকার। (সকলের হাসি)

—ঠাকুর এই কথা বলেছেন, এর অর্থ কী—অন্নগত প্রাণ?

মহারাজ : মানে—অত সাধন, ভজন, উপোস দিলে সহ্য হবে না। এজন্যে হরিনাম কর। ম্যালেরিয়ায় ধুঁকতে ধুঁকতে হরিনাম করতে পারবে?

—ম্যালেরিয়া এখন আর নেই।

মহারাজ : তখন ছিল। তখনের কথা। ঠাকুরের কথা ঠাকুরের সময় ছিল।

—না, আমরা বলি যে, ঠাকুর—এই কলিতে জীব অন্নগত প্রাণ। কলির কোন বিশেষত্ব ঐ কথাটায় বোঝাচ্ছেন নাকি?

মহারাজ : কলিযুগের বৈশিষ্ট্য।

—আচ্ছা। অন্য যুগে?

মহারাজ : অন্য যুগে অন্নগত প্রাণ কিনা? তারা তো একবছর উপবাস করে থাকতে পারত। এখন আমরা পারব না। করতে যদি বাধ্য করে তো মরে যাব।

—এখন—মানে, মানুষ এই খাওয়া-দাওয়া—এই দিকে মন না দিলে সে মরে যাবে। এইজন্য বলছেন?

মহারাজ : তার মানে ঐরকম কৃচ্ছ্রসাধনের যুগ এটি নয়। তা হল। আরো কিছু বল।

—ভাল কথা হোক।

মহারাজ : বল, বল।

—ঠাকুর বলছেন, এদিকে বাক্যমনাতীত ব্রহ্ম, আবার তিনি শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর। শুদ্ধ বুদ্ধিও তো একটা সীমিত জিনিস। তার দ্বারা তিনি কী করে গোচর হবেন?

মহারাজ : সীমিত অবস্থার কথা বলছেন না। শুদ্ধ বুদ্ধি আর শুদ্ধ আত্মা এক বলছেন। তখন আর সীমিত রইল না।

—তা, তেমনই অন্য জায়গায় যেমন পাই—'মনসা এব আপ্তব্যম্'। সেখানে তাহলে কি বলা হচ্ছে—

মহারাজ : যেমন, এই যে-মন আমাদের হাতে আছে, এই মনই চেষ্টা করতে করতে শুদ্ধ হবে। তখন তাঁকে আপ্ত হবে।

—আচ্ছা। তা শুদ্ধ আত্মার যে দর্শন হচ্ছে, তা শুদ্ধ আত্মাতেই হচ্ছে। তাহলে বুদ্ধি বলে কিছু আর থাকছে না?

মহারাজ : বুদ্ধি, আত্মা সেখানে এক হয়ে গেল যে। আত্মাই উপাধিধর্মবশত সব গাছপালা, এটা ওটা—এইসব রূপে দেখা যাচ্ছে। সেই উপাধিগুলো যদি শোধন কর অর্থাৎ তার থেকে বিযুক্ত করে দাও, তাহলে শুদ্ধ আত্মা রইল না? যে-কথা অন্য উপাধির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সেকথা বুদ্ধিতেও প্রযোজ্য। বুদ্ধিও উপাধি।

—কী?

মহারাজ : অন্য উপাধি যেমন, বুদ্ধিরূপ উপাধিও তেমনই। তারপর?

প্রশ্ন : মহারাজ, গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক দীক্ষাসূত্রে শুরু হয়। ঠাকুরের সন্তানদের ঠাকুরের শিষ্য বলি। ঠাকুরের শিষ্যদের অনেকেই যে ঠাকুরের কাছে দীক্ষা নিয়েছেন—এরকম খবর তো পাওয়া যায় না। কী অর্থে আমরা তাঁদের ঠাকুরের শিষ্য বলি?

মহারাজ : তা, ঠাকুরের কাউকে মন্ত্রদীক্ষা দেওয়ার দরকার হয়নি।

—মন্ত্রদীক্ষা আমরা বুঝি।

মহারাজ : হ্যাঁ, ঠাকুরের কোন মন্ত্রদীক্ষা দরকার হয়নি। তাঁদের দৃষ্টিমাত্রে দীক্ষা দেওয়া হয়।

—দৃষ্টিমাত্রে দীক্ষা মানে কী?

মহারাজ : তিনি মনে করলেই দীক্ষা হয়ে যায়।

—অনেককেই তো উনি দৃষ্টিপাত করেছেন। তা, ঠাকুরের সন্তান বা শিষ্য যাঁদের আমরা বলি, তাঁদের কী অর্থে আমরা ঠাকুরের শিষ্য বলি?

মহারাজ : ভাল করে দৃষ্টিপাত করেছেন। (সকলের হাসি)

—হ্যাঁ। দৃষ্টিপাত করেছেন মানে, অজ্ঞান দূর করে দিয়েছেন। জ্ঞান প্রদান করেছেন। সেইটা বলতে হবে। খালি দৃষ্টিপাত—ওরকম নয়।

মহারাজ : এঁদের দিকে তিনি দৃষ্টিপাত করেছেন বললাম। ঠাকুরকে তাঁরা দেখেছেন বলিনি।

—ও! তিনি দেখেছেন।

মহারাজ : তিনি দেখেছেন?

—কিন্তু কারা ঠাকুরের সন্তান, এ তো পরবর্তী সময়ে স্থির হয়েছে।

মহারাজ : আরে! আমরা আমাদের বুদ্ধি দিয়ে বলছি। ঠাকুর কাকে শিষ্য বা সন্তান ভেবেছেন—তা তো আমরা বলছি না। ঠাকুর রসিক মেথরকেও দেখেছেন। তাঁর দৃষ্টি হয়তো সেখানে পড়েছে। তাকে আমরা ঠাকুরের দৃষ্টিপাত হয়েছে বলে বলছি না।

—তাকে ঠাকুরের শিষ্য বা সন্তান—এরকম বলি না তো।

মহারাজ : সে আমরা কতটুকু জানি?

—আমরা বেছে নিয়েছি। এইরকম।

মহারাজ : "অসংখ্য ভকত গোরার নাম নিব কত।" তা, এখন হাসির কথা হচ্ছে—যে পড়ছে, সে ব্যাখ্যাকার—'নিব', সে 'ব'টাকে 'র' পড়ছে। নামনি রকত। (হাসি) বলছে, আহা কাঁদছে। কী ব্যাপার? না গোরাচাঁদের অশেষ কৃপা। তাঁর সকল ভক্ত তাঁকে খাওয়াতে চায়। কিন্তু নরদেহধারী—সব কী আর সহ্য হবে? এইরকম খেতে খেতে তাঁর নামাগ্নি হল। নামাগ্নি মানে dysentery—diarrhoea। তারপরে diarrhoea থেকে রকত। (সকলের হাসি) আর সবাই কাঁদছে। অসংখ্য ভকত গোরার নামনি রকত। (সকলের হাসি)

প্রশ্ন : ভাল কিছু হবে কি?

মহারাজ : কে আছ, ভাল কথা একটু বল না। কেউ বলছ না।

—Second Year-রা তো দুদিন পরে চলে যাবে। ওরা মুখ খুলুক।

মহারাজ : ও, সেইজন্য কথা বলবে না!

—না, ওরা মুখ খুলবে তো এখন। এরা তো চলে যাবে। এখন তো আর ভয় নেই আচার্যদের। (সকলের হাসি)

মহারাজ : ঠিক আছে। তোমাদের তো সে-ভয় নেই?

—আমাদের কোন ভয় নেই।

মহারাজ : চলে যাবার ভয় নেই।

—তা বলা যায় না। ওদের তবু দুবছরই মাপ করা আছে। আমাদের তো তাও নেই।

মহারাজ : বল।

প্রশ্ন : গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ে তিনরকমের শ্রদ্ধার কথা বলা হয়েছে—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—

মহারাজ : শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগঃ।

—গীতার শ্রীধর স্বামী-কৃত টীকায় বলা হয়েছে—"যারা শাস্ত্রবিধি অনুসারে কর্ম করেন তাদের শ্রদ্ধা কেবল সাত্ত্বিকীই হয়। অন্যদিকে শাস্ত্রবিধির

বাইরে সাধারণ মানুষের যে ধর্মীয় আচরণ তা ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক।” তাহলে এই ত্রিবিধ অথবা ধরা যাক অন্ধবিশ্বাস—এগুলি কি দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত শ্রদ্ধা বলে গণ্য হবে?

মহারাজ : অন্ধবিশ্বাস কথাটা অর্থহীন। যুক্তিসঙ্গত বিশ্বাসই উচ্চতর। আর যুক্তিহীন যে-বিশ্বাস, যেমন—একটা গাছকে বা একখণ্ড পাথরকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করা—এগুলির মধ্যে কোন যুক্তি নেই। এধরনের বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

—তার মানে, বিশ্বাসের মধ্যেও প্রকারভেদ আছে।

মহারাজ : তা বলতে পার।

—(ধর্ম) বিশ্বাস বিষয়ে স্বামীজী এবং অন্যরাও আলোচনা করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—একে বিশ্বাসও বলতে পার, জ্ঞানও বলতে পার।

মহারাজ : বিশ্বাসটা কখন জ্ঞান?—যখন তুমি জান যে এটা শুধুমাত্র বিশ্বাস না, আরো কিছু, তখন। কিন্তু যখন তুমি জান না অথচ তোমার যুক্তির সঙ্গেও মেলে না, স্বামীজী তাকেই অন্ধবিশ্বাস বলেছেন। অন্ধবিশ্বাস মানে যুক্তিহীন বিশ্বাস। এধরনের বিশ্বাসকে উৎসাহ দেওয়া উচিত নয়।

প্রশ্ন : মহারাজ, একটা কথা মনে আসছে। হরি মহারাজ সারা জীবন বেদান্ত পড়লেন; ঠাকুরের কাছেও শুনলেন যে, তুই এত বেদান্ত পড়িস—কী আছে তাতে? ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। কিন্তু শরীর যাবার সময় তিনি বললেন—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ সত্য। এর অর্থটা কী? তিনি শরীর যাবার সময় বলেছিলেন—জগৎটা সত্য। আমরা কিভাবে নেব?

মহারাজ : খুব সুন্দর অর্থ আছে।

—কিরকম, মহারাজ?

মহারাজ : জগৎটা সত্য। জগৎ-রূপে নয়—ব্রহ্মরূপে।

—এই অর্থ করতে হবে?

মহারাজ : হ্যাঁ। জগৎটা সত্য ব্রহ্মরূপে। সত্যে সত্য প্রতিষ্ঠিত। একথা বলেছিলেন। ব্রহ্ম সত্য। জগৎ সত্যরূপ এর ভেতরে। কার্য আর কারণ

দুটোই সত্য। কার্য ও কারণ যদি অভিন্ন হয় তাহলে কারণ সত্য হলে তার কার্যও সত্য।

—তা কার্যটা সত্য, কারণরূপে সত্য।

মহারাজ : কারণরূপে সত্য।

প্রশ্ন : আরেকটা কথা ঠাকুর বলেছেন—যে সমন্বয় করেছে, সে-ই লোক। সমন্বয় কথার মানে কী?

মহারাজ : সমন্বয় মানে বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয়। সব পথ দিয়ে সেই এক তত্ত্বে পৌঁছানো যায়। এই হল সমন্বয়।

—এটা আমাদের জীবনে কিভাবে করব? আমি আমার একটা পথ নিয়ে চলছি, কাজেই অন্য পথের সমন্বয়ে আমার কী লাভ? সমন্বয় কথাটার মানে কী?

মহারাজ : সম্যক্ সম্বন্ধ।

—সম্যক্ সম্বন্ধ। মানে একটা কি যাতে—

মহারাজ : পথ হিসেবে—সত্যলাভের পথ। সত্যতে পৌঁছাবার পথ।

—মানে অন্য পথগুলোও পথ। তা সেটাকে স্বীকৃতি দেওয়ার নামই হল সমন্বয়?

মহারাজ : তাও হল। আর যদি জীবনে প্রতিফলিত করতে পার, তাহলে তো হলই। যেমন জ্ঞান, ভক্তি, তেমনই কর্ম থাকলে সমন্বয় হল।

—যোগগুলো যদি আমরা করতে পারি একসঙ্গে, সেও ভাল। তাহলে আরও গভীরতর হবে। ঠাকুর যে-পথটা নিয়েছেন, সে-পথেই চলেছেন। অন্য পথ তিনি মেশাননি।

মহারাজ : কে বলল মেশাননি?

—যখন তিনি বৈষ্ণব মতে সাধনা করতেন, তখন তিনি আর তন্ত্রের কথা শুনছেন না।

মহারাজ : জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথা বলেননি?

—হ্যাঁ, তা বলেছেন।

মহারাজ : বলছেন, যাকে ভক্তি করবি তাকে না জানলে কী করে ভক্তি করবি? সুতরাং জ্ঞানও চাই।

—জ্ঞান আর ভক্তির সমন্বয়টা বুঝতে পারি। কিন্তু ঐসব—যেটা সাধন-ভজন করা—দুটো পথকে মিশিয়ে দিলাম, কোনরকমে জগাখিচুড়ির মতো মিশিয়ে দেওয়া, সেটা তো উদ্দেশ্য নয়।

মহারাজ : মিশিয়ে দেওয়া মানে কী? দুধ আর দই মিশিয়ে দেওয়া? না মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া? কোন্‌টা?

—সেইটাই তো আমরা বলি।

মহারাজ : মিশিয়ে দেওয়ার কথা নয়। কথা হচ্ছে দুটো বস্তু—এক আধারে দুটো অবলম্বনীয়।

॥ ৮১ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, আমেরিকায় আপনার বক্তৃতার কিছু ভিডিও ক্যাসেট আমাদের কাছেও আছে মহারাজ। যে-বক্তৃতাগুলো দিয়েছেন, সেগুলি ওরা আমাদের পাঠিয়েছে।

মহারাজ : আমেরিকায় সব সেন্টারে ভিডিও আছে। কিন্তু সেখানে খালি ডায়াসের ছবি আসে। আর অন্য ছবি সেখানে থাকে না। যে বক্তা তার বক্তৃতা, আর তার চেহারাটা, আর তার পাশে যদি কেউ থাকে, সে। এ-ছাড়া আর কিছু তাতে থাকে না। সব জায়গায় permanent ঐরকম ব্যবস্থা আছে। সবগুলো tape হয়। ঐ একটা জিনিস পাবে।

—লন্ডনে গিয়েছিলেন, সেটাও আমাদের কাছে আছে। লন্ডনের বার্নে। সেখানে ভক্তরা সব দাঁড়িয়ে আছে। আপনি বললেন—Flowering reception—এসব। (মহারাজের হাসি)

—শ্রীশ মহারাজ বলছেন, তোমরা ঐ ক্যাসেটটা আমাদের দেখিয়ে দাও।

মহারাজ : কোন্‌টা?

—ঐ যে চেতনানন্দজী মহারাজের কাছে যেটা আছে, লন্ডনের। সেটা শ্রীশ মহারাজ বলছেন এখানে আমাদের দেখাতে। তা, আমরা তো মহারাজকে সামনেই দেখতে পাচ্ছি, আর ভিডিওতে দেখে কী হবে?

মহারাজ : ক্যাসেট দেখব কী! নির্মল মহারাজ যখন আমেরিকা থেকে ফিরে

এলেন, আমি বললাম—আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে বয়স অনেক কমে গেছে। তা বললেন—ওসব make-up-এর ব্যাপার। (সকলের হাসি)

—উনি কি প্যান্ট-স্যুট পরা ছিলেন মহারাজ?

মহারাজ : না, তখন প্যান্ট পরা ছিলেন না। প্যান্ট একবার পরেছিলেন যখন আমেরিকায় যান অপারেশন করার জন্য—সেই সময়। কোন্ মান্ধাতার আমলে স্যুট করেছিলেন, সেটাই পরেছেন। তাই দেখে বুড়ো-বুড়ো লাগছিল। আর সকলে অবাক। মহারাজের ফরসা রঙ ছিল। Aerodrome-এ সব অবাক হচ্ছে দেখে যে, এটা কী—একটা বুড়ো সাহেবকে সাধুরা প্রণাম করছে! কী ব্যাপার?

—এটা অদ্ভুত ঠেকে আমাদের কাছে যে, প্যান্ট-স্যুট পরা সাধু।

মহারাজ : আর যখন উনি আমেরিকা থেকে ফিরে এসেছেন, তখন reception হল বোম্বেতে। তারা সবাই বলছে যে, যার reception হচ্ছে, তিনি কোথায়? কারণ, তখন তিনি তো মাথা থেকে টুপিটা খুলে রেখে দিয়েছেন। আর বোঝা যাচ্ছে না, তিনি কোথায়! ঐ যে একটা গল্প বলে, এদেশের গল্প। বলে, যাঁর শ্রাদ্ধ হচ্ছে তিনি কোথায়? (সকলের হাসি) অনেক লোকের ভিড় হয়েছে—সব এসেছে। তা যাঁর শ্রাদ্ধ, তিনি কোথায়? তা বলছে, তাঁর কাল হয়েছে। মারা গেছেন—কাল হয়েছে। কী হয়েছিল?—সরপ কাটিছিলা।—সরপ কাটিছিলা? কয়ারে? তা বলে, কপালে। ভাগ্যিস চোখ বাঁচিছে! (সকলের হাসি)

—মহারাজ, আমাদের সাধুরা স্যুট প্যান্ট কিরকম পরেন ওখানে? একবার আপনি দেখেছেন ওঁদের?

মহারাজ : না, আমি স্যুট পরা দেখিনি। ওরকম দেখলে চিনতেই পারব না।

—চিনিয়ে দেওয়া হবে।

মহারাজ : আমি আমেরিকায় গেলাম যখন, আমাকে receive করতে সাধুরা airport-এ এসেছে। আমি ওদের চিনতেই পারছি না। এরা কারা রে বাবা! (হাসি)

—কারা মহারাজ?

মহারাজ : আমাদেরই সাধু সব। যাই হোক, আমাদের যত আশ্রম আছে, সব চেয়ে ঠান্ডা হল মস্কো।

—ওখানে শীতকালে বাস করা বড় কঠিন ব্যাপার।

মহারাজ : ওখানে বাস করা মানে, ঘরের ভেতরে কোন অসুবিধে নেই, গাড়িতেও অসুবিধে নেই। বাড়ি থেকে গাড়ি। ঐটুকু সমস্যা। জাপানেতে সব গাড়িই air-conditioned। Train-ও air-conditioned। বাড়িতেও তাই। তা ঠান্ডা লাগবে কোথায়? তবে আমাদের আশ্রম যেখানে, ওটা একটা মাঝামাঝি জায়গায়। বরফ পড়ে, তবে তীব্র ঠান্ডা নয়।

—ও, আমাদের আশ্রম! সেখানে বরফও পড়ে বুঝি?

মহারাজ : হ্যাঁ। বরফ পড়ে। ঐজন্য তো বরফ কিনতে হয় না। (হাসি) তবে আমার জানা ছিল না। যখন গেছি, তখন তো বরফ ছিল না। আবার কাশ্মীরে গেছি, গুলমার্গ গেছি, দেখি বরফ পড়ে আছে। হাত দিয়ে দেখি তত ঠান্ডা নয়। তা বলি, ও, এই বাহাদুরী! (হাসি) বরফ নিয়ে গোলা পাকিয়ে সব ছোঁড়াছুঁড়ি করে।

—অত ঠান্ডা লাগল না?

মহারাজ : না। আর ঝুরো বরফ। আমাদের পানি পিনেকা বরফ নয়। পানি পিনেকা বরফ জান? পানি পিনেকা বরফ?

—পানি পিনেকা। ঐ ছোট ঢেলা যেটা বলছে—শক্ত।

মহারাজ : দূর! ঐ ঠেলাগাড়ি করে নিয়ে যায় রংবেরং-এর বোতল সাজিয়ে সব।

—ও, আচ্ছা, আচ্ছা। ঐরকম মেলাতে ঠেলাগাড়ি করে নিয়ে যায়।

মহারাজ : তাতে বরফ থাকে।

—তাতে একটা র‍্যাঁদা উলটানো থাকে। বরফটা নিয়ে র‍্যাঁদাতে ঘষে। ওর নিচে গুঁড়োটা পড়ে। তাতে সব সিরাপ-টিরাপ দেয়।

মহারাজ : তোমার কি ঠেলা ছিল নাকি একটা? (সকলের উচ্চ হাসি)

—আমি ঠেলার কাছে ছিলাম।

মহারাজ : বেঁচে গেছে।

প্রশ্ন : স— মহারাজ বলছিল যে, এবছরে এত ফল—

মহারাজ : অনেক জায়গায় পাঠানো হয়েছে। এই—তত্ত্বমন্দির, রহড়া।

—তারপর বেদ বিদ্যালয়।

মহারাজ : যথেষ্ট পরিমাণ পাঠানো হয়েছে। বলে, তবুও শেষ করতে পারছি না।

—রহড়ার গাড়ি ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে।

মহারাজ : রহড়া তো ডাস্টবিনের মতো! (হাসি) যতই বেশি হোক, ওখানে দিয়ে দিলে সব চলে যায়।

—ওখানে আর বেশি হবে না। তা ভাল। ওরা আনন্দ করতে পারবে।

মহারাজ : টাকার হিসেব পাই। এই ফল-মিষ্টির যে কত দাম, সেটা হিসাব হচ্ছে না। অনেক দাম।

—তা তো বটেই।

মহারাজ : বোঁদে কাল প্রচুর হয়েছিল। ভক্তদের দেওয়ার জন্য। প্রথমে লাড্ডু। তারপরে লাড্ডু পাকাবে কে অত। তারপরে বোঁদে। যেদিন বোঁদে হবে সেই দিনই ঠাকুরকে দেওয়া হয়।

—তখন ওটা ঠাকুরের প্রসাদ করে দেওয়া হয়।

মহারাজ : কত খরচ হচ্ছে, কোথা থেকে ঠাকুর জোটাচ্ছেন, আশ্চর্য!

॥ ৮২ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, কামারপুকুর মিশন থেকে এবার মাধ্যমিকে ৭১ জন পরীক্ষা দিয়েছে, ৬৬ জন star পেয়েছে। অধিকাংশ গ্রামের ছেলে—খুব meritorious নয়।

মহারাজ : হুঁ। তাই তো।

—কোন Admission Test নেওয়া হয় না। এমনি এসেছে, নেওয়া হয়েছে। তার মধ্য থেকে এই রকম। তবু এত সমালোচনা হয় কেন?

মহারাজ : কী জান? হয়তো ১০০০ পরীক্ষা দিল। তার ভিতর ৫০টি নেওয়া হবে। তার মানে, ৫০টি তোমাদের ভক্ত হবে। আর বাকিগুলি সব শত্রু হবে। যোগোদ্যানে ভক্তদের সামনে একজন বলছে, নরেন্দ্রপুরে ভর্তি হতে অনেক টাকা লাগে। বলছে, অনেক টাকা দিলে তবে ওরা ভর্তি করে। তা সেখানে একজন ছিল—তার ছেলে ওখানে পড়ে। আমি বললাম—কী, তোমার ছেলের জন্য কত টাকা দিয়েছ? বলে—এক পয়সাও তো দিইনি। উল্টে সে free-তে পড়ে।

—ওরা আন্দাজে বলে দেয়, মহারাজ।

মহারাজ : আর একেবারে বেমালুম এমন করে বলে দেয় যেন সে একেবারে অভিজ্ঞতা থেকে বলছে!

—অন্যান্য জায়গাতে এইরকম প্রশ্ন বেশি করে। যখন হয়ত youth camp হল—এই সব সময় বলে যে, আপনারা তো সব বড়লোকদের ছেলেদের রাখেন। এই নরেন্দ্রপুরের একবার ক্যাম্প হচ্ছে অন্য জায়গায়। সে এ-কথাই বলছে। তা তুমি কী করে বলছ এভাবে? তুমি জান? কিছুই জানে না! তখন ওকে সব ব্যাপার বলা হল। তখন বলছে—হ্যাঁ, আমরা ভুল বলছি।

মহারাজ : এতে যে convinced হবে তা তো না। আবার বলবে। যা হোক, শোন এক মজার কথা। একজন ব্যাখ্যা করছেন যে, 'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়, নবানি গৃহ্নাতি...' তা বলে, যেমন বাঁশ পচে গেলে তাকে ফেলে দিয়ে নতুন বাঁশ দেয়। (সকলের হাসি) তা মিলে যাচ্ছে তো।

—মিলিয়ে দিলেই হল। আর—

মহারাজ : আর যদি বল, ওটা বাসাংসি; বাঁশাংসি তো নয়। তাও যারা বাঁশ বলতে পারে না, তারা বাসই বলে। তা একজন বলছে, বাঙালরা বাঁশ বলতে পারে না।

—হ্যাঁ, আমরা বাসও কই, বাসও কই। (সকলের হাসি)

মহারাজ : একজন 'বাসাংসি জীর্ণানি' বোঝাচ্ছে—

—ও, ক্লাসের মধ্যে বলছেন, এই রকম?

মহারাজ : হ্যাঁ। তা কী করবে। বাঁশ জীর্ণ হয়ে গেলে ঘর পড়ে যাবে তো। কাজেই আবার নতুন বাঁশ দিতে হবে তাতে। (সকলের হাসি) সব চাইতে মজা হচ্ছে, সম্বুদ্ধানন্দজীর সঙ্গে আমাদের খোঁড়া উপুদার ঝগড়া। উপুদা বলছে—আমি তোর যম। সম্বুদ্ধানন্দ স্বামী বলছে—আমি আপনার নচিকেতা। (সকলের উচ্চ হাসি) আমি তোর যম। তা, আমি আপনার নচিকেতা। (সকলের হাসি) একেবারে আগুনে জল পড়ে গেছে।

শোন আমার জীবনের একটা ঘটনা—তখন গঙ্গার ধারে এক শিব-মন্দিরে থাকি। তা ঘুম তাড়াবার জন্য খুব ভোরে একদিন গঙ্গার ধারে হাঁটছি। হেঁটে ঘুমটা ছাড়াব। এমন হাঁটছি মাতালের মতো। আর এক বুড়ি আর তার নাতি হাওড়ায় ট্রেন ধরতে যাচ্ছে। এখন নাতি এগিয়ে আছে, সে পেছিয়ে আছে। শুনতে পাচ্ছি বুড়ি বলছে—এই বাবা! এই বাবা! 'এই বাবা' মানে—এইবার যে পড়বে আমার ঘাড়ে! (সকলের হাসি) শুনতে পাচ্ছি। আমি শুনতে পাচ্ছি—এই বাবা! এই বাবা! তারপরে সে ছেলেটার ঘাড়ে পড়িনি। পড়েছি গিয়ে রেললাইনের ধারে। তারের বেড়া ছিল। তার ওপরে পড়েছি। (হাসি)

প্রশ্ন : মহারাজ, আপনার মনে আছে এখনো পর্যন্ত! মহারাজ, জাপানে তো আপনি বহুবার গেছেন—

মহারাজ : হ্যাঁ, ওরা বলে—নিপ্পন। The Land of the Rising Sun.

—অরুণাচলে, তিরাপে লেখা আছে—প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে।

মহারাজ : Suva—ফিজিতে যে-জায়গাটা Suva, ফিজির Capital। সেই Suva-তে একটা পেপার বেরোয়—'The Morning Sun'; সেখানে ওটা হল Dateline। Dateline ওখানে। সেখান থেকে morning ধরতে হবে। Suva নাম শুনেছ? কিছুই করলে না, কোথাও গেলে না!

—গঙ্গায় নামলে জলে জলে সব দিক ঘোরা হয়। (সকলের হাসি)

মহারাজ : কিরকম?

—গঙ্গায় নামলে জলে জলে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে যোগ হয়ে যাবে।

মহারাজ : কোথায়?

—গঙ্গায় নামলে পরে—এখানে।

মহারাজ : ও।

—জল দিয়ে ফিজি, আমেরিকা, ইউরোপ সব এসে যাবে।

মহারাজ : দ্বারকায় একটা point আছে। সেখান থেকে North pole অবধি একটা straight line করে যদি, তো কোথাও land পাবে না।

—North নয়, South pole.

মহারাজ : South নাকি!

—Arrow দেওয়া।

মহারাজ : South pole অবধি।

—মানে একেবারে শুধু জল ওদিকে?

মহারাজ : খালি জল।

—আচ্ছা। এইরকম? কোন land নেই?

মহারাজ : তা, arrow দেওয়া আছে। সেই মুখে যাও। একেবারে South pole অবধি পৌঁছে যাবে।

—কম দেখা হল? এখানে বসে দেখে নিলাম।

মহারাজ : একটা ডিঙি চড়ে চলে যাও। একটা ডিঙি।

—সাঁতার কাটলে তো হয়। ডিঙির কি দরকার?

মহারাজ : তা পারা যায়। একটা tribe আছে—পড়েছি, কনটিকি। একদল, তাদের নাম হলো কনটিকি। কনটিকিরা একটা ভেলা তৈরি করেছিল। প্রাচীনকালে সেই ভেলা দিয়ে তারা experiment হিসেবে Pacific পার হয়েছিল। কল্পনা করতে পার? সেটা দিয়ে পার হয়েছিল Pacific। একটা ভেলা।

—সেটাই তো ভাবছি। এরকম কি সম্ভব?

মহারাজ : কয়েকটা কাঠ জুড়ে একটা ভেলা করেছিল।

—খাবার-দাবারও তো নিতে হয়েছিল।

মহারাজ : খাবার-দাবার—ঐ সমুদ্র থেকে মাছ ধরে খেত।

—হ্যাঁ। মাছ ধরার জাল দিয়ে মাছ ধরত। বৃষ্টি হলে—

মহারাজ : বৃষ্টির জল—খাওয়ার জন্য জমাত।

—চাতকের মতো—

মহারাজ : তুমি এখনই হাঁ করছ যে! এখানে যে ওপরে ছাদ আছে। (সকলের হাসি)

—চাতকের মতো হাঁ করে থাকি, কখন বৃষ্টি হবে।

মহারাজ : ছাদের থেকে বৃষ্টি পড়বে কী করে?

—তা বটে।

মহারাজ : জলের কথায় মনে পড়ল, কত রকমের পরীক্ষা মানুষ করে। নায়াগ্রা falls-এর মধ্যে দেখলাম লোকেরা লাফিয়ে পড়ে। একটা গোল মতো, বলের মতো করে—তার ভিতর থাকে। আর নায়াগ্রা যেখানে পড়ছে, সেখানে পড়বে। Recently শুনলাম একজন পড়েছে। বেঁচেছিল, তবে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছে। নায়াগ্রা দেখেছ? কী দেখেছ তাহলে?

—দেখেছি, ছবিতে—

মহারাজ : ছবিতে দেখেছ। একটা জায়গা আছে—একটা tower। সেখান থেকে নায়াগ্রা দেখা যায়। দুটো নদী এসে পড়েছে, দুটো falls-এর মতো।

—চেরাপুঞ্জিতেও বর্ষাকালে কয়েকটা falls খুব সুন্দর দেখা যায়—

মহারাজ : সে তো মোসমাই falls। মোসমাই falls-টা এখন ভাল নেই। একবার ভূমিকম্প হয়ে ওটা একটু নষ্ট হয়ে গেছে। আগে ওটা বড় falls-ই ছিল। আর ওখানে falls দেখতে যায় যারা, ভাগ্য ভাল থাকলে দেখতে পায়। মানে অনেক সময়ই fog থাকে। আমি একবার শিলং থেকে ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জি, যিনি একজন বড় নেতা ছিলেন, তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলাম। তা একটা point আছে যেখান থেকে দেখতে হয়। দেখি সব খুব কুয়াশায় ঢাকা। মনে হল, আর ভাগ্য হল না দেখার। এরই ভেতরে কুয়াশা চলে গেল। দেখতে দেখতে পরিষ্কার হয়ে গেল।

—হিমালয়ের snow peak দেখার মতো। এই মেঘ রয়েছে—হঠাৎ পরিষ্কার হয়ে যায়।

মহারাজ : কার্শিয়াং দার্জিলিং-এও শীতের ছুটি হয়। লম্বা ছুটি।

—আমাদের এখানে আমরা বুঝতেই পারতাম না স্কুলে আবার শীতের ছুটি! স্কুলে বুঝতে না পারলেও কলেজে একটু বুঝতে পারলাম। ও, আচ্ছা, শীতের ছুটি।

মহারাজ : কলেজে, সে আর কদিন?

প্রশ্ন : শীতের আমেজে ক্লাসে ঢুলুনি আসে—

মহারাজ : ঢাকায় দেখেছি, ক্লাসেই বসে গেল নামাজ পড়তে। আর নামাজ একবার আধবার না। পাঁচবার দিনের ভেতর। পাঁচবার। আমাদের ছিল তিনবার—তিনবার ত্রিসন্ধ্যায়। ওদের হল পাঁচবার। একটা হল midnight prayer। তা ঐ পিঁড়েতে বসে—মাথাটা সামনের ডেস্কে দিয়ে ঘুমাতে শুরু করে। নাক না ডাকলেই হল।

—আমাদের একজন আচার্য মহারাজ বলতেন যে, মহারাজ ঘুমান কিন্তু বালিশটা আনবেন না ক্লাসে। (সকলের হাসি)

মহারাজ : আমি কলেজে বসতাম একেবারে front-এ। একদিন মহেন্দ্রনাথ সরকার Psychology-র ক্লাস নিচ্ছেন। সেদিন তিনি একেবারে inspired হয়ে lecture করছেন। আর আমি তাঁর favourite student, সামনে বসে ঘুমাচ্ছি। (সকলের উচ্চ হাসি) হঠাৎ আমার দিকে নজর করেই disappointed হলেন। ভাবলেন, এ-ও যদি ঘুমায় তাহলে আর বক্তৃতা কার কাছে করি!

—মহেন্দ্রনাথ সরকার কে মহারাজ, সেই ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার?

মহারাজ : না না। সে তো মহেন্দ্রলাল সরকার। এ মহেন্দ্রনাথ। এ হল Psychology-র। মহেন্দ্রলাল সরকারকে দেখেছি কিনা বলতে পারছি না। তখন তো আমার জন্ম হয়নি। আগের জন্মে কিনা বলা যায় না।

—মহেন্দ্রলাল সরকারের, মহারাজ, শরীর গেছে অনেক পরে। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দেরও পরে। আপনার পক্ষে হয়তো দেখা অসম্ভব নয়।

মহারাজ : তাহলে অসম্ভব নয়। হয়তো কোলে করে নিয়ে দেখাতে পারে। আমি বলি, আমি স্বামীজীর সঙ্গে এক হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিয়েছি। এক রোদ্দুরে রোদ পুইয়েছি। কারণ আমার ১৯০১-এ জন্ম। স্বামীজীর শরীর ত্যাগ হয়েছে ১৯০২-এ। কাজেই আমার ১ বছর chance ছিল তো। Contemporary বলতে পারি, বলতে পারি না? (সকলের হাসি)

—না।

মহারাজ : কেন? (হাসি)

—ঠিক আছে, বলা যাবে। যাবে না কেন?

মহারাজ : তাই তো, মুখ আছে—বলতে পারব না কেন? মুখ আছে আর বলতে পারব না?

—Senior contemporary। বলা হয়—Senior, junior।

মহারাজ : আবার Senior, junior! Contemporary মানে contemporary।

—Senior বলে, আবার junior-ও বলে।

মহারাজ : Junior আলাদা। তখন আর contemporary কথাটা বলে না। Senior, junior বলে। যেমন তোমরা এখন junior, আমরা senior। মঠে বলা হয়, ৬৫ বছর বয়স হলে সে senior হয়।

॥ ৮৩ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, হাতির শুঁড়ে শুঁড়ে লড়াই দেখেছেন?

মহারাজ : হাতি দাঁত দিয়ে লড়াই করে না?

—না, শুঁড় দিয়ে লড়াই করে।

মহারাজ : শুঁড় দিয়ে লড়াই করে? শুঁড় দিয়ে তো ধরে।

—ধরে। ধরলেই তো হল মহারাজ। আর কী করার দরকার?

মহারাজ : পায়ে চাপ দেয়। একটা ঘটনা জানি। একটা জায়গায় হাতিরা attack করেছিল। তা, সব পালিয়েছে। তারপরে যখন সকাল হল, হাতিরা সব চলে গেল। দলটা যখন চলে গেল তখন পায়ে চাপ দিয়ে ভেঙে চলে গেল। দুলতে দুলতে। আর একটা চা বাগানে হাতির উপদ্রব

হয়েছিল। তা একটি মেয়ে—মেয়ে মজুর আর কি—সে বলছে, বাবা গণেশ আমাকে রক্ষা করেছে। তাকে attack করেছিল অন্য হাতিরা। একটা হাতি তার সামনে দাঁড়িয়ে সব হাতিদের তাড়িয়েছে। আর সে-মেয়েটা কাঁদছে—বাবা গণেশ, রক্ষা কর। বাবা গণেশ, রক্ষা কর। সমস্ত রাত সে মেয়েটাকে পাহারা দিয়েছে। তারপর সব চলে গেল। তখন সে-ও চলে গেল। হাতিদের খুব বুদ্ধি আছে। আর feeling আছে। মাহুতের সঙ্গে খুব তাদের rapport। মাহুতকে খুব ভালবাসে।

—সে-ভালবাসার সঙ্গে যদি আঘাত হয়, তাহলে বিপদ হয়।

মহারাজ : একদিন মাহুত পিঠে আছে। তার হাত থেকে ডাঙসটা পড়ে গেছে। তা মাহুত বলছে—ওটা তুলে দে। তুলেছে, কিন্তু হাতে আর দেয় না। ওভাবে নিয়ে destination-এ গিয়ে তারপরে দেয় তার হাতে।

—হ্যাঁ। ওদের খুব বুদ্ধি। Feeling-ও আছে। অন্যান্য জন্তুর এমনটা দেখা যায় না।

মহারাজ : কিন্তু ওর যা আকার, তাতে ওর সঙ্গে ভাব করা মুশকিল তো!

প্রশ্ন : মহারাজ, আমাদের এখন বৈশেষিক দর্শন পড়া হচ্ছে।

মহারাজ : "দ্রব্যং গুণস্তথা কর্ম্ম সামান্যং সবিশেষকম্।
সমবায়স্তথাঽভাবঃ পদার্থাঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ ॥"

(ভাষাপরিচ্ছেদ, সূত্র-২)

—আপনার মুখস্থ রয়েছে!

মহারাজ : তা পড়াশোনা করেছিলাম তো একটু!

—পড়াশোনা করেননি, তা তো নয়। মনে রয়েছে, এটাই বলছি।

মহারাজ : "দ্রব্যং গুণস্তথা কর্ম্ম সামান্যং সবিশেষকম্।
সমবায়স্তথাঽভাবঃ পদার্থাঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ ॥
ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোমকালা দিগ-দেহিনৌ মনঃ।
দ্রব্যাণ্যথ গুণা রূপং রসো গন্ধস্ততঃ পরম্ ॥
স্পর্শঃ সংখ্যা পরিমিতিঃ পৃথক্ত্বঞ্চ ততঃ পরম্।

সংযোগশ্চ বিভাগশ্চ পরত্বং চাপরত্বকম্॥
বুদ্ধিঃ সুখং দুঃখমিচ্ছা দ্বেষো যত্নো গুরুত্বকম্।
দ্রবত্বং স্নেহ-সংস্কারাবদৃষ্টং শব্দ এব চ॥”

(ভাষাপরিচ্ছেদ, সূত্র-২-৫)

এতে কিচ্ছু হয় না।

—কিচ্ছু হবে না?

মহারাজ : একটা হতে পারে। একটু অহঙ্কার হয়।

—না, এটা মনে হয় যে, তর্ক কারো কাছে পড়িনি। মনে একটা আছে—অভাববোধ। কারো কাছে পড়িনি। সে নিজে নিজে যা একটু এদিক-ওদিক করে—

মহারাজ : তাতেই রক্ষে নেই। (হাসি) “গণ্ডূষ জলমাত্রেণ সফরি ফরফরায়তে।”

—আপনি একটা ভাল বলেছিলেন। আমি বলেছিলাম, একটু আনন্দ পাওয়া যায়। তা আপনি বলেছিলেন, দাবা খেলার আনন্দ আর কী! আমার মনে আছে উদাহরণটা। বুদ্ধি পরিষ্কার হয়।

মহারাজ : বুদ্ধি?

—হ্যাঁ।

মহারাজ : আরো কিছুতে হয়। (সকলের হাসি) পাত্রাধার তৈল না তৈলাধার পাত্র। এই করতে করতে সব তেলটা পড়ে গেল। (সকলের হাসি)

—সত্যি, আসল তত্ত্বটা ভুলে যাই।

মহারাজ : আমরা সাধারণভাবে বলি—অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী।

—পড়াশোনা করলেও দেখছি বিপদ। মূর্খ থাকাই ভাল।

মহারাজ : তা মূর্খ থাকলে কালিদাসও হতে পার। কালিদাস মূর্খ ছিল না?

—হ্যাঁ। সরস্বতীর কৃপায় আবার—

মহারাজ : রাজকন্যা—তিনি পণ করেছেন, তাঁকে তর্কে যে হারাতে পারবে, তাকেই তিনি বিয়ে করবেন। তা রাজকন্যার বিয়ে আর হয় না। যত পণ্ডিত আসে, সব হেরে যায়। ফিরে চলে যায়। তারপর পণ্ডিতরা বলে, বেটির এত অহঙ্কার! ওকে একটা মূর্খের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিতে হবে। সবচেয়ে মূর্খ কোথায় খুঁজে পাওয়া যায়? তারপর খুঁজতে খুঁজতে দেখে যে, কালিদাস একটা গাছের ডালে বসে সে ডালটাই কাটছে। বলে, এর মতো মূর্খ আর পাওয়া যাবে না। তা বলে—তুই বিয়ে করবি? সে বলে—হ্যাঁ। (সকলের হাসি) চল, বিয়ে দিয়ে দেব। আর দেখ, এক কাজ করবি। কোন কথা বলবি না। তা, কথা বলবে না—ঠিক করে গেছে। তারপর রাজকন্যার কাছে নিয়ে গেছে। ওকে সাজিয়ে গুজিয়ে বলে—ইনি এক মহা পণ্ডিত। তবে মুশকিল হচ্ছে, ইনি কথা বলেন না। তা বলে—নাই বলল, আমি কথা বলব, উত্তর ইশারায় দেবেন। তখন রাজকন্যা এক আঙুল দেখিয়েছেন। তা, ও দুই আঙুল দেখিয়েছে। রাজকন্যা ভাবছেন যে, তত্ত্ব এক। তা, উনি নিশ্চয়ই বলছেন—দুই, অর্থাৎ তত্ত্ব দুটি। (হাসি) আসলে তা তো নয়। কালিদাস ভাবছে, আমার একটা চোখ গালতে আসছে। তা বলে, দুটো চোখ গেলে দেব। আর পণ্ডিতরাও বলে—জিতে গেছে, জিতে গেছে। দুই তত্ত্ব। এক তত্ত্ব হলে তো সৃষ্টি হয় না, দুই তত্ত্ব। রাজকন্যা ভাবলেন—সত্যিই তো! বড় পণ্ডিত। তাকে বিয়ে করলেন। তা বিয়ে করেছে। শুতে যাবে, কোথা দিয়ে ঢুকবে। মশারির দরজা খুঁজে পাচ্ছে না। তা ভাবছে, ওপরে চালে চড়ে শুতে হবে। ওপর থেকে পড়ে গেছে। তা রাজকন্যা ভাবলেন, বড় পণ্ডিত কিনা—ওঁর বাহ্যজ্ঞান নেই। ঠিক আছে। তারপরে উট ডাকছে একটা। তা বলে—কী ডাকল, কী ডাকল? তখন ভাবছে, আর চুপ করে থাকলে ধরা পড়ে যাব। একটু বলতে হবে কথা। তা বলছে—উট্র। মানে, 'উষ্ট্র' বলতে চাচ্ছে। উট বললে সাধারণ হয়ে যাবে! উট্র। তা রাজকন্যা—কী বললে, কী বললে? তখন ভাবল, তাই তো, আমি ভুল বলেছি। তো বলল—উষ্ট। তা রাজকন্যা ভাবছেন, সর্বনাশ! এ তো উষ্ট্রর একবার

'র' ভুল করে, একবার 'ষ' ভুল করে। এ তো মহামূর্খ। বেরো এখান থেকে। (হাসি) বার করে দিল। কালিদাস মনের দুঃখে চলে গেল—গিয়ে মরবে আজ। গলায় দড়ি দিয়ে মরবে ঠিক করেছে। কাঁদছে। মা সরস্বতীর কৃপা হল। মা বললেন—কী চাই তোমার বল। কালিদাস বলে—আমার সর্বজ্ঞত্ব চাই। এটা শিখেছিল কোথা থেকে! "তোমার সর্বজ্ঞত্ব হবে' বলে সরস্বতী চলে গেলেন। সর্বজ্ঞ হয়েছে। এখন আবার রাজকন্যার কাছে গেল। গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। রাজকন্যা বলে—কোঽসি? কে তুমি? কালিদাস বলছে—অস্তি কশ্চিৎ বাগ্‌বিশেষ--আমি কেউ সরস্বতীর মতো। রাজকন্যা দরজা খুলেছে। বলছে, বাবা! এ তো—আমি তো ভুল করেছি অপমান করে। তো খুব খুশি হয়েছে। তারপর ঐ তিনটি শব্দ বলেছে। বলে বলছে তুমি এইসব নামেতে তিনটি কাব্য রচনা কর। তা করল তিনটি কাব্য রচনা। অস্তি দিয়ে করল—"অস্তি উত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা, হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ। পূর্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য, স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ॥"—'কুমারসম্ভব'। কশ্চিৎ দিয়ে করল 'মেঘদূত'—"কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ। শাপেনাস্তং গমিত মহিমা বর্ষভোগ্যেণ ভর্তুঃ।" আর বাক্ দিয়ে করল 'রঘুবংশ'—"বাগার্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থ-প্রতিপত্তয়ে। জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতী-পরমেশ্বরৌ।"

॥ ৮৪ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, স্বামীজীর এত কাজ। আমাদের জপধ্যান তত হচ্ছে কই?

মহারাজ : তা বল স্বামীজীকে। তাহলে কাজ করতে করতে তাঁকে স্মরণে বাধা কোথায়? প্রত্যেক কাজের মধ্যে সমানভাবে তো তাঁকেই ডাকা হচ্ছে। বলছে না—'যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্।' শয়নে প্রণাম জ্ঞান নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান। আহার কর মনে কর আহুতি দিই শ্যামা মাকে।

—কিন্তু মহারাজ, যখন স্বামীজী আমেরিকায় ছিলেন আলমবাজার মঠে চিঠি লিখেছিলেন, তখন বলছেন—কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান—এসব আলাদা Department হবে। Department মানে কী, মহারাজ?

মহারাজ : মানে, যেমন তোমাদের বিভিন্ন class হচ্ছে—এখানে Mathematics class, ওখানে Language class—এসব class হয় না? এই রকম।

—যদি প্রত্যেক কাজের মধ্যেই এই তিনটে মানুষের faculty কাজ করছে, তাহলে আবার ভাগ করে, আলাদা করে লাভ কী?

মহারাজ : প্রত্যেকটাই শিখতে হয় তো।

"যে এব যচ্চ বেদ যচ্চনা।
যদেব বিদ্যা করোতি তদ্ বীর্যবত্তরং ভবতি।।"

যা জ্ঞানপূর্বক করা যায় তা অধিকতর ফলদায়ক হয়। এইজন্য শিখতে হবে তো।

—আবার ঠাকুরের কথা আছে—'যত মত তত পথ'।

মহারাজ : এ আবার কোন্ কথার সঙ্গে কোন্ কথা লাগাচ্ছ?

—কিন্তু একটা পথ জোর করে ধরতে হবে তো। নাহলে synthesis করে লাভ কী?

মহারাজ : তা, ঠাকুর কি বলেছেন সবগুলি ধরতে হবে?

—না, স্বামীজী বলছেন synthesis করতে হবে। চতুর্যোগের সমন্বয়টাই আদর্শ।

মহারাজ : মানুষের জীবনে এগুলো নিয়ে সমষ্টি। ঠাকুর যখন বললেন, 'যত মত তত পথ'—সেখানে মত বিভিন্ন বলেছেন। সে আলাদা জিনিস। আর এটা আলাদা জিনিস। জীবনটা সবকিছুর সমন্বয়।

—কিন্তু মহারাজ, এখন জ্ঞানীর আদর্শ, জ্ঞানমার্গীর যে-প্রণালী, জ্ঞান-মার্গের ধ্যানের যে-প্রণালী আর ভক্তিমার্গের যে ধ্যানের প্রণালী—এ-দুটো তো আলাদা। জ্ঞানীর আদর্শটা তো নির্গুণ আর ভক্তের সগুণ—

মহারাজ : আর হনুমান? হনুমানের কথা যদি বল?

"দেহবুদ্ধ্যা তু দাসোঽস্মি, জীববুদ্ধ্যা তদংশকঃ।
আত্মবুদ্ধ্যা তদেবাহম্ ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ।।"

তবে?

—তাহলে এ-দুটোর মধ্যে ঐক্য কোথায়?

মহারাজ : কোন্‌টা?

—এক জায়গায় বলছেন যে, হয় সাকার ধর, না হয় নিরাকার ধর। দুটো তো একসঙ্গে চলবে না।

মহারাজ : কেন চলবে না?

—কী করে চলবে?

মহারাজ : ঠাকুর বারবার বলছেন, যিনিই সাকার তিনিই নিরাকার।

—সাকার যখন চিন্তা করছি, তখন তো আর নিরাকার চিন্তা করতে পারব না। আর যখন সাকার ধ্যান করতে বলা হচ্ছে, তখন তো নিরাকার ধ্যান করতে বলা হচ্ছে না।

মহারাজ : কিন্তু এটা তো জানতে হবে—যিনি সাকার তিনিই নিরকার।

—এই জানাটাই যথেষ্ট?

মহারাজ : জানাটা—অনুভব করাটা। জানাটা যথেষ্ট মানে নিঃসন্দিগ্ধভাবে জানা। আমাদের যে জানা হয়, সেটা সন্দিগ্ধভাবে। নিঃসন্দিগ্ধভাবে জানা আর জ্ঞান একই কথা।

—আর মহারাজ, শ্রীঅরবিন্দ যে Integral যোগের কথা বলেছেন—

মহারাজ : এইরে! মরেছে! এইবার মরেছে! শ্রীঅরবিন্দের Integral যোগ বল আর যাই বল, এগুলো হচ্ছে একটা Intellectual speculation।

—Synthesis of Yoga বলা চলে না, মহারাজ? ওটা কি আমাদের—Synthesis of Yoga যেটা বলি—সেটাই কী?

মহারাজ : Integral Yoga মানে হচ্ছে life-টাকে একটা—সব activities-গুলোকে co-ordinate করা। সব faculty-গুলোকে co-ordinate করা। এ হলে integral হবে।

—অরবিন্দ কয়েক জায়গায় স্বামীজীর নাম করেছেন, ঠাকুরের নামও করেছেন।

মহারাজ : হ্যাঁ। একবার একটা সভায় অরবিন্দ lecture দেবেন; তা সে বলেছে—মহারাজ preside করলে তবে আমি lecture দেব। তা না হলে দেব না। আমি বললাম—দেখ বাপু, আমি ওসব বুঝি না। আমি যাব না। তা আর শুনল না, আমাকে ধরে নিয়ে গেল। তা, ও lecture দিয়ে গেল। তা আমাকে তো কিছু করতে হবে। সে lecture দিয়ে গেল, আমি শুনে গেলাম। কিছু যদি না বলি তবে বলবে, মহারাজ সব গিলেছেন। কাজেই আমাকে বলতে হলো। অরবিন্দ বলেছেন—Superman হবে। এ তো আমি বুঝি না বাপু। Individual কেউ হতে পারে। সে তো স্বামীজী—আমাদের স্বামীজীও বলেছেন। সব জিনিস বোঝা যায় না। এর পরে মানুষ জন্মাবে, একেবারে জ্ঞানী হয়ে জন্মাবে। ঐ তো অরবিন্দের Superman-এর মতো হয়ে গেল। ওরা কি জ্ঞানী হয়ে জন্মাবে নাকি? বোঝা যায় না। স্বামীজীর কথা আছে না? স্বামীজী ভবিষ্যতের কথা বলছেন—জ্ঞানী হয়ে জন্মাবে সব।

—হ্যাঁ, মহারাজ। স্বামীজীর এরকম কথা বইতে আছে।

মহারাজ : তোমরা তো সব পড়েছ। আলোচনা করছ—দিগ্‌গজ। দিগ্‌গজ মানে জান?

—দিগ্‌গজ মানে কী মহারাজ?

মহারাজ : দিগ্‌গজ।

—পণ্ডিত আর কি।

মহারাজ : ধুৎ। দিগ্‌গজ মানে—এই পৃথিবীকে কয়েকটা হাতি দাঁতে করে ধরে আছে বিভিন্ন দিকে দাঁড়িয়ে। তারা হল দিগ্‌গজ।

—মহারাজ, সেইজন্য বলে দিগ্‌গজ পণ্ডিত?

মহারাজ : দিগ্‌গজ পণ্ডিত। তা দিগ্‌গজ পণ্ডিত মানে যে-পণ্ডিতরা পৃথিবীকে ধরে আছে। কালিদাস মেঘদূতে বলছেন, মেঘ যখন দূত হয়ে যাবে, তাকে বলছেন—সাবধান কিন্তু ঐদিকে যখন যাবে, "দিঙ্‌নাগানাং

পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্।" ঐদিকে দেখ, দিগ্‌গজের পালে পড়ো না। তাকে পরিহার করে যাবে। তারপর হাতির শুঁড় স্থূল, কর্কশ। তারা সূক্ষ্ম ভাব বোঝে না। (হাসি) তুমি গেলে তোমাকে শুষে নেবে।

প্রশ্ন : মহারাজ একটা গল্প বলুন না—

মহারাজ : একজন চাকরি করত গুজরাট Government-এ। তার কাজ কী জান? Post mortem করা। Post mortem মানে—Post mortem-এর পর ভিতরে কী ছিল, বিষ ছিল কিনা, ওগুলো তারা পরীক্ষা করে দেখে। Government-এর একজনই বড় অফিসার থাকে। এর জন্য গুজরাটে পরীক্ষা দিতে হবে। সে পরীক্ষা দেবে। তা একটি মেয়ে পরীক্ষা নিচ্ছে। মেয়েটি বলল—ডাক্তার, তুমি তো গুজরাটি কিছু বলতে পার না। তা, সে বলে—আমি written test-এ তো পাশ করেছি। আর আমার বলার দরকার কী! আমার তো কারো সঙ্গে কথা বলার দরকার হবে না।

—Post mortem মানে ঐ কাটাছেঁড়া করে ওসব করবে, নাকি চিঠি correspondence করবে ঐরকম?

মহারাজ : না, Liver post mortem-এর পর সেগুলো তার কাছে পাঠায়। তা মড়ার সঙ্গে আর কী কথা? মড়ারও whole body-টা নয়। তা, ঐরকম পরীক্ষায় পাশ করতে হবে—বলে, আমি তো written test-এ পাশ করেছি। আবার কী! তা ঠিক আছে। পাশ করিয়ে দিয়েছে।

আরেকজন বলছিল। সে I. C. S. Officer। আসামে posted ছিল। তার পরীক্ষা আসামেতে। তা পরীক্ষা দেবে অসমিয়া ভাষায়, viva-voce হচ্ছে। তা জিজ্ঞাসা করছে, আইপায় আহে? 'আইপায় আহে' মানে ও ভাবল—আয়-ব্যয় আছে? (হাসি) তা বলে, অল্প অল্প আছে। সকলে হাসছে হোঃ হোঃ করে। আইপায় মানে বাপ-মা। (সকলের উচ্চ হাসি)

—ও, আইপায় মানে বাপ-মা? আর তার উত্তরে বলছে—অল্প অল্প আছে!

মহারাজ : হ্যাঁ, হাজরাকে একটি ছোট দরগা বলে ঠাকুর বলতেন। হাজরা লোকের কাছে দেখাত, আমিও একটা কেউকেটা বটে—হুঁ! এই রকম।

—মহারাজ, ছোট দরগা বলতে কী দারোগা? (সকলের হাসি)

মহারাজ : ঠাকুর বড় দরগা। আর ও ছোট দরগা।

—এই দরগা (মঠের পাশে) ত— ভাল চেনে। ত— নাকি ঐ দরগাতে গিয়েছে। মহারাজ, কথামৃতের এক জায়গায় আছে, যার বাপ-পিতামহ চাষাগিরি করে এসেছে, হাজা-শুখা বৎসরে ফসল না হলেও সে চাষ করে। হাজা-শুখা মানে কী?

মহারাজ : খরা হল শুখা। আর হেজে যাওয়া—অতিবৃষ্টিতে হেজে যাওয়া। পচে যাওয়া। হাজা-শুখা—অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টি।

—ও, বুঝলাম।

মহারাজ : আগে—অনেক আগে আমাদের একজন সাধু ছিল। তার একটু গোলমাল হয়েছিল। সে মাঝে মাঝে ওখানে (দরগা)—তখন ওখানে ভাঙা ঘর ছিল, তার ভিতর গিয়ে ধ্যান করত। তারপরে সে যখন লাহোরে ছিল, সেখান থেকে মহাপুরুষ মহারাজকে লিখেছে—আপনার জন্য শুয়োরের আচার পাঠাব। (সকলের উচ্চ হাসি) মহাপুরুষ মহারাজ বললেন—দেখিস, দেখিস, ওর কাছ থেকে কিছু পার্সেল-টার্সেল এলে গঙ্গায় ফেলে দিবি। (হাসি)

—আরে রাম! রাম! লাহোর থেকে লিখছে!

॥ ৮৫ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, ঠাকুরের ছবিতে দেখি, চোখদুটো একটু খোলা—তাই না?

মহারাজ : হ্যাঁ, তা বটে, তবে সমাধিতে চোখ বন্ধ থাকলে কী হবে—ঠাকুরের observation খুব ছিল।

—যখন চোখ খুলতেন তখন একেবারে ভিতর পর্যন্ত দেখতে পেতেন।

মহারাজ : একদিন মাস্টারমশায়কে বলছেন, আমি তোমাদের ভেতরটা দেখতে পাই, যেমন আলমারির কাচের ভেতর দিয়ে দেখা যায়। মাস্টারমশায় তো ভয়ে অস্থির। সর্বনাশ! (হাসি) তা যদি এরকম কেউ দেখতে পায়, তাহলে কী যে বিপদ! কোনরকম ঢাকাঢুকি দিয়ে চেপেচুপে থাকা—তাও

আবার যদি কেউ দেখতে পায় ফাঁক দিয়ে, তাহলে তো মুশকিল। কাউকে কাউকে গোপনে বলতেন—সকলকে বলতেন না। সকলের সামনে বলতেন না।

—যাকে যেটা শেখাবার ছিল, সেটা তিনি আলাদাভাবে বলে দিতেন?

মহারাজ : বলা মানে কী, এই ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার—তাঁকে বলছেন—তুমি কামুক, তুমি লোভী, তুমি অহংকারী, কত কী বলে দিলেন! আরে সর্বনাশ!

—উনি বলছেন, আপনি শুনুন আমি কি বলছি—তোমার কথা আমি শুনব? তুমি কামুক, লোভী; তোমার কথা আমি শুনব?

মহারাজ : রামকৃষ্ণানন্দ স্বামী গালাগাল দিতেন। সে এমন ইনিয়ে বিনিয়ে বিচ্ছিরি করে গালাগাল দিতেন যে, কানে আঙুল দিতে হয়। আজকাল তো তোমরা কেউ শালাও বল না। (সকলের হাসি) এখন তোমরা কত gentle।

—হ্যাঁ, মহারাজ। এখন এসব বললে খুব খারাপ মনে করে।

মহারাজ : ঠাকুর কথায় কথায় শালা বলতেন। শালা—

—এইজন্য ব্রাহ্মরা খুব কটাক্ষ করতেন যে—হ্যাঁ, উনি ভাল ভাল কথা বলেন, ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব সব বলেন, কিন্তু মাঝে মাঝে গ্রাম্য slang—

মহারাজ : এক ব্রহ্মচারী ছিলেন, খুব বিদ্যোৎসাহী এবং সকলের কল্যাণের জন্য অনেক কিছু করেছেন। কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনের দিক দিয়ে কতটা কী হয়েছিল তা বলা যায় না।

—ঠাকুরের শরীর যাওয়ার পরে তিনি আসতেন ঠাকুরের সন্তানদের কাছে?

মহারাজ : না, না, না। ঠাকুরের ভক্ত পল্টু, তাঁকে আমরা দেখেছি। মঠেও আসতেন। মঠে মহাপুরুষ মহারাজের কাছে এলে তাঁকে চেয়ার দেওয়া হতো, তবে বসতেন। তা একদিন কথাবার্তা হচ্ছে—বলছেন, গঙ্গার ধারে একটা বাড়ি করলে বেশ হয়, সেখানে থাকা যায়। তখন অনঙ্গ মহারাজ বলছেন, এখানে এত মিষ্টি হাওয়া যে পাখার দরকার হয় না।

বলছেন—দূর, আমি কি এখানে তপস্যা করতে আসব নাকি? (হাসি)

—সেই। বাগানবাড়ি। গঙ্গার ধারে বাগানবাড়ি থাকবে।

মহারাজ : Enjoy করবার জন্য।

—পূর্ণকে আপনারা দেখেছেন, মহারাজ?

মহারাজ : না, পূর্ণকে দেখিনি। আরেকজনকে দেখেছি—ভাই ভূপতি।

—কোথায় দেখেছেন?

মহারাজ : কলকাতায়।

—পূর্ববঙ্গো থাকতেন।

মহারাজ : হ্যাঁ, তবে পূর্ববঙ্গো না, কলকাতায় দেখেছি।

—পুরনো ঠাকুরমন্দিরের ভিতরের ঘরে ওঁর একটা ছবি আছে।

মহারাজ : কোথায়?

—পুরনো ঠাকুরমন্দিরের ধ্যানঘরে।

মহারাজ : ভাই ভূপতির?

—হ্যাঁ।

মহারাজ : তিনি রাস্তায় চলতে চলতে—কারো বাড়িতে হয়তো ঠাকুরের ছবি আছে, রাস্তা থেকে দেখা যায়—দেখলেই দাঁড়িয়ে পড়ে জপ করতে আরম্ভ করতেন। এই বিশেষত্ব ছিল।

—মহারাজ, ঠাকুরের আর কোন্ গৃহী ভক্তকে দেখেছেন?

মহারাজ : আর—চুনিবাবুকে দেখেছি।

—ভবনাথ, মহারাজ—ভবনাথ?

মহারাজ : না, ভবনাথ—আরেকজন আসতেন, আব্দুল বলত তাকে। মঠে আসতেন, তাঁকে দেখেছি। দাড়ি ছিল বলে তাঁকে সবাই আব্দুল বলত।

—কী নাম ছিল ওঁর?

মহারাজ : কিশোরী না কী যেন।

—উপেন্দ্র মুখার্জি? বসুমতির উপেন্দ্র মুখার্জি?

মহারাজ : ওঁকে দেখিনি। উপেন মুখার্জির ছেলেকে দেখেছি। ছেলেকে দেখলে বাপকেও দেখা হল তো? (হাসি) 'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ'।

—বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল?

মহারাজ : ও হো। তিনি তো আধা গৃহস্থ, আধা সন্ন্যাসী। তাঁকে খুব দেখেছি। তাঁর বাড়িতে আমি দুর্গাপুজোও করেছি সাধু হওয়ার আগে। ওঁর ছেলেদের সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল, বন্ধুত্ব ছিল।

—শরৎ মহারাজের তো বন্ধুস্থানীয়।

মহারাজ : খুব। শরৎ মহারাজ বসতেন যেখানে, পিছনে একটা তাকিয়া ছিল। সান্যালমশায়ের পিছনেও একটা তাকিয়া ছিল।

—মহারাজ, আধা সন্ন্যাসী, আধা গৃহী—বুঝলাম না। আধা সন্ন্যাসী বলছেন কেন?

মহারাজ : আধা সন্ন্যাসী মানে আগে স্বামী কৃপানন্দ ছিলেন আর কী। তারপরে বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল। কাজেই আধা সন্ন্যাসী হল না? (হাসি)

—অক্ষয় সেনকে দেখেছেন?

মহারাজ : খুব দেখেছি। শাকচুন্নি মাস্টার আর মাস্টারমশায় দুজনকেই দেখেছি।

—মহারাজ, মাস্টারমশায়ের সঙ্গে কোন কথা মনে আছে?

মহারাজ : তা অনেক। মাঝে মাঝে যেতাম তো।

—বলুন না।

মহারাজ : এই। বলতে বললে মুশকিল হয়। ঐ ভয়ে আর স্কুলের দিকে যাই না। (সকলের হাসি)

—সাধু হওয়ার আগেই তো ওঁর কাছে যাতায়াত করেছেন।

মহারাজ : হ্যাঁ, তা করেছি।

—মহারাজ, মাস্টারমশায়ের কাছে কি আপনারা আমহার্স্ট স্ট্রিটে যেতেন? এখন যেটা হিন্দু একাডেমী হয়েছে, ঐ বাড়িতে যেতেন?

মহারাজ : ওঁর বাড়িতে প্রথম দেখি। ওঁর বাড়িতে স্কুলের একটা branch ছিল, Primary section। সেই বাড়িতে মাস্টারমশায় থাকতেন প্রথমে। গুরুপ্রসাদ লেনে। আমহার্স্ট স্ট্রিটেও দেখেছি।

—কোন দিনের ঘটনা মনে পড়ে, মহারাজ? মাস্টারমশায়ের সঙ্গের ঘটনা?

মহারাজ : আমি কি আর লিখে রেখেছি?

—আপনার সব মনে আছে, মহারাজ।

মহারাজ : সীতাপতি মহারাজ মাস্টারমশায়ের ভক্ত ছিলেন। আর অনেকেই মাস্টারমশায়ের কাছে গিয়ে তারপরই সাধু হয়েছেন। মাস্টারমশায় কিন্তু কাউকে সাধু হতে বলতেন না এবং কেউ সাধু হয়—এটা হয়তো চাইতেন না। কিন্তু কথা খুব মিষ্টি ছিল। ঠাকুরের কথাই বলতেন সব সময়। একজন এসে বলছেন যে, একটু উপনিষদের কথা বলুন। উনি তো খুব মিষ্টি করে সব বলতেন। ঠাকুরের কথা হচ্ছিল। মাঝখান থেকে বলল—একটু উপনিষদের কথা বলুন। উনি বললেন—এই তো উপনিষদ্ হচ্ছে গো। বললেন—'উপনিষদং ব্রাহ্মীং ভবতি। উপনিষদং অব্রূম।' বলছেন—এই তো ব্রাহ্মী উপনিষদ্ হচ্ছে। ঠাকুরের কথাই তো উপনিষদ্।

—মহারাজ, আপনি যখন মাস্টারমশায়কে প্রথম দেখেন, তখন ওঁর কিরকম বয়স?

মহারাজ : বয়স ভাববার বয়স আমাদের তখন হয়নি। (সকলের হাসি)

—প্রথম যে দেখেছেন, খুব ছোটবেলায়?

মহারাজ : খুব ছোটবেলায় নয়। তখন মাস্টারমশায়, বেলুড় মঠ—এসব ছোটাছুটি করছি। কাজেই খুব ছোট নয়। তখন স্কুলে পড়ি। আর ঐ করি—ছোটাছুটি করি। তা, মাস্টারমশায়কে দেখে খুব ভাল লেগেছিল। এমন মিষ্টি কথা, ধীর-স্থির। আর কত লোককে যে attract করেছিলেন—তার ঠিকানা নেই। আমাদের প্রাচীন সাধুদের প্রায় সকলেই মাস্টারমশায়ের কাছ থেকে inspiration পেয়েছেন।

—আপনারা সাধু হোন—এটা চাইতেন না উনি?

মহারাজ : তা জানি না।

—এরকম কেন, মহারাজ? ঠাকুরের কথাই তো উনি বলতেন।

মহারাজ : সাধু হওয়া—বোধহয় তিনি ভাবতেন যে, যোগ্য না হয়ে সাধু হলে তা হানিকর, কল্যাণকর নয়। এজন্য হয়তো উৎসাহ দিতেন না। তা, কেউ এসে join করব বললে ঠাকুরের সন্তানরাও উৎসাহ দিতেন না সবসময়।

—তা, মাস্টারমশায় দীক্ষা-টীক্ষা দিতেন নাকি?

মহারাজ : জানি না। লোকে বলে দীক্ষা দিতেন না। কিন্তু আমি নিজের চোখে দেখেছি, দুজনকে তিনি ব্রহ্মচর্য দিচ্ছেন—দুটি ছেলেকে। তারপরে, আমার সামনে—তখন আমি সাধু তো—আমার সামনে পড়ে গেছেন। তা বলছেন, দেখুন—দেখুন না—তখন দেখুন হয়ে গেছি (সকলের হাসি)—এরা হল ব্রহ্মচারী। মঠের ব্রহ্মচারীর মতো নয়। মঠের যেমন ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী হবেন—এরা তা নয়। এরা ইচ্ছা করলে সন্ন্যাসী হতে পারে, ইচ্ছা করলে গৃহস্থও হতে পারে।

—আপনারা যখন দেখেছেন, তখন কি উনি retired, না, তখনও স্কুলে চাকরি করতেন?

মহারাজ : চাকরি করতেন না, স্কুল manage করতেন। নিজের স্কুল। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের স্কুলে চাকরি তখন করতেন না। নিজের স্কুল ছিল। চালাতেন। তা চালাতেন কিরকম—মাস্টার engage করতেন temporary। Vacation-এর আগে ছেড়ে দিতেন। আবার Vacation-এর পরে appoint করতেন। তাহলে Vacation-এর মাইনেটা দিতে হতো না। সত্যেন মহারাজ—আত্মবোধানন্দ স্বামী ওখানে মাস্টারি করেছেন। উনি বলেছিলেন। এদিকে হিসেবি লোক—টনটনে হিসেব। তারপর মাস্টারমশায়—সাধুরা তপস্যায় গেলে তাদের টাকা পাঠাতেন। তিনটে grade ছিল। এক টাকা দু-টাকা আর তিন টাকা।

—মাসে মাসে মহারাজ?

মহারাজ : হ্যাঁ।

—আপনি কখনো পেয়েছেন, মহারাজ?

মহারাজ : আমি টাকা পাইনি। আমি যখন গেছি, তখন মাস্টারমশায় আছেন কিনা মনে নেই। তবে টাকা পেয়েছিলাম। একজন ভক্ত আমাকে

তিন টাকা করে পাঠাতেন মাসে। তারপর আমি কয়েকমাস পরে দেখলাম—টাকাটা খরচ হয় না। বললাম, আর টাকা পাঠাতে হবে না। টাকাটা খরচ হয়নি।

—উত্তরকাশী থাকাকালে মহারাজ?

মহারাজ : হ্যাঁ, উত্তরকাশী।

—তখন কথামৃত তো সব খণ্ড বেরয়নি।

মহারাজ : ক-খণ্ড বেরিয়েছে মনে নেই। এক খণ্ডতেই আমাদের দফা শেষ। (সকলের হাসি)

—এক খণ্ডতেই দফা শেষ! (হাসি)

মহারাজ : দফা শেষ নয়?

—হ্যাঁ দফা শেষ।

মহারাজ : তিনকুল গেল, দফা আর কী? যখন তপস্যায় গেলাম, তখন এক খণ্ড কথামৃত সঙ্গো নিয়েছিলাম। এক খণ্ড—বেশি নিইনি। একটাই যথেষ্ট।

—উনি যেভাবে সাজিয়েছিলেন খণ্ড আকারে, প্রত্যেক খণ্ডতেই ঠাকুরের সবরকম শিক্ষাই পাওয়া যায়।

মহারাজ : ঐজন্য প্রত্যেক খণ্ডেই chronological করলেন। আমি ওঁকে তিন জায়গায় দেখেছি। প্রথম দেখেছি, একটা আলাদা Primary section ছিল ওঁর বাড়িতে—কম্বুলিটোলায়। তিনি সেখানে থাকতেন। তারপরে দেখেছি, Morton Institute-এ—আমহার্স্ট স্ট্রীটে। তার পরে বা তার আগে দেখেছি তাঁর গুরুপ্রসাদ লেনের বাড়িতে।

—গুরুপ্রসাদ লেনে—ওটাই এখন কথামৃত ভবন।

মহারাজ : ছেলেদের সঙ্গো বনতো না।

—ছেলেরা কি ওখানেই থাকতেন?

মহারাজ : না, ওখানে নয়। তিনি আলাদা থাকতেন। তারা গুরুপ্রসাদ লেনের বাড়িতে থাকত। পরে তাদের থেকে পৃথক থাকার জন্যে ঐ স্কুলে থাকতেন। হয়তো সাংসারিক পরিবেশ থেকে দূরে থাকার জন্য। আর

মাস্টারমশায় মঠে আসতেন মাঝে মাঝে। এসে সব সাধুদের ঘরে ঘরে গিয়ে দেখতেন কার ঘরে কে কী বই নিয়ে পড়ে। সে-বইগুলি বসে বসে দেখতেন। পর্যবেক্ষণ কী বাবা! খুব!

—উনি নাকি বিছানা স্পর্শ করে প্রণাম করতেন—কারণ, এই বিছানায় বসে সাধুরা ধ্যান করেন।

মহারাজ : তা জানি না। দেখেছি—এখানে এই বাড়িতেও এসেছেন। আমি তখন এই বাড়িতে থাকতাম। তা এইরকম ঘুরে ঘুরে সব দেখতেন তাঁর বাহিনীসহ। ভক্তরা সঙ্গে থাকত। তারপরে একবার ভক্তদের বললেন—সাধুদের দেখতে হলে ভোরবেলায় যেতে হয়। তাঁরা কিভাবে ধ্যান করেন—এসব দেখতে হয়। শুধু দর্শন করলে হয় না। শেষে তারা আরম্ভ করল আসতে। ভোরবেলা। তখন সাধুরা বলে—এ আবার কী আপদ রে বাবা! (সকলের হাসি)

॥ ৮৬ ॥

প্রশ্ন : ভাত রেঁধেছি, বাড়া ভাতে তোরা বসে যা—ঠাকুরের একথার কী অর্থ?

মহারাজ : ভাত রেঁধেছি, তোরা বাড়া ভাতে বসে যা। অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জীবনের ছাঁচ তৈরি করে রেখে গেছি। তোরা নিজেদের সেই ছাঁচে ঢেলে নে। এইতো কথা।

—তাঁর জীবন, তাঁর কথাগুলোতে কি একটা আধ্যাত্মিক ছাঁচ তৈরি হয়েছে, যাতে আমরা নিজেদের জীবনকে ঢেলে তৈরি করব?

মহারাজ : কথা দিয়ে নয়। জীবন দিয়ে। কথা দিয়ে ছাঁচ হয় না। জীবন দিয়ে ছাঁচ হয়েছে।

—তাঁর জীবন আমরা অনুসরণ করব—তাহলেই হবে?

মহারাজ : হ্যাঁ, এই।

—তা, এতে আমাদের যে একটুখানি সুলভ হল, সেটা কি বলতে চাইছেন না—বাড়া ভাতে বসে যা কথাটায়?

মহারাজ : মানে তোদের আর ভাবতে হবে না পন্থা কী। তৈরি পন্থা। এখন চল। আর যদি চলতে না পার তো বক্তৃতা কর! (সকলের হাসি)

—এই দুটি বিকল্প? হয় চল না হয় বক্তৃতা কর?

মহারাজ : তাছাড়া উপায় কী আর? যখন জীবন দিয়ে করতে পারব না, তখন কী করব? বক্তৃতা করব!

প্রশ্ন : মহারাজ, ঠাকুরকে মাস্টারমশায় একদিন বলেছেন যে, আমাদের ঈশ্বর কলে ফেলে তৈরি করেছেন। আর আপনাকে স্বয়ং হাতে গড়েছেন। মানে কী?

মহারাজ : মানে, ঠাকুর অসাধারণ। আর সব সাধারণ।

—আর মহারাজ, স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, তাঁর মতো এমন পূর্ণ বিকশিত চরিত্র আর হয়নি। এই পূর্ণ বিকশিত কথাটার মানে—

মহারাজ : এই তো মুশকিল। বক্তৃতার পর্যায়ে এসে গেল। (সকলের হাসি)

—না। বক্তৃতার জন্য নয়, বোঝবার জন্য মহারাজ।

মহারাজ : তা তো বটেই। পূর্ণ বিকশিত মানে একদিক দিয়ে দেখ আধ্যাত্মিক গভীরতা। আরেক দিক দিয়ে সেই আধ্যাত্মিকতা সকলকে দেবার জন্য ব্যাকুলতা। আরেক দিক দিয়ে দেখ তিনি গৃহস্থের এবং সন্ন্যাসীর—উভয়ের সমভাবে আদর্শ। এইরকম জীবন তো খুঁজে পাওয়া যায় না।

—চৈতন্যদেবও তো গৃহী হয়ে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন।

মহারাজ : তা গৃহীর সঙ্গে তো তাঁর সম্বন্ধ ছিল না।

—গৃহীর সঙ্গে মানে, গৃহস্থদের কল্যাণের জন্য তো তিনি ব্যবস্থা করেছেন।

মহারাজ : তা করেছেন। কিন্তু গৃহস্থের আদর্শ তাঁর থেকে কোথায় পাওয়া যাবে?

—এইজন্য নিত্যানন্দকে বলে পাঠালেন—তুমি গিয়ে ঘর কর।

মহারাজ : হ্যাঁ। প্রচার কর তুমি।

—সে-অর্থে ঠাকুরও ঘর করেননি।

মহারাজ : বা-বা! ঠাকুর ঘর করেছেন বলেই তো আমরা মাকে পূজা করছি। নিত্যানন্দের ছেলেপুলে ছিল। ঠাকুরের তা ছিল না। নিত্যানন্দের ছেলে বীরভদ্র। তাই তো কথা আছে—'দেখেনি যে গোরাচাঁদে দেখুক এবার/ এবার হয়েছে গোরা বীর অবতার।'

—আরেকবার বলুন মহারাজ।

মহারাজ : দেখেনি যে গোরাচাঁদে দেখুক এবার।
এবার হয়েছে গোরা বীর অবতার।।

—মানে বীরভদ্রের মধ্যে সেই গৌরাঙ্গের ভাব ফুটে উঠেছে, সেটা দেখতে পাবে?

মহারাজ : বীর মানে সংসারত্যাগী নয়। সংসারে আছেন, কিন্তু ভগবদ্ভাবে পরিপূর্ণ। তাঁর খুব বাহ্য বিলাসিতার আড়ম্বর ছিল। তা একজন দেখতে গিয়ে বলছে—বাবা! একে আদর্শ বলে কী করে নেওয়া যায় জীবনে? এ তো একেবারে বিলাসিতার চরম! সেসময় একজন ভগবানের নাম করতে আরম্ভ করল। এরপর যখন কীর্তন করতে আরম্ভ করল, তখন একেবারে ধুলোয় গড়াগড়ি। কোথায় গেল তাঁর বিলাসিতা! আর কোথায় গেল কী! প্রেমে একেবারে গড়াগড়ি। এই জিনিসটাকে ধরতে হবে—বাহ্য একরকম, আর অন্তর আরেক রকম। তবে মুশকিল হলো এই—শ্রীচৈতন্যকে নিয়ে তারপরে নেড়ানেড়ির দল হলো। আমাদের ঠাকুরকে নিয়ে বক্তার দল না হয়!

—তা কেন? স্বামীজী তো বলে গেছেন, প্রচার করতে হবে। তবে বক্তৃতা না দিলে প্রচার হবে কী করে?

মহারাজ : তা তো ঠিকই! জীবনের দরকার নেই! (সকলের হাসি) সুন্দর ভাষা দিয়ে বক্তৃতা করলেই হলো!

—জীবনের কথাও বলেছেন, প্রচারের কথাও বলেছেন।

মহারাজ : আমরা ভাল বক্তা, ভাল বলতে পারে—এরকম দেখি। কিন্তু তাঁর ভাল জীবন খুঁজি কি? নিজেদের অন্বেষণ কর—ভিতরটা। হ্যাঁ?

অন্তর না দেখলে কিছু বোঝা যাবে না। স্বামীজী কত কী বলেছেন! স্বামীজী তো এও বলেছেন যে, মাকে খুব কষ্ট দিয়েছি। এখন আমি আর মঠে থাকব না। গিয়ে মাকে নিয়ে কোথাও থাকব। কল্পনা করতে পার! বা তোমরা সেটাকে প্রশ্রয় দেবে কি?

—না, পারব না।

মহারাজ : তবে?

—মঠ করলেন, তারপর কয়েকমাস পরে মাকে নিয়ে পূর্ববঙ্গে চললেন তীর্থ করতে।

মহারাজ : তার সঙ্গে চেলাও ছিল।

—চেলা নিয়ে, দলবল নিয়ে।

মহারাজ : শুদ্ধানন্দ স্বামীর কাছে শুনেছি—লাঙ্গলবন্দে গেছেন, বজরায় করে গেছেন। গিয়ে বলছেন—দেখ, কেউ যেন এই জল এক ফোঁটা মুখে দিও না। এই জলের এক এক ফোঁটায় millions of Cholera germs রয়েছে। তা সকলে তো স্নান করেছে। কেউ জল মুখ দিয়ে স্পর্শ করেনি। স্বামীজী বলছেন—এই, কেউ করেছিস নাকি? সকলে বলছে—না, আপনি বারণ করে দিয়েছেন, আর কেউ—! স্বামীজী হাসতে হাসতে বলছেন—আমি কিন্তু ডুবে ডুবে এক ঢোক খেয়ে নিয়েছি। (সকলের হাসি) কিসে কী ফল হয় কে জানে! তাই খেয়ে নিয়েছি।

প্রশ্ন : মহারাজ, স্বামীজীর যে বিচারপ্রবণতা, যুক্তিপ্রবণ মন—তার সঙ্গে এই ধরনের ব্যবহার বোঝা খুব মুশকিল।

মহারাজ : ঐ তো বলছেন, কী জানি বাবা, কিসে কী হয়!

—বিচারের ওপর অত আস্থা নেই। তার জন্যই তো ঐরকম বলা। গড়াগড়ি খাচ্ছেন কালীঘাটে গিয়ে। কালীঘাটে—মা নাকি কোন সময়ে মানত করেছিলেন। তাঁর নিজের মা, গর্ভধারিণী মা। সেই আমেরিকা-টামেরিকা সব ঘুরে এসেছেন। তারপরে খেয়াল হল—হ্যাঁ, তাই তো। মানতটা ছিল তো। তা ওখানে গিয়ে পূজা করেছেন, হোম করেছেন। তারপর সাতবার প্রদক্ষিণ করে গড়াগড়ি দিয়েছেন। বলছেন—না, মা

বলেছিল, মানত করেছিল, তাই করতে হয়। তাই বলছি, বিচারও আছে। কিন্তু এখানে বিশ্বাসের হেতু মা।

মহারাজ : এই তো বৈশিষ্ট্য। মহাপুরুষের এই বৈশিষ্ট্য। লোকোত্তর জীবন। সাধারণ লোকের মাপকাঠি দিয়ে মাপা যায় না। একবার খুব চটে গেছেন। চটে গিয়ে বলছেন, শালারা তোদের মঠে...। ভাষাটা বললাম না। বলে, সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। একটা বৈশিষ্ট্য এর থেকে দেখবার। বলছেন, তোদের মঠ—আমার মঠ নয়। তিনিই করলেন সব। এখন বলছেন—তোদের মঠ। মমত্ববোধ নেই। এইরকম মহাপুরুষদের জীবনের অনেক দিক আছে, যা সাধারণের মাপকাঠি দিয়ে মাপা যায় না।

—সেইজন্য আমরা বুঝতে পারি না যে, এইগুলোর সাথে সামঞ্জস্য কী। ঐ যে কথাটা বললেন—বিচার এত করছেন, আবার এরকম বিপরীত ব্যবহারও করছেন—বোঝা যায় না। মহারাজ আজ কথা এই পর্যন্ত।

॥ ৮৭ ॥

মহারাজ : বল।

প্রশ্ন : শরৎ মহারাজ বলেছেন, এক লক্ষ জপ; এক লক্ষ জপ করলে মন্ত্র শক্তিশালী হয়।

মহারাজ : শক্তিশালী, হ্যাঁ সক্রিয়। শক্তিশালী মানে সক্রিয়, গতিশীল।

—এটা আমরা কিভাবে বুঝব?

মহারাজ : এমনিতে তোমরা বুঝতে পারবে না। কিন্তু মন্ত্র সক্রিয় হয়ে উঠবে। মন্ত্র তার নিজের ক্রিয়া শুরু করলে তুমি মনের আনন্দ ও একাগ্রতা অনুভব করবে এবং অনুরাগও বাড়বে। এর থেকেই বুঝবে যে, মন্ত্র জাগ্রত হয়েছে।

—মন্ত্র জাগ্রত হওয়া আর কুণ্ডলিনী জাগ্রত হওয়া তো আলাদা—তাই না মহারাজ?

মহারাজ : হ্যাঁ। আলাদা। সকলেই মন্ত্র জাগ্রত করতে পারে কিন্তু কুণ্ডলিনী শুধু যোগীরাই জাগ্রত করতে পারে। হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ)

বলেছেন—অভ্যাস—বৈরাগ্য অভ্যাস, নিরন্তর একটা ভাবকে মনে ধরে রেখে অভ্যাস কর।

—ঠাকুরের ভাবধারা অনুযায়ী এখন এই বৈরাগ্য বা ত্যাগের অভ্যাস কিভাবে করব সেবিষয়ে কিছু ধারণা দেবেন?

মহারাজ : অভ্যাস—বুঝলে না?

—শুধুমাত্র আমাদের ভাবধারায়, মানে আমাদের ভাবধারার যে পারিপার্শ্বিকতা সেই অনুযায়ী কর্ম ও উপাসনা তো একই সঙ্গে করছি—

মহারাজ : আমাদের মতাদর্শের জন্য নয়, সর্বক্ষেত্রেই এই পন্থা গ্রহণীয়। শুধুমাত্র আমাদের মতাদর্শ অনুযায়ী নয়। এটাই শাস্ত্রের নির্দেশ। এবং যারা শাস্ত্রে বিশ্বাস করে তাদের কাছে সর্বদাই এই তত্ত্ব ফলপ্রসূ হবে। এসো। এগিয়ে এসো না। বল কিছু।

প্রশ্ন : স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, জ্বলজ্বল করছে মন্ত্র দেখলাম। কিন্তু প্রাণে শান্তি পেলাম না। এটা স্বামীজী কেন বলছেন মহারাজ?

মহারাজ : শান্তি পাওয়া, স্বামীজী যা বলছেন, ভিতরে প্রবল যে-উত্তেজনা থাকে ভগবদনুভূতির জন্যে, ছোটখাট experience-এ তার তৃপ্তি হয় না। এইজন্যে বলছেন। বল। "এবারে সবে অধোমুখে চাহি। কাহারও উত্তর কিছু নাহি।"

প্রশ্ন : মহারাজ, ঠাকুরের সম্পর্কে ভৈরবী ব্রাহ্মণী বলছেন—এবারে নিত্যানন্দের খোলে গৌরাঙ্গের আবির্ভাব। একথাটার তাৎপর্য কী মহারাজ?

মহারাজ : নিত্যানন্দের রঙ বোধ হয় ফরসা ছিল না। শ্রীগৌরাঙ্গ ফরসা ছিলেন। ঠাকুরের রঙও খুব উজ্জ্বল ছিল বলে মনে হয় না।

—না মহারাজ, শ্রীমায়ের কথায় আছে, উজ্জ্বল বর্ণ ছিল আগে। সাধনার সময় কঠোরতা করে করে ঠাকুরের রঙ একটু কালো হয়ে গিয়েছিল।

মহারাজ : সুতরাং তোমরা ঐ পথে যেয়ো না! কালো হয়ে যাবে! (সকলের হাসি)

—নিত্যানন্দের খোলে গৌরাঙ্গের আবির্ভাব কিভাবে বোঝা যাবে?

মহারাজ : এসব ভাবের কথা, সব বোঝা যায় না। আন্দাজে একটা ব্যাখ্যা হয়।

—সাধনার জন্য আমরা কিভাবে বুঝব?

মহারাজ : এগুলো সাধনের জন্য যে একান্ত প্রয়োজন, তা নয়। খোলটা নিত্যানন্দের, কিন্তু ভিতরে গৌরাঙ্গ। নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গ থেকে পৃথক মনে হয়। এখানে পার্থক্য নেই। দুই মিশে গেছে। খোল একটা, একটা ভেতরের তত্ত্ব। যেমন আমরা ঘুরিয়ে বলতে পারি—স্বামীজীর খোলে ঠাকুরের আবির্ভাব। তাই না?

—স্বামীজী তো বলেছেন, এর মধ্যে তিনিই করাচ্ছেন। এমনি আপাত দিক থেকে গৌরাঙ্গ এবং নিত্যানন্দের ভাবের কী পার্থক্য বোঝা যায়?

মহারাজ : নিত্যানন্দ গৃহী হয়েছিলেন। গৃহস্থ ভক্তের আদর্শ তৈরি করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাসী হয়েছেন। বৈষ্ণবদের ব্যাখ্যা আছে। শ্রীগৌরাঙ্গ খুব ফরসা ছিলেন। আর কৃষ্ণ কালো ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের শ্রীরাধা-ভাবসম্বলিত তনু। শ্রীরাধার ভাবেতে শ্রীচৈতন্যের অঙ্গ গোরা হয়ে গেল। ভেতরে শ্রীকৃষ্ণ রয়েছেন। কিন্তু শ্রীরাধার ভাবে অঙ্গ গৌর হয়ে গেল। এগুলো আমাদের সাধনের জন্য খুব উপযোগী নয়। তত্ত্ববিচার করতে গেলে এসব কাজে লাগে।

—বলা হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধার দুটি ভাব একসঙ্গে আস্বাদ করার জন্য গৌরাঙ্গের ভিতরে দুটো ভাবই ছিল। ঠাকুর এক জায়গায় মাস্টারমশায়কে ভাব-মহাভাব বলতে বলতে বলছেন, এতদূর তোমাদের দরকার নেই। এসব নজিরের জন্য। এই।

—এগুলি নজিরের জন্য?

মহারাজ : সাধনা সম্বন্ধে। ঠাকুর যত সাধনা করেছেন, অত আমাদের দরকার নেই। এগুলো সব নজির অর্থাৎ দৃষ্টান্ত দেখাবার জন্য।

—যে-জিনিসের দরকার হয় না, সেটার দৃষ্টান্ত দেখাবার প্রয়োজন কী? যেটা আমরা করতে পারব না বা যেটা সাধনের যোগ্য নয়, তার নজিরের কী দরকার?

মহারাজ : একটাই না হয় কর। তিনি যোল টাং করেছেন, তোমরা এক টাং কর। যোল টাং-এর এক টাং তোমরা জীবনে সফল কর। ঠাকুর

অনন্ত ভাবময়। সে অনন্ত ভাবের আমাদের দরকার নেই। একটা ভাবে ডুবে যাও, তাহলেই যথেষ্ট।

—তা, স্বামীজী তো জোর দিয়েছেন চারটে ভাবের—চারটে যোগের সমন্বয়ে আমাদের চরিত্র গঠিত হবে।

মহারাজ : পরিপূর্ণতার কথা সেখানে। এও তো বলেছেন, চার যোগের ভেতরে যেকোন একটাকে অবলম্বন করেও জীবনকে সার্থক করতে পারবে। আমাদের ভেতর যেমন কারো বক্তৃতা দেওয়ার শক্তির বিকাশ হয়েছে, কারো পরিচালন-শক্তির বিকাশ হয়েছে। ধ্যান-জপেও কারো কারো বিকাশ হতে পারে। কারো কিছু বিকশিত হচ্ছে না—এমন বলা যাবে কি? যাই করি—ভাবতন্ময়তা চাই।

—তাহলে আমাদের এই দৈনন্দিন জীবনে যে রুটিন বা স্বামীজীর যে-প্রথা আমাদের জীবনের আদর্শ—মঠের কাজ-টাজ, তার সঙ্গে এই ভাবতন্ময়তার কী করে একটা সামঞ্জস্য হতে পারে, সেটা একটু বলুন। যেটা আমাদের সাধনের অনুকূল হবে।

মহারাজ : সাধন মানে, একটা organization হল বিভিন্ন রকমের মানুষের সমাবেশ। কাজেই সকলকে adjust করে নিতে হবে। এইজন্যে সামঞ্জস্যের ওপর জোর দিতে হবে। কিন্তু সকলের পক্ষে সমানভাবে সবগুলোকে accept করা সম্ভব নয়। যার যেটা ভাব, সে সেটা সেইভাবে করবে। স্বামীজী লেখাপড়ার ওপর খুব জোর দিয়েছেন। কেষ্টলাল মহারাজ বললেন—স্বামীজী, আমার পড়াশুনো করতে ইচ্ছা হয় না। তা, কী করতে ইচ্ছা করে?—জপ করতে।—আচ্ছা তুই জপ কর।

—তা এখন কি সংঘের পক্ষে এভাবে স্বাধীনতা দেওয়া সম্ভব? আমাদের সংঘের এখন যে ব্যাপকতা তাতে আমাদের এরকম নিজের ভাবে থাকতে দেওয়া কি সম্ভব হবে?

মহারাজ : ঐ যে বললাম, organization মানে adjustment।

—তাহলে compromise কিছুটা হচ্ছেই।

মহারাজ : Compromise নয়। এটা প্রয়োজন। সমন্বয়। ধর, একজন কাজের সময় বসে বসে জপ করছে—

—Account লেখার সময় বা টাইপ করছি যখন, তখন তো জপ করা যাবে না।

মহারাজ : তাই তো বলছি। একটা মজার গল্প আছে না—গুরু আর শিষ্যের গল্প। শিষ্য কাজের সময় বসে জপ করছে। গুরু বলছে—ওরে হরে, এটা কর তো। শিষ্য বলছে—আমি জপে আছি। তারপর আরেকবার আরেকটা কাজে বলেছে—হরে, এটা কর তো। আবার বলছে—আমি জপে আছি। তা, শেষে বলছে—হরে খাবি আয়। তখন হরে বলছে—কত আর গুরুর কথা না শুনে চলব! (সকলের হাসি)

—এ তো ভাবের ঘরে চুরি।

মহারাজ : হ্যাঁ, এ ভাবের ঘরে চুরি। ভাবের ঘরে চুরি যেন না হয়। আন্তরিকভাবে যদি কেউ জপে মগ্ন হয়, তাকে কেউ বলবে না—তুমি জপ করো না। কিন্তু যেখানে দেখা যাচ্ছে, সেরকম আন্তরিকতা নেই—সেখানে বলে—ব্যাটা, বসে বসে জপ করছ? আর কাজকর্ম করবে কে? বাবুরাম মহারাজ এরকম করতেন। সাধু বা ব্রহ্মচারী জপ করছে, ধ্যান করছে—তাকে টেনে উঠিয়ে নিয়ে বাগানে কাজে লাগাচ্ছেন। তারপরে বাবুরাম মহারাজের ওপরে সকলেই বিরক্ত—আপনি এরকম করে আমাদের জপধ্যানেতে ব্যাঘাত ঘটান। বলেন—ব্যাটারা জানিস, ও জপ করছে, ধ্যান করছে, না কী করছে? জপ-ধ্যান করার সামর্থ্য সকলের নেই। কাজেই পাঁচটা কাজ নিয়ে তাকে থাকতে হয়। যারা তপস্যা করতে গেছে—তাদের সকলের এটাই অনুভব যে, তপস্যা করার শক্তি এক সময় ফুরিয়ে যায়। তখন কাজে লাগতে হয়।

—এপ্রসঙ্গো মাধবানন্দজীর কথা বলেছিলেন।

মহারাজ : হ্যাঁ। স্বামী মাধবানন্দ বলেছিলেন—কিছুদিন কাটানোর পর মাথাটা ফাঁকা মনে হয়। মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে তপস্যা করতে খুব উৎসাহ দিলেন। তা তিনি বললেন—যাও, তারপরে আবার এসে ঠাকুরের কাজে লাগবে। বাধা দেননি। এখন ছুটি হবে না—একথা বলেননি। তখন ছুটি শব্দটা যদিও প্রচলিত ছিল না।

প্রশ্ন : একজন রঙে অনেকের কাপড় ছুপিয়ে দিচ্ছে। শেষের লোকটি বলল—আপনি যে-রঙে ছুপেছেন, সেই রঙটি আমার চাই। তা, আপনি যে-রঙে ছুপেছেন সেই রঙটির মানে কী মহারাজ?

মহারাজ : সেই রঙটি মানে, সর্বভাবের যেখানে সমাবেশ। এক একটি রঙে ছুপছে তো—গামলায় থাকছে যেন একটি রঙ, কিন্তু ছুপছে আলাদা আলাদা। তা বলছে—আপনি যে-রঙে ছুপেছেন, আমার সেই রঙ চাই। অর্থাৎ সর্বভাবের যেখানে সমাবেশ। একটা কথা আছে—যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ। যে সাকারভাবে দেখতে চায়, সে সাকারভাবে দেখে। যে নিরাকারভাবে দেখতে চায়, সে নিরাকারভাবে দেখে। দেখা মানে ঐরকম চোখের দেখা নয়। দেখা মানে অনুভব। দেখা কথাটার মানে এই।

—যেমন স্পষ্ট অনুভব হয়?

মহারাজ : যেমন উপনিষদে বলছে না, ব্রহ্মদর্শন কিরকম? "যথাদর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে।/ যথাপ্সু পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্বলোকে/ ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে।" (কঠোপনিষদ্, ২।৩।৫) কোন্ লোকে কি-রকম দর্শন হয় বলছে। মনুষ্যলোকে খুব দর্শন হয়। যেমন আরশিতে দেখা যায়। প্রতিবিম্ব যেমন দেখা যায়। যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে। স্বপ্নদর্শন যেমন অস্পষ্ট হয় ঐরকম পিতৃলোকে হয়। "যথাপ্সুপরীবদদৃশে তথা গন্ধর্বলোকে।" জলের ওপর যেমন ছায়া দেখা যায়, সেইরকম গন্ধর্বলোকে। আর "ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে"। আলো আর অন্ধকার যেমন স্পষ্ট সেইরকম ব্রহ্মলোকে।

॥ ৮৮ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, অনেক ভক্ত বলেন, ঠাকুরের মর্মর মূর্তি পাথরের নয়। ঠাকুর যেন সশরীরে বিরাজ করছেন।

মহারাজ : যদি কেউ এমন বলে, তুমি তখন বলবে—মার্বেল পাথর নয়?

—আমি তা মনে করি না, মহারাজ।

মহারাজ : তুমি মনে কর না, কিন্তু এমনি কেউ জিজ্ঞেস করলে তুমি কী বলবে?

—আমি তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বলব, সেটা মার্বেল পাথরের তৈরি। না হলে মারতে আসবে।

মহারাজ : প্রস্তর-নির্মিত মূর্তি। শুদ্ধ, পবিত্র। মর্মর—মর্মর মানে মর্ম—অন্তঃকরণ। শুদ্ধ অন্তঃকরণে যে-রূপ প্রতিভাত হয়। মিলে গেল।

—মন্দিরে যাবেন?

মহারাজ : হ্যাঁ, তা যাব।

প্রশ্ন : মহারাজ, একবার বলেছিলেন, গান্ধীজী না রাজেন্দ্রপ্রসাদ—কে যেন রাজকোট আশ্রমে এসেছিলেন?

মহারাজ : হ্যাঁ।

—গান্ধীজী?

মহারাজ : না। রাজেন্দ্রপ্রসাদ।

—আপনার সময় মহারাজ?

মহারাজ : হ্যাঁ।

—কোন উৎসবে, মহারাজ?

মহারাজ : হ্যাঁ। উৎসব মানে আমাদের ডিসপেনসারি বাড়িটি উদ্বোধন করার সময়।

—তখন তিনি প্রেসিডেন্ট?

মহারাজ : হ্যাঁ, প্রেসিডেন্ট।

—বক্তৃতাও দিয়েছিলেন?

মহারাজ : তা তো দিতেই হয়। এলেই বলতে হয়, তা বললেন—আমি রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে relief work করেছিলাম। তার জন্য নিজেকে ধন্য মনে করি।

—কোথায়?

মহারাজ : বিহারের earthquake relief-এ।

—মহারাজ, গান্ধীজীর সঙ্গে আপনার কোনদিন দেখা বা কথাবার্তা হয়েছিল?

মহারাজ : রাজকোটে হয়েছে। আর অন্য কোথায় মনে নেই।

—মহারাজ, একবার রাজকোট আশ্রমে ছাত্রাবাসের ছাত্ররা একটা কী গণ্ডগোল-টণ্ডগোল করেছিল। আপনি কিভাবে সেটা সামলেছিলেন, সেটা একটু বলুন।

মহারাজ : মজা হচ্ছে, ওরা সব ক্রিকেট সম্বন্ধে বড্ড উৎসাহী। তা, তখন একটা টেস্ট ম্যাচ হচ্ছে। ছেলেরা ছুটি চায় দেখবার জন্যে। তা, ছুটি দিয়েছি। একদিন ছুটি দিয়েছি। তখন ৫ দিন খেলা। তা বলছি, অতদিন তো পারব না। একদিন ছুটি হলো। রোববার একদিন—দুদিন হয়ে গেল। তারপরে ছেলেরা আবার ছুটি চায়। তা হেডমাস্টার এসে আমাকে বলছে, ছেলেরা তো কিছুতেই কথা শুনছে না। তারা খেলা দেখতে যেতে চায়। তা আমি বললাম—আপনি হেডমাস্টার, আপনি manage করুন। হেডমাস্টার বললেন—আমি পারছি না। আমি গেলাম। গিয়ে ছেলেদের বললাম—তোমরা লাইন করে দাঁড়াও। যারা ক্রিকেট দেখতে আগ্রহী, তারা একপাশে যাও। আর যারা পড়াশোনা করতে আগ্রহী, তারা এপাশে দাঁড়াও। (সকলের হাসি)

—তারপর?

মহারাজ : প্রথমে দুটো দল হলো। তারপরে একজন একজন করে সব এসে একটা লাইনে মিশে গেল। (সকলের হাসি) এইরকম আরেকবার হয়েছিল। যারা Matric-এর পরীক্ষার্থী তারা একটা আলাদা ঘর চায়। আলাদা ঘর দেওয়াও হয়েছিল। তারপরে আরো কী চায়। তাই নিয়ে খুব শোরগোল। তা আমি বললাম—তোমরা যারা প্রতিবাদ করতে চাও, তারা এখান থেকে বিদায় হও। এখানে থাকলে এখানকার নিয়ম মানতে হবে। আর যদি না মানতে পার, বাড়ি যাও। তা একজন আবার নেতা ছিল। তার বাবা সেখানকার এক বড় নেতা। কাজেই রক্তটা গরম। ঠিক আছে, তারা বলল—আমরা তাহলে বাড়িই যাব।—যাও। বললাম—এখন আর

কী করে যাবে, রাত হয়ে গেছে। সকালে চলে যাবে। পরদিন দেখি সবাই রয়ে গেল। (সকলের হাসি)

—এটাও রাজকোটে।

মহারাজ : হ্যাঁ, রাজকোটে।

—ছাত্রাবাস উঠে গেল কেন, মহারাজ?

মহারাজ : ছাত্রাবাস উঠে যায়নি।

—এখন নেই তো।

মহারাজ : ছাত্রাবাস ওঠেনি। স্কুল বন্ধ হয়ে গেল। এই আমার কৃতিত্ব—ওখানে স্কুল বন্ধ করা। আমার পূর্ববর্তী যিনি, তিনি স্কুলের সব করেছিলেন। স্কুল চলবে—Residential school—হেডমাস্টার। না, তখন হেডমাস্টার বলে না, Principal বলে। তা Principal চান না, স্কুল উঠে যায়। আমি বলি, এরকম করে কি স্কুল চলে নাকি? এখানে দুটো ক্লাস, ওখানে দুটো ক্লাস। তারপর ছেলেরা কোথায় কী করছে, কেউ দেখবার থাকে না। এরকম করে স্কুল হয় না। আমরা স্কুল চালাতে পারছি না, দেখতে পাচ্ছি। আমি বললাম—স্কুল বন্ধ করতে হবে, উপায় নেই। তা হেডমাস্টার খুব বিরোধী। ভক্ত, কিন্তু খুব বিরোধী। জানে তার চাকরি যাবে। তখন একটা কমিটি ছিল। সেই কমিটিতে আলোচনা হয়েছিল। তখন হেডমাস্টার সব কমিটি-মেম্বারদের কাছে গিয়ে গিয়ে প্রচার করছে যে, এইরকম। তা কর। আমি একজনকে খালি বলেছিলাম, যে Vice-president, তাকে বলেছিলাম। আর কাউকে বলিনি। Meeting বসল। President যিনি ছিলেন, তিনি বললেন—আমি preside করব না। তা না কর। Vice-president যে, সেই preside করবে। তখন Meeting-এ ভোট নেওয়া হলো। তা ভোটে দেখা গেল যে, tie হলো।

—বাবা! (হাসি) Tie হয়ে গেল!

মহারাজ : পক্ষে যতজন, বিপক্ষে ততজন। একজন বলল যে, Chairman-এর ভোট দেওয়া উচিত নয়। তা বলে, সে কী! Chairman যে, তার ভোট থাকবেই। তাছাড়া Chairman হিসাবে তার একটা casting vote-

ও থাকবে। তার ভোট দেওয়ার অধিকার নেই কেন? আটকে গেল। তারপরে আগের Chairman যে ছিল, সে তখন নরম হয়ে গেছে। দেখে যে, এ তো পাশ হয়ে গেল। তখন হতাশ হয়ে আবার সে এল। তখন আমি বললাম—কেন অনর্থক এরকম বিরোধিতা করছেন। স্কুল চালানো এভাবে অসম্ভব। ঘর নেই, বাড়ি নেই। মাঠে বসে হাই স্কুল হবে? তারপর বন্ধ হয়ে গেল। আমারই কৃতিত্ব স্কুল বন্ধ করা। (সকলের হাসি)

—তখন তো ওরা বড় স্কুল পেল। অন্য একটা স্কুলের সঙ্গে যোগ হয়ে গেল।

মহারাজ : তখনি করা হয়েছিল।

প্রশ্ন : মহারাজ, আপনার গঙ্গোত্রী দর্শনের ঘটনাটা?

মহারাজ : তা একদিনে চলে গেছি ৫৬ মাইল।

—একটা জায়গা আছে, আগে নাকি সেখানে হাঁটতে হতো। গঙ্গোত্রী যেতে তার আগে একটা নদী—ভৈরবধারী। নিচে নেমে আবার উঠতে হয়। হেঁটে যেতে হয় ঐ জায়গাটায়। এখন ব্রিজ হয়ে গেছে।

মহারাজ : খুব উঁচুতে একটা ব্রিজ আছে। সেটা ভেঙে গেছে। সেটাতে যায় না। তা গঙ্গার ওপর দিয়ে যে-রাস্তা ছিল, সেটা প্রায়ই ভেঙে যেত। অনেকবার contract দিয়েছে। তারা করেছে, আবার ভেঙে গেছে। সেখানে নাকি এখন কিভাবে ব্রিজ তৈরি করেছে।

—এখন খুব বড় পাকা ব্রিজ হয়েছে, ওটা এশিয়াতে সবচাইতে উঁচুতে; অত বড় ব্রিজ আর নেই।

মহারাজ : তাই নাকি?

—হ্যাঁ, মহারাজ।

মহারাজ : সমস্ত দেশের ব্রিজগুলো দেখেছ?

—কিন্তু অত উঁচুতে অত বড় ব্রিজ আর নেই।

মহারাজ : আমরা ভাঙাটা দেখেছি। আমরা যখন গেছি গঙ্গোত্রী, রাস্তায় দেখা যায় খুব উঁচুতে একটা ভাঙা ব্রিজ;—তা তখন ব্যবহার হতো না।

—আপনারা হেঁটে গেছেন?

মহারাজ : তোমাদের মতো কি গাড়ি করে গেছি? (সকলের হাসি)

—মহারাজ, আপনি বললেন ৫৬ কিলোমিটার একদিনে হেঁটে গেলেন।

মহারাজ : ৫৬ কিলোমিটার বলিনি। মাইল।

—মাইল?

মহারাজ : হ্যাঁ।

—একদিনে?

মহারাজ : হ্যাঁ। একদিনে।

—ভাবতে রোগা হয়ে যাচ্ছে, মহারাজ।

মহারাজ : ভাবতে রোগা হয়ে যাচ্ছে! সর্বনাশ! এক ব্রহ্মচারী, রোগা ছিপছিপে, লম্বা। তা ঝড়ের মতো করে চলত। আরেকজন ব্যোম ব্যোম করতে করতে দৌড়ত। সব পাগলের দল তো। (সকলের হাসি) আমাদের এ আর কী। ওখানে তালে বাড়া তালে বাড়া। (সকলের হাসি) একজন সাধু বলছে, মহারাজ—আপ্ তো বহুৎ পড়ে লিখে হ্যায়, আপ জানতা হ্যায় এ টোপি কাঁহাসে আয়ি? আমি বলি—ক্যা জানে। পতা নেহি। তা বলে—মহারাজ, ইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরনে ভেজা। (সকলের উচ্চ হাসি) তা আমি মনে মনে ভাবছি, এটা তার মাথায় ছাড়া আর কোথায় শোভা পাবে! (সকলের হাসি) এরকম আমাদের আর কটি? ওরকম ছড়িয়ে ছিটিয়ে অনেক আছে। তা ব্যোম ব্যোম করত যে, সে বাবা—পাহাড়ের চড়াইয়ে ছুটে যেত।

—মহারাজ, আপনি গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী গিয়েছিলেন কি সেই একবার?

মহারাজ : আমি গঙ্গোত্রী গেছি, যমুনোত্রী যাইনি।

—গঙ্গোত্রী যে গেছেন, তা কি সেই তপস্যার সময়? না, অন্য সময়?

মহারাজ : তপস্যার সময়ে তিনদিন ছিলাম ওখানে। আমার ইচ্ছে ছিল, আরো থাকব। কিন্তু খুব ঠান্ডা। তারপরে পেটের অসুখ হয়ে গেল। Dysentery হয়ে গেল। পারলাম না থাকতে।

—কত সালে, মহারাজ?

মহারাজ : ঐ সাল-টাল—আমি খবর রাখি না। কালাতীত। (সকলের হাসি)

—তা, যমুনোত্রী যাওয়ার ইচ্ছে হয়নি, নাকি?

মহারাজ : যমুনোত্রী কেন—গঙ্গোত্রীও যাবার ইচ্ছে ছিল না। শক্তি মহারাজের সঙ্গে ছিলাম। শক্তি মহারাজ করে এলেন। তিনি এসে বললেন—যান, দেখুন আপনার আনন্দ হবে। তা বলে বলে আমাকে রাজি করালেন। তা গেলাম।

—হেঁটে গিয়েছিলেন মহারাজ?

মহারাজ : হেঁটে নয় তো কী! পালকি কোথায় পাব?

—না, এখনকার সাধুরা তো ঘোড়াতে যায়।

মহারাজ : এখন ঘোড়াতে নয়, এখন মোটরে যায়।

—এখন গঙ্গোত্রী পর্যন্ত বাস চলে যায়। ব্রিজ হয়ে গেছে। আর কেদার-বদরীও কি তখন করেছিলেন, মহারাজ?

মহারাজ : বদরী গেছি, কেদার নয়। তখন যাইনি। এখান থেকে পরে প্রভু মহারাজের সঙ্গে গেছি।

—আপনি মহারাজ, কাঠমাণ্ডুতে গিয়েছিলেন পরে?

মহারাজ : হ্যাঁ, ঐরকম দৃশ্য আর দেখিনি। প্লেনে যাচ্ছি, আর সব বরফে ঢাকা। এত কাছে মনে হচ্ছে পাহাড়ের মাথাগুলো। প্লেন যাচ্ছে, মনে হচ্ছে হাত দিয়ে বরফ ধরা যায়।

—আর অমরনাথ?

মহারাজ : অমরনাথে গেছি ডাণ্ডি করে। কাউল—শ্রীনগরের ভক্ত কাউল—তারা সব খরচ দিয়েছিল। ডাণ্ডির ভাড়া হল ১৫০০ টাকা। তারা বলল, আমরা আরো ২০০ টাকা বেশি দেব, মহারাজকে কোথাও নামাবে না। ওরা কিছুটা হেঁটে—করে কী, বলে, একটু বসুন। তখন ওরা চলে যায়। তাদের আর ধরা যায় না। অনেকটা হাঁটতে হয়। এইরকম দুষ্টুমি করে মাঝে মাঝে। একেবারে গোড়া অবধি উঠিয়ে দিয়েছিল। সেখানে একটা Plastic sheet—তার ওপরে কম্বল পেতে বেশ উঁচু উঁচু করেছে।

—মহারাজ, ডাণ্ডি কি একজনে নিয়ে যায়, নাকি দুজনে নিয়ে যায়?

মহারাজ : চারজন। দুজন সামনে, দুজন পিছনে। একজনকে বিশ্রাম দেবে বলে আরেকজন বেশি নেয়। শেষে অতিরিক্ত যে-লোকটা সে মাল নিয়ে গেল, ডাণ্ডি ধরতে হয়নি। ডাণ্ডিতে চারজন। আরেক জায়গায় রাস্তাটা—পায়ে চলা রাস্তা। সেখানে দুজন দুজন করে যেতে পারে না। সেখানে সামনে একজন, পিছনে একজন। ভাবলাম—দিলে বুঝি ফেলে! আর মহাগুনপাস সাড়ে চোদ্দ হাজার ফুট উঁচু। গিয়ে নামিয়ে ডাণ্ডিওয়ালারা শুয়েই পড়ল বিশ্রামের জন্য। পুলিশগুলো বলতে লাগল—সব নেমে যাও নেমে যাও—অক্সিজেন কমতি হ্যায়।

—আসি মহারাজ।

মহারাজ : অক্সিজেন কমে গেছে। (সকলের হাসি)

॥ ৮৯ ॥

প্রশ্ন : দেশে ফেরার পর স্বামীজীকে দক্ষিণেশ্বরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। তাঁর বিরুদ্ধে লিখেছিলেন পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে আবার মত পালটেছিলেন। তখন স্বামীজীর সঙ্গে বেশ সৌহার্দ্য হয়।

মহারাজ : পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়?

—হ্যাঁ, ঐরকমই, 'বঙ্গবাসী'তে লিখতেন স্বামীজীর বিরুদ্ধে। বিরুদ্ধে লিখতেন কিছু পয়সার জন্য।

মহারাজ : পয়সার জন্য!

—পরে নিজে আরেকটা পত্রিকা চালিয়েছেন। যখন স্বামীজীর শরীর যায় তখন 'বঙ্গবাসী' কটাক্ষ করেছিল আর সামান্য একটু খবর দিয়েছিল। তাতে ওদের বিরুদ্ধে নিজের পত্রিকাতে খুব নিন্দা করলেন।

মহারাজ : পাঁচকড়ি দাম। পাঁচকড়ি মানে পাঁচটা কড়ি। জান তো, এক কড়ি, তিন কড়ি, পাঁচ কড়ি, সাত কড়ি, ন কড়ি আছে। তারপর আর নেই।

—মহারাজ, আপনাদের সময় কড়ির প্রচলন ছিল?

মহারাজ : কড়ি তো দাম হিসেবে ব্যবহার হতো না। তবে শব্দটা খুব প্রচলিত ছিল। চার কড়িতে এক গণ্ডা। হ্যাঁ। তখন নামতা পড়ার মতো শেখানো হতো। পাঠশালায় লাইন করে সব ছেলেরা দাঁড়াত। একজন সর্দার বলত আর সকলে তার অনুকরণে বলত। তা বলত, চার কড়িতে এক গণ্ডা। আর যেসব ছেলে আলিস্যি করে, তারা বলত—অন্ডা। (সকলের উচ্চ হাসি) যাকগে, ভাল কথা বল।

প্রশ্ন : ঠাকুর মাকে ফলহারিণী কালীপূজা তিথিতে ষোড়শীপূজা করলেন—

মহারাজ : ষোড়শীপুজো সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ষোড়শী মানে তার ষোল বছর বয়স হওয়া উচিত। তা মায়ের বয়স তখন কত ছিল? ষোল বছর নয়।

—না, বেশি।

মহারাজ : এইজন্য অনেকে বলে ওটা ষোড়শী নয়, ভুবনেশ্বরী পুজো। কিন্তু ষোড়শীপুজো বলে প্রচলিত হয়ে গেছে।

—ত্রিপুরসুন্দরীও বলে। ত্রিপুরসুন্দরী-ষোড়শী।

মহারাজ : ত্রিপুর তো নাম। দশমহাবিদ্যাতে আছে—

"কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশ মহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্তিতা॥"

(প্রাণতোষণী, কাণ্ড ৫, পরিচ্ছেদ ৬)

—তবে ষোড়শীর নাকি অনেক নাম। এটা মনে হয় তাঁরই নাম। এই ত্রিপুরসুন্দরী, শ্রী তারপর কামাখ্যাও নাকি ষোড়শী।

মহারাজ : কামাক্ষী না কামাখ্যি?

—না, কামাক্ষী। ঐ কাঞ্চীপুরমে। শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠা করলেন। সেই কামাক্ষী দেবী। তা, মহারাজ, এতে আমরা কী শিক্ষালাভ করতে পারি, এখানে ঠাকুর যে মাকে পূজা করলেন ষোড়শীজ্ঞানে—এটার তাৎপর্য কী?

মহারাজ : তাৎপর্য হচ্ছে—প্রতিমাতে আমরা পুজো করি তো? তা ঐ মা জীবন্ত প্রতিমা। তাঁকে পুজো করেছেন। স্ত্রীকে পুজো করা। এটা একটা নতুন। স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য—উত্থানের জন্য একটা নজির দেখালেন। এইভাবে ব্যাখ্যা।

—স্ত্রীজাতির উত্থান। আবার এটাও তো হতে পারে মহারাজ যে, সংসারে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সম্বন্ধটা কী হওয়া উচিত, সেটাও তিনি দেখালেন?

মহারাজ : ঠাকুর কামগন্ধহীন, মা-ও কামগন্ধহীনা। তাঁদের সম্বন্ধ এরকম।

—না, আমরা বলতে চাইছিলাম, যেটা শরৎ মহারাজ বলছেন—

মহারাজ : দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছেন যে, এসম্বন্ধ দৈব সম্বন্ধ। কামুক সম্বন্ধ নয়।

—আমরা সেটা বলছি না মহারাজ। আমরা বলছি যে, সংসারে কিরকম দাম্পত্য জীবন, আদর্শ জীবন হওয়া উচিত—এটা ঠাকুর দেখালেন।

মহারাজ : এইরকম জীবন আর দেখা যায় নাকি?

—না, আদর্শ। আদর্শকে দেখালেন।

মহারাজ : আদর্শ মানে—তাদের ছেলেপুলে হবে না?

—শরৎ মহারাজ এটাই তো বললেন। কেন উনি বিয়ে করলেন? তিনি বলছেন—এই দাম্পত্য জীবনের আদর্শ দেখাবার জন্য।

মহারাজ : ঠাকুর বলছেন—আচ্ছা, বিয়ে হলো কেন বল দিকি? যার কাপড়ের কোন হুঁশ থাকে না, তার আবার বিয়ে কেন? তারপরে নানা জনে নানা কথা বলছেন। পরে ঠাকুর বলছেন—দেখ সংস্কার মানতে হয়। বিয়ে করা একটা সংস্কার। এটাকে মানতে হয়। তা, শরৎ মহারাজ ঠাকুরের সঙ্গে একমত নন?

—না, এটা উনি মানেননি। এটা উনি উল্লেখ করেছেন, ঠাকুরের এই কথাটাতে এর চেয়ে আরো গূঢ় অর্থ রয়েছে।

মহারাজ : কী অর্থ?

—একটি ছেলে, একটি মেয়ে হওয়ার পরে আর শারীরিক কোন সম্পর্ক থাকবে না।

মহারাজ : তা বলেছেন। দু-একটি ছেলে মেয়ে হলে তারপর ভাই বোনের মতো থাকবে। এই বলেছেন।

প্রশ্ন : মহারাজ, ইসলাম সাধন আর ইসলাম গ্রহণ—দুটো কি এক? দুটো কি এক পর্যায়ে পড়ে?

মহারাজ : সাধনা করলেন যখন, ইসলাম রূপেতেই করলেন। তারপরে আবার ছেড়েও দিলেন। সাধন ও গ্রহণ একসঙ্গে তো, তবে এক গন্ডির ভিতরে সীমিত রইলেন না। ইসলাম সাধন আর ইসলামধর্ম গ্রহণ দুটো এক বৈকি। তবে সামাজিক হিসেবে ইসলামধর্ম গ্রহণ নয়। ইসলাম সাধন—কোন সামাজিক চোখে অনুষ্ঠান নয়। আর ইসলামে যেটা ধর্ম সেটা সামাজিক ধর্ম। মুসলমানের ঘরে যে জন্মাবে সে-ই মুসলিম।

—অনেকে তো বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ইসলামধর্ম গ্রহণ করে তো মুসলমান হয়ে গিয়েছেন।

মহারাজ : ইসলামধর্ম গ্রহণ করেননি। ইসলাম সাধন করেছেন।

—সেটাই। ইসলাম সাধন করেছেন, গ্রহণ করেননি।

মহারাজ : তবু কথাটা বুঝতে গোলমাল হবে। যখন সাধন করেছেন তখন ইসলামে যেমন বিধান আছে সেই হিসেবেই করেছেন। গোবিন্দ রায়—তাঁর কাছে দীক্ষিত হয়েছিলেন ইসলামধর্মে। মুশকিল আর কী! তাঁদের কার্য লোকোত্তর। "ঈশ্বরাণাং বচঃ কার্যং তেষাং আচরণং ক্বচিৎ।" ঈশ্বর—যাঁরা লোকোত্তর পুরুষ, তাঁরা যে-উপদেশ দেন সেটা গ্রহণ করতে হয়। তাঁদের কার্য কখনো গ্রহণ করবে, কখনো করবে না—এই আর কী। ঠাকুর তো ঘন ঘন অনেক কিছু করেছেন। মুশকিল আর কী। ঐরকম আমরা করলে কী অবস্থা হবে। তিনি সবই করেছেন বটে!

—হ্যাঁ। সেটাই। আসলে নি—মহারাজের একটু কষ্ট হয়। বাংলাদেশে থাকেন, আর শোনেন, ঠাকুর converted হয়েছেন। তার উত্তরে কী বলবেন, সেটা বুঝে পান না। (সকলের হাসি)

মহারাজ : ঠাকুর সব ধর্ম মানতেন। সাধনাও করেছেন। খ্রিস্টধর্ম মতে যেমন, তেমন ইসলামের মতে। ব্যাপার হচ্ছে, ঠাকুরের কাছে সম্প্রদায়

নয়, ধর্মই আসল। সাধনেতে সকলের স্বতন্ত্রতা আছে। কিন্তু সমাজে স্বতন্ত্রতা নেই। সেখানে লাঠালাঠি হয়।

—মহারাজ, আমরা আসছি।

মহারাজ : আমাদের এক সাধু—অমূল্য নাম ছিল—নিঃসঙ্গানন্দ না কী। তা সে conference-এ বক্তৃতা করেছে। ইসলাম সম্বন্ধে বলল খুব। তা প্রভু মহারাজ তার নাম দিলেন মোল্লাজী। (সকলের হাসি)

প্রশ্ন : মহারাজ, স্বামীজী ভক্তিযোগে এক জায়গায় বলছেন যে, সমষ্টিকে না ভালবেসে ব্যষ্টিকে কী করে ভালবাসতে পারি? কারণ, সমষ্টিই ঈশ্বর। আর আমরা সমষ্টিকে কী করে বা ভালবাসব? সমষ্টিকে পাচ্ছি কোথায়, ব্যষ্টিকেই তো পাচ্ছি।

মহারাজ : ব্যষ্টিকে ব্যষ্টি দিয়ে, সমষ্টিকে সমষ্টি দিয়ে—ব্যষ্টির সমগ্রই তো সমষ্টি।

—ঠিক। কিন্তু আমরা তো ব্যষ্টিকেই পাচ্ছি কাছে। আমরা তো সমষ্টিকে ধরতে পারছি না। বা তার চেয়ে আমরা সমষ্টিকে তো—

মহারাজ : যদি ব্যষ্টি সমষ্টির representative হয়?

—তাহলে তো ব্যষ্টিকে ভালবাসলেই হলো।

মহারাজ : হলো তো।

—কিন্তু স্বামীজী তো উলটোটা বলেছেন। বলেছেন, প্রথমে সমষ্টিকে ভাল না বেসে কী করে ব্যষ্টিকে ভালবাসা যায়? কারণ, সমষ্টিই ঈশ্বর। প্রথমে সমষ্টিকে ভালবাসতে বলেছেন। আমরা তো বুঝতে পারছি না।

মহারাজ : আরে! আমরা উলটোটা করি। কারণ, সমষ্টি যে ঈশ্বর সেটা আমরা জানি না। কিন্তু অন্তত সমষ্টির—"যঃ সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্বেভ্যো ভূতেভ্যোঽন্তরো যং সর্বাণি ভূতানি ন বিদুর্যস্য সর্বাণি ভূতানি শরীরং যঃ সর্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃত ইত্যধি-ভূতমথাধ্যাত্মম্।।" (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৩।৭।১৫)

—কিন্তু ব্যষ্টিকে এক এক করে ভালবেসে সমষ্টিকে যে ভালবাসা যাবে, সেইরকমও নয়। আমরা তো—

মহারাজ : তা নয়। কত ব্যষ্টি আছে!

—সেই। তাহলে উপায় কী? সমষ্টিকে কী করে ভালবাসা যাবে?

মহারাজ : যখন ব্যষ্টিকে সত্যি সত্যি ভালবাসবে, তখন তার উপাধিবর্জিতরূপেই তাকে ভালবাসবে। সেই উপাধির দ্বারা ভালবাসা সীমিত হবে না।

—ব্যষ্টি মানেই তো উপাধির দ্বারা সীমিত।

মহারাজ : তাই। কিন্তু যখন ভালবাসাটা গভীর হবে, তখন আর উপাধির ভেতর সেটা সীমিত হবে না। একটা দৃষ্টান্ত বলছি, মা ছেলেকে ভালবাসে। ছেলে চন্দনমাখা থাকলেও ভালবাসে, নোংরা মাখা থাকলেও ভালবাসে। চন্দন বা নোংরা—এগুলো তার উপাধি। হ্যাঁ? এগুলো ছেলের উপাধি। তা উপাধিবর্জিতরূপেই মা ছেলেকে ভালবাসে।

—তা মাস্টারমশায় একবার বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে ঠাকুরকে বলছেন যে, উনি এটা-ওটা করছেন, পাঁচরকম কার্য নিয়ে ব্যস্ত আছেন, কিন্তু ভগবানে বিশ্বাস করেন না। তখন ঠাকুর বলছেন—উনি এক ভগবানকে না জেনে, এটা-ওটা পাঁচটা জানলেন কী করে? ভগবানে বিশ্বাস না করে আর এককে না জেনে এটা-ওটা পাঁচটা জানলেন কী করে?

মহারাজ : তাই তো।

—তাহলে কি অজানতেই এককে ভালবাসছেন—এটাই বোঝাতে চাইছেন?

মহারাজ : বৃহদারণ্যকে বলছে না—"ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি।" (২।৪।৫) এই তো—মানে আত্মাকেই ভালবাসছেন।

—উপাধিবর্জিত আত্মাকে তো আমরা জানি না, তা কী করে ভালবাসব?

মহারাজ : জানি না। কিন্তু ভালবাসি—না জেনেও। যেহেতু তিনি সর্বত্র আছেন উপাধির দ্বারা আপাত সীমিত হয়ে; তবে তিনি কখনোই কোনকিছুর দ্বারাই সীমিত হন না—সেইজন্যই আমরা সব জায়গায় ভালবাসতে শিখেছি।

—এই যে অজানতে ভালবাসা, এটা কি আমাদের পথে এগিয়ে দিতে পারবে? আমরা যদি না জেনে, আমাদের আত্মাকে না জেনে—

মহারাজ : ভালবাসা যখন হয় তখন আর জানাজানির বাকি থাকে না। ভালবাসা মানুষকে তাঁর থেকে অভিন্ন করে দেয়। ভালবাসা দুজনকে এক করে দেয়।

—ভালবাসা যে এক করে দেয়—এটার কী মানে? পৃথগত্ব রাখার কোন চেষ্টা থাকবে না? তাহলে সেটা অনুভব বা আস্বাদ কী করে হবে?

মহারাজ : তখন ভেদের দিকে দৃষ্টি থাকে না।

দুহো মন অনুভব পেশল জানি।
ন সো রমণ নো হাম রমণী॥

দুহো মন অনুভব পেশল জানি—এই।

—তার মানে এই যে ভালবাসা বা ভক্তি—এই করেও তিনি অদ্বৈত অবস্থা লাভ করতে পারবেন—যদিও তিনি জানেন না?

মহারাজ : অ্যাঁ?

—না জেনেও এই ভক্তিকে চর্চা করে করে সে অদ্বৈত অবস্থা লাভ করতে পারে—ভগবানকে ভালবেসে?

মহারাজ : আবার অদ্বৈত অবস্থা আসছে কোথা থেকে?

—এই যে আপনি বললেন দুই এক হয়ে যায়—

মহারাজ : হ্যাঁ, দুই এক হয়ে যায়।

—সেটাই বলছি। দুই যে এক হয়ে যায়—এই একত্ব অনুভব তাহলে ভালবাসার দ্বারাও হতে পারে।

মহারাজ : ভালবাসার স্বভাবই এই, তা দুজনকে নিকট থেকে নিকটতর, নিকটতম করে যখন, তখন পার্থক্য থাকে না তো।

—তাই। সেইজন্য বলছি, ভক্তিযোগের সাধনাতে আচার্যরা যে বলে যাচ্ছেন বারবার—দ্বৈত দ্বৈত, কিন্তু ভক্তির স্বভাব সেই এক তত্ত্বে নিয়ে যাওয়া।

মহারাজ : সেই রকম স্বামীজী বলছেন, একজন দরজায় ঘা দিয়েছে—বলছে কে? তা, বলছে—আমি। খুলল না। তারপরে আবার ধাক্কা দিচ্ছে, বলছে কে?—আমি। খুলল না। তারপরে আবার ধাক্কা দিল। বলছে—কে?—তুমি। খুলে গেল দরজা। যখন সব তুমি হয়ে যায়, তখন আর কে দরজা বন্ধ করবে?

—মহারাজ, ঠাকুর-স্বামীজীর সময় থেকেই কি বিশেষ করে এই জিনিসটি প্রচার হয়েছে? এর আগেও কি এটা ছিল—এরকম?

মহারাজ : এটা তো প্রাচীন কথা। ফারসি কথা।

—ফারসি কথা, মুসলমানদের মধ্যে ছিল! আমাদের হিন্দুদের মধ্যে এই ধরনের—

মহারাজ : এই তো মজা। প্রেমেতে মানুষকে এক করে দেয়।

—ঠিকই কথা। আমরা এখন স্বামীজীর এই কথা পড়ে শুনে বুঝে বলছি। কিন্তু মহারাজ, আমি বলতে চাইছিলাম যে, ভক্তিপথে আচার্যরা কিন্তু ভেদ সব সময়ে রাখতে চেষ্টা করেন।

মহারাজ : ভেদ থাকে। তারপরে দুই-এর পার্থক্য মিশে যায়।

—এটা শরৎ মহারাজও বলছেন, ঠাকুরের কথাতেও আছে। স্বামীজীর কথাতেও আছে।

মহারাজ : রায় রামানন্দের গানেতেও আছে।

—আপনি ভাগবতের একটা শ্লোক বলেন মহারাজ, যেখানে সে সেবা করতেই চায়। সার্ষ্টি, সালোক্য, একত্ব অনুভব করতে চায় না।

মহারাজ : আরে সেও তো আছে, একত্ব অনুভব করতে চায় না। কিন্তু যাবে কোথায়? ভালবাসা দুইকে এক করে দেয়। ও যতই বলে, আমি চিনি হতে চাই না, আমি চিনি খেতে ভালবাসি। ঐ খেতে খেতে আর একসময় আমি থাকবে না।

—সেটাই তো বলছি মহারাজ। ভাগবতে আছে—গোপীরা বলছেন, আমি সেই কৃষ্ণ। গোপী হয়ে কৃষ্ণপ্রেমে একত্ব অনুভব হয়ে যাচ্ছে।

মহারাজ : এই তো মজা। এই প্রেমের অদ্বৈত।

—আজকে ভাল কথা হল, মহারাজ।

মহারাজ : ভাল কথা তো হল। কিন্তু কতটা ভাল বলে নিজের মধ্যে নিলাম—কানেই রইল নাকি প্রাণ অবধি পৌঁছাল? চুপ হয়ে গেলে যে!

—হ্যাঁ।

॥ ৯০ ॥

প্রশ্ন : জপ আর ধ্যান কি কর্মের বন্ধন কমাতে পারে? যদি অবিদ্যা থেকে মুক্ত হওয়া যায়, তাহলে কি স্বাভাবিকভাবেই কর্মপাশ কেটে যায় না?

মহারাজ : দুধরনের মায়া আছে—বিদ্যামায়া আর অবিদ্যামায়া।

—শ্রীমা বলেছেন, কর্মপাশ কেটে যায়—

মহারাজ : কর্মপাশ মানে—যে-কর্ম ফলদায়ক, সেই কর্মের বন্ধন কেটে যায়।

—অমঙ্গল বা অশুভ কর্মই কি ফলদায়ক?

মহারাজ : তা নয়, তা নয়। যখন তুমি ফলের আকাঙ্ক্ষা না করে কোন কর্ম কর তখন তার কোন ফলাফলের প্রভাব থাকে না।

—কিন্তু কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা যদি চলে যায় তাহলে কর্মও তো থাকবে না—তাই না মহারাজ?

মহারাজ : কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা?

—কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা চলে গেলে স্বাভাবিকভাবেই কি কর্মের ইচ্ছাও চলে যাবে? কর্ম কি তখন থাকে না?

মহারাজ : কর্ম থাকে না—এরকম কোন কথা নেই। ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে না।

—ফলাকাঙ্ক্ষা যদি না থাকে তাহলে স্বাভাবিকভাবেই বুঝতে হবে যে, মন শুদ্ধ হয়েছে—তাই না মহারাজ? স্বামীজী কর্মযোগে এক জায়গায় বলেছেন—তুমি যদি নিঃস্বার্থ হও তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তোমার মন শুদ্ধ হবে এবং আত্মায় তার প্রকাশ ঘটবে।

মহারাজ : নিঃস্বার্থ এবং কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া—এদুটো এক নয়। তুমি যখন উপাসনা কর তখন তার কোন ফলাকাঙ্ক্ষা তোমার নাও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে ওটা থাকে—উপাসনাটা থেকে যায়, শুধু ফলটাই থাকে না।

—কিন্তু এর দ্বারা—উপাসনার দ্বারা মন শুদ্ধ হয়। আর এটাও বলা হয়েছে যে, তারাই ঈশ্বরের দর্শন পাবে যাদের হৃদয় শুদ্ধ।

মহারাজ : তারা উপাসনা করে না?

—উপাসনার সাহায্যে তারা প্রেমা-ভক্তি লাভ করে।

মহারাজ : উপাসনার সাহায্যে শুধু প্রেমা-ভক্তিই বুঝি পাওয়া যায়? তাহলে তো কোন বিরোধই নেই।

—উচ্চতম প্রেমা-ভক্তি আর জ্ঞান—দুটো তো একই, তাই না?

মহারাজ : না। এটা কী করে হবে? ভক্তি ভগবানকে আরাধনা করতে চায় কিন্তু জ্ঞান বলতে যে সেটাই বোঝায়—এমন নয়।

—প্রেমের যে মহত্তম ধারণা তাতে শুধু একটা জিনিসই থাকে—ভালবাসা। শুধু ভালবাসাই থাকে।

মহারাজ : কার প্রতি ভালবাসা? শুধু ভালবাসার জন্য ভালবাসা হয় না। ভালবাসার কোন লক্ষ্য অবশ্যই থাকবে।

—তাহলে প্রেমা-ভক্তি আর জ্ঞান—দুটো আলাদা মহারাজ?

মহারাজ : অবশ্যই। ভক্তি মানে—অনুরাগ প্রকাশের একটা লক্ষ্যবস্তু থাকবে। জ্ঞান মানে—লক্ষ্যবস্তুর প্রয়োজন নেই।

—প্রাথমিক অবস্থায় এটা কি সত্য মহারাজ?

মহারাজ : প্রাথমিক অবস্থা বলতে তুমি কি বোঝাচ্ছ?

—যখন ভক্তি গাঢ় হয়নি, মহারাজ?

মহারাজ : কেন? তখন কি ভক্তির লক্ষ্য পালিয়ে যায়?

—না, সারদানন্দ মহারাজ 'লীলাপ্রসঙ্গ'-এ বলেছেন, প্রাথমিক অবস্থায় পার্থক্য আছে। কিন্তু তাদের মধ্যে অনুরাগ যত বাড়বে একাত্মবোধও তত জেগে উঠবে—'আমি' তখন 'তুমি' হয়ে যাবে।

মহারাজ : কোন লক্ষ্য ছাড়া তুমি অনুরাগ উপলব্ধি করতে পার?

—হ্যাঁ, প্রাথমিকভাবে। কিন্তু এখন একাত্মবোধ এসেছে।

মহারাজ : আবার প্রাথমিকভাবে! শেষ পর্যন্ত কী হবে? ভালবাস, কিন্তু ভালবাসার কোন উদ্দেশ্য নেই—এটা কী ধরনের ভালবাসা?

—শেষে প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ অভিন্ন হয়ে উঠবে।

মহারাজ : তাহলে ভালবাসাও চলে যাবে। যদি কোন লক্ষ্য না থাকে তাহলে ভালবাসা তো শূন্যে ঝুলবে। সেটাই উচ্চতম অনুরাগ যার পিছনে কোন স্বার্থ-সম্বন্ধ থাকে না। "ন কাঞ্চন কামং কাময়তে।" সেটাই মহত্তম ভালবাসা। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ভালবাসার লক্ষ্য থাকবে না, শূন্যে ভাসবে। এরকম হলে ভালবাসায় ছেদ পড়ে তার সমাপ্তি ঘটবে।

—তার মানে পৃথক অস্তিত্ব থাকছে।

মহারাজ : থাকছে। প্রেমী ও প্রেমাস্পদ—দুটোই থাকছে।

—মুক্তি কী মহারাজ? এটা কি মুক্তি নয়?

মহারাজ : Term-গুলো গুলিয়ে ফেলো না। মুক্তি অন্য জিনিস। তুমি যদি অনন্তজীবনে ডুব দাও তাহলে তুমি বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ভালবাসার কোন লক্ষ্য নেই।

—তাহলে ভালবাসা আর জ্ঞান—দুটো কি পরস্পরবিরোধী না তাদের সহাবস্থান হতে পারে?

মহারাজ : এরা একে অপর থেকে আলাদা।

—তারা কি সমান্তরালভাবে চলতে পারে?

মহারাজ : ভালবাসা হল একটা আবেগ। জ্ঞান কোন আবেগ নয়। তাদের মধ্যে এটাই মূল পার্থক্য।

—মহারাজ, গতকাল যে-কথা হয়েছে তাতে একটু সংশয় হচ্ছে আমাদের। কালকে কথা হল—প্রেমের অদ্বৈত।

মহারাজ : প্রেমের অদ্বৈত?

—প্রেমে এক হয়ে যায়। স্বামীজীর গল্প বললেন না—knock করল—কে? উত্তর এল, তুমি—

মহারাজ : ব্যাপার হচ্ছে—এটা যুক্তিসঙ্গতভাবে ভাবতে হবে। তুমি যদি মনে কর যে, কোথাও ভালবাসা আছে—তাহলে সেই ভালবাসা তো শূন্যে ভাসতে পারে না।

—স্বামীজী যেমন বলেছেন, পরাবিদ্যা আর পরাভক্তি এক। সেটা শেষ করেছেন এইভাবে।

মহারাজ : পরাবিদ্যা বলতে এটা বোঝায় না যে, কোন লক্ষ্য ছাড়াই ভালবাসার অস্তিত্ব থাকতে পারে।

—উচ্চতম জ্ঞান—পরাবিদ্যা—

মহারাজ : আত্মজ্ঞান।

—উচ্চতম জ্ঞান আর মহত্তম ভক্তি?

মহারাজ : আমি এ-দুটোর স্বরূপ বুঝতে পারছি না। ভক্তি একটা আবেগ বা অনুভূতি। কিন্তু জ্ঞান তা নয়। সুতরাং তারা কখনোই একরকম হতে পারে না।

—একটা বক্তৃতায় বলা হয়েছিল—পরাবিদ্যা আর পরাভক্তি এক—

মহারাজ : পরাবিদ্যার সাহায্যে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পার, পরাভক্তির মাধ্যমেও লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়। কিন্তু তাতে এই দুটো এক হয়ে যায় না। এটা দুটো ভিন্ন পথ। তারা একই লক্ষ্যে পৌঁছে দেয় বটে কিন্তু দুটো শব্দের অর্থই ভিন্ন। যেকোন একটা শব্দকে প্রসঙ্গের বাইরে এনে বিচারকালেই বোঝা যায় যে, অর্থটা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। 'সা কস্মৈচিৎ পরমপ্রেমরূপা'—পরাভক্তি। তাহলে কস্মৈচিৎ থেকে যাচ্ছে—বুঝেছ?

—ও, হ্যাঁ মহারাজ।

মহারাজ : হ্যাঁ।

—এটা হল নারদীয় ভক্তিসূত্র। ঠাকুর আর স্বামীজীর মতে এরা কিন্তু সমার্থক।

মহারাজ : নারদীয় ভক্তিসূত্র অনুযায়ী এরা কিন্তু এক নয়। তাহলে নারদ কি স্বামীজীর থেকে ছোট?

—প্রত্যেকেই তাদের নিজের নিজের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ। নারদ শুধু ভক্তি প্রচার করেছেন; স্বামীজী কিন্তু শুধু ভক্তির ওপরেই জোর দেননি।

মহারাজ : এটা সত্য যে, নারদ শুধু ভক্তি প্রচার করেছেন। তাহলে স্বামীজী কী প্রচার করেছেন? শুধু জ্ঞান?

—জ্ঞানও, ভক্তিও।

মহারাজ : তাহলে তারা এক হয় কী করে? ভক্তি মানে কিছুর প্রতি অনুরাগ।

—জ্ঞানের কি কোন লক্ষ্য আছে?

মহারাজ : জ্ঞানের ক্ষেত্রে লক্ষ্যের কোন প্রয়োজন নেই।

—ঠিক আছে, আবার কালকে হবে।

মহারাজ : চল।

—কালকে কোমর কষে আসছি।

মহারাজ : কোমর বেঁধে এসো, তাতে আপত্তি নেই। কোমর বাঁধা মানে, আটঘাট বাঁধা। অর্থাৎ, চিন্তা-ভাবনার মধ্যে যেন কোন খুঁত না থাকে। এরকম একটা গল্প শোন—এক উকিলে জেরা করছে। আরেক উকিল মক্কেলকে মাঝে মাঝে ইশারা করছে। মক্কেল বলছে—মাদুরে। উকিল একটু চোখ টিপেছে। আজ্ঞে মাদুরে নয়, মাটিতে। তা বলছে—একবার বলছ মাটি, একবার বলছ মাদুর!—মাদুরটা ছেঁড়া ছিল কিনা, এইজন্য খানিকটা মাটিতে খানিকটা মাদুরে—। (সকলের হাসি)

॥ ৯১ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, আজকাল এত খরচ করা—এগুলিকে রোখা যায় না? এ তো অনেকে পছন্দ করছে না। আমরা মুখে বলছি খরচ কমাও, কিন্তু চলছে তো আবার।

মহারাজ : কী জানি! এসব আজকালের ধারার সঙ্গে আমরা পরিচিত নই। কাজেই বুড়ো বয়সে এখন কী বলব? আগে আমরা দেখিনি যে, ভাণ্ডারায় টাকা দিত। আমাদের ভিতর কোন চলন ছিল না ভাণ্ডারায় টাকা

দেওয়ার। এখন দেখছি, টাকাটা প্রায় সকলেই দেয়, আবার কাপড়ও কেউ কেউ দেয়। তখন কাপড়চোপড় খুব একটা দিত না। তখন কাপড়ের অভাব থাকলেও আমাদের চলে যেত। ১০ হাত কাপড়কে কেটে ৫ হাত ৫ হাত করে দুখানা হয়ে যেত। তখন ১০ হাত কাপড় কেউ যদি পরত—বলত বাবু।

—১০ হাত কাপড় যেগুলো—ওগুলো কি মহারাজ খদ্দর? কাপড় যেগুলো পরা হতো—single করে তো পরা হতো, তা পাতলা নয় নিশ্চয়ই, মোটা।

মহারাজ : তখন কাপড় মোটাই ছিল। তারপর পরতে পরতে ওগুলো পাতলা হয়ে যেত।

—মহারাজ, এখন যে-কাপড় আপনি দেন, সেই কাপড় এক পরত করে পরা যাবে না।

মহারাজ : আমার দোষ সেটা? (সকলের হাসি)

—দেখুন মহারাজ, কিরকম করে বলছে!

মহারাজ : আরে বাবা! আমি যেমন পাই তেমন দিই। (সকলের হাসি) এখন ওরা—ভক্তরা দেয় যখন তখন যা সবচেয়ে ভাল জিনিস, তাই দেয়। তা কী করবে?

প্রশ্ন : কোঠারি হাসপাতালে আপনি তো এই প্রথম ভর্তি হলেন?

মহারাজ : হ্যাঁ। কোঠারিতে আগে কখনো আসিনি।

—মহারাজ, শুনলাম ওখানে সব কর্মীকে রসগোল্লা খাইয়েছেন।

মহারাজ : তাহলে তোমরাও কি হাঁ করে আছ? (সকলের হাসি) একটা ছেলে খালি মাকে বিরক্ত করে—এটা দাও, ওটা দাও। তখন মা চটে গিয়ে—খালি এটা দাও ওটা দাও। তুই আমায় কী দিস? তো চুপ করে বলল— LOVE। মা ঠান্ডা হয়ে গেল।

—তাই। আমাদেরও মহারাজ আইসক্রিম।

মহারাজ : তা, রসগোল্লার বদলে LOVE। (সকলের হাসি)

—আমাদের মনের কথাটাই বলে দিলেন আপনি। আমাদের side-এ হচ্ছে Love। আর আপনার Ice cream with love।

মহারাজ : এ আবার কিরকম? Love from a warm heart, not from a cold heart. একবার শুনলাম Ice cream-খাওয়ানো হবে, হবে হবে করে ভেস্তে গেল।

—আপনার শরীরটা খারাপ শুনে আমরা কথাই তুলতে পারিনি। এখন আপনি সুস্থ হলে আমরা বলব।

মহারাজ : সুস্থ হলে তোমরা বলবে। তারপর শরীর যে আর খারাপ হবে না—এমন কোন ব্যাপার নেই।

—শরীর তো মহারাজ খারাপ হতেই পারে। কিন্তু Ice cream তো হবে।

মহারাজ : তা, অন্তত ভাণ্ডারা তো হবে!

—সেটা এখন আমরা ভাবছি না।

মহারাজ : ভাণ্ডারা হবেই বা কিভাবে? আমার তো কোন টাকাকড়ি নেই। (সকলের হাসি)

—আপনার টাকাকড়ির দরকার কী? যেভাবে কোঠারিতে সকলে ৮০০ রসগোল্লা খেল, সেই রকম Ice creamও হবে।

মহারাজ : পা—, তুমি আর বলো না। এরপর রসগোল্লা খেলে ফেটে যাবে।

—আপনি মহারাজ গরম গরম ৮০০ রসগোল্লা খাওয়ালেন ওখানকার কর্মীদের, আর আমাদের জন্য কিছু না?

মহারাজ : রসগোল্লা নয়, রাজভোগ। (সকলের হাসি)

—তাহলে তো মহারাজ, এখানে ভাণ্ডারা হবে।

মহারাজ : তাই নাকি?

—আজ্ঞে মহারাজ।

মহারাজ : কিসের ভাণ্ডারা?

—Ice cream-এর।

মহারাজ : কবে? (সকলের হাসি)

—আজকে বললে আজকেই, কালকে বললে কালকে।

মহারাজ : আমি তো জানি না কিছুই। (সকলের হাসি)

—না বললে আপনি জানবেন কী করে? আপনি বলুন, হ্যাঁ, কালকে হবে—তবে তো জানবেন।

মহারাজ : তারপরে বলবে, কোথা থেকে হবে?

—আপনি শুধু একবার বলে দিন। তারপর সব ঠিক করে দেব।

মহারাজ : কাকে বলব?

—আপনি বলুন না খালি—হ্যাঁ, কালকে হবে।

মহারাজ : তোমাদের বলব?

—আমাদেরই বলুন না, তাহলেই হবে।

মহারাজ : আর যদি বলি, কালকে হবে না।

—তাহলে পরশু হবে। কালকে হবে না মানেই পরশু হবে।

মহারাজ : এইরকম মানে হয় নাকি? (সকলের হাসি) এইভাবে তোমরা পড়াও ওখানে (ট্রেনিং সেন্টার)? (সকলের হাসি)

—কালকে শিখিয়ে দিলেন না, লক্ষণা কী করে করতে হয়? অতএব আমরা বুঝে নিয়েছি। আপনি খালি বলুন—কালকে হবে। তাহলেই আমরা বুঝে নেব।

মহারাজ : আর আমি যদি বলি কালকে হবে না, তাহলে বলবে কবে হবে? (সকলের হাসি)

—তার মানে আপনি বলছেন, আজকেই হোক।

মহারাজ : ওসব প্যাঁচে আমি পা দিই না।

—Ice cream-এর ব্যাপারে আপনি তো consent দিয়েই দিয়েছেন। শুধু আপনার শরীরটা খারাপ বলে পিছিয়ে গেছে।

মহারাজ : হুঁ?

—এবারের কথাগুলি আপনি শুনতে পাচ্ছেন না, না মহারাজ?

মহারাজ : (না-সূচক মাথা নাড়লেন। সকলের উচ্চ হাসি) একটা গল্প আছে। শেষ সময়ে বাবা খাবি খাচ্ছে—মরতে চলেছে। ছেলেকে বলছে—বাবা, অমুকের কাছে আমার এই পাওনা আছে। তমুকের কাছে আমার এই পাওনা আছে। শুনে ছেলে বলছে—দেখেছিস বাবার কিরকম

memory! এখনো সব মনে আছে। তারপর বাবা বলছে, অমুকের কাছে আমার এত দেনা আছে। এবার ছেলে বলছে—এইরে, বাবা ভুল বকছে। (সকলের হাসি) এই প্রা—, কত টাকা রেখে যাচ্ছ ভাণ্ডারার জন্য?

—টাকা? আমার টাকা নেই।

মহারাজ : তাহলে তুমি মরেও লাভ নেই। (সকলের হাসি)

—মহারাজ, গণেশ মহারাজকে কি ডাকব?

মহারাজ : সে বকবে। (সকলের হাসি) গণেশকে ডাকলে শুঁড় নাড়বে।

—মহারাজ, এইভাবে (হ্যাঁ-সূচক) নাড়বে।

মহারাজ : মেঘদূতে আছে—যখন যাচ্ছে, মেঘকে বলছে—'দিঙ্‌নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্।' দিঙ্‌নাগানাং মানে হাতিদের স্থূল হস্ত, মানে শুঁড়—সেই হাত বুলিয়ে তোমাদের শেষ করে দেবে। তার থেকে দূর দিয়ে যাবে। মেঘদূতকে বলছেন কেন? দিঙ্‌নাগ—দার্শনিক ছিল। তাদের দর্শনটা স্থূল। তাই বলছে—'স্থূলহস্তাবলেপান্ পরিহরন্'—তার ধার দিয়ে যাবে না।

—মহারাজ, সব ঠিক আছে। গণেশ মহারাজ বলেছেন, আপনি হ্যাঁ বলে দিলেই হয়ে যাবে।

মহারাজ : হ্যাঁ বলে দেব, না হাঁ করে দেব? (সকলের হাসি)

—হ্যাঁ বলবেন মহারাজ। আপনি আওয়াজ করে হ্যাঁ বলুন।

(মহারাজ হ্যাঁ না করে হিস্ করে শব্দ করলেন) (সকলের হাসি)

—মহারাজ, Ice cream খুব নরম, আপনি এত শক্ত কেন? (সকলের হাসি)

মহারাজ : হেনকালে আচম্বিতে গণেশের প্রবেশ। (সকলের হাসি)

গণেশ মঃ—মহারাজ, সব গরম হয়ে গেছে। ঠান্ডা করতে হবে।

মহারাজ : পানী পীনেকা বরফ দিলেই হবে। (সকলের উচ্চ হাসি)

গণেশ মঃ—বরফই দেবেন cream মাখিয়ে।

—তাহলেই হবে মহারাজ।

মহারাজ : তোমরা শুনেছ পানী পীনেকা বরফ? আমার সব মনে থাকে না।

—মনে যাতে থাকে তার ব্যবস্থা করুন, মহারাজ।

মহারাজ : গণেশের আবির্ভাব, গণেশের তিরোভাব।

প্রশ্ন : মহারাজ, একটু Ice cream-এর জন্য কত কাণ্ডই না চলছে—

মহারাজ : হ্যাঁ, শিবমহিম্নঃস্তোত্রে আছে না?

রথঃ ক্ষৌণী যন্তা শতধৃতিরগেন্দ্রো ধনুরথো
রথাঙ্গো চন্দ্রর্কৌ রথচরণপাণিঃ শর ইতি।
দিধক্ষোস্তে কোঽয়ং ত্রিপুরতৃণমাড়ম্বরবিধি—
র্বিধেয়ৈঃ ক্রীড়ন্ত্যো ন খলু পরতন্ত্রাঃ প্রভুধিয়ঃ।। ১৮।।

অর্থাৎ, ত্রিপুররূপ একটি তৃণকে দগ্ধ করতে তোমার এ কি আড়ম্বর বিধান যে, তখন তোমার রথ হয়েছিল পৃথিবী, সারথি হয়েছিলেন ব্রহ্মা, সুমেরু পর্বত হয়েছিল ধনু, চন্দ্র ও সূর্য হয়েছিল দুই রথচক্র এবং চক্রপাণি বিষ্ণু হয়েছিলেন শর! ঈশ্বরের সঙ্কল্প কখনও পরবস্তু-সাপেক্ষ নয়; অতএব (মনে হয় যে নিজের) আজ্ঞাধীন দ্রব্যের দ্বারা তিনি ক্রীড়ামাত্র করেন।

চন্দ্র-সূর্য—রথের দুটি চাকা। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ—তিনি রথচরণ মানে চক্র। চক্রপাণি শ্রীকৃষ্ণ। তিনি হলেন শর। ত্রিপুর একটা তৃণ। তাকে পোড়াবার জন্য এ কী বিরাট আয়োজন! 'ন খলু পরতন্ত্রাঃ' তাঁর যারা দাস তাদের নিয়ে প্রভু খেলা করেন। তাঁর কাছে ত্রিপুরকে মারবার জন্য এত বিরাট আয়োজন দরকার ছিল না। প্রভু যিনি, সকলের নিয়ন্তা যিনি—তাঁর কাছে পরতন্ত্রতা নেই। অপরের সাহায্য নিয়ে ত্রিপুরাসুরকে বধ করবেন—এরকম কোন কথা নেই। তিনি খেলা করছেন এই নিয়ে।

—ভগবানের খেলা হচ্ছে?

মহারাজ : খেলা। একটা তৃণকে পোড়াবার জন্য একটা বিরাট আয়োজন। এ কী কথা? এ হল তাঁর খেলা।

প্রশ্ন : স্বামীজীর শরীর কত তাড়াতাড়ি চলে গেল—

মহারাজ : হুঁ, মাত্র ৩৯ বছরে।

—স্বামীজীর সবটাই একেবারে হিসাবের বাইরে। এত অল্প বয়সের জীবনের মধ্যে একেবারে সব করে চলে গেলেন। আজকে মহারাজ 4th of July।

মহারাজ : 4th of July. The day of American Independence.

—স্বামীজী কবিতা লিখেছিলেন 4th of July-এর ওপরে। আজকে Radio-তে অনেকক্ষণ স্বামীজী সম্বন্ধে বলেছে। তিনি কী করে জীবনযাপন করেছেন। মহাসমাধির দিন তিনি হঠাৎ করে শরীর ছেড়ে চলে যাবেন—অন্যেরা কিছু বুঝতেই পারেননি, ইত্যাদি।

মহারাজ : তুমি কী করে মরবে, তুমি জান?

—না।

মহারাজ : স্বামীজী বলেছিলেন—ইচ্ছামৃত্যু। "অপি সর্বং জীবিতম্ অল্পমেব।" যতদিনই বাঁচুক—অনন্তকালের তুলনায় কিছুই না।

—৪০ হোক, ৮০ হোক আর ১০০ হোক।

মহারাজ : অনন্তকালের তুলনায় কতটুকু?

—৩৯ বছর কিছুই না।

মহারাজ : Achievement-টা দেখ।

—ঠিকই। আসি মহারাজ।

প্রশ্ন : মহারাজ, মুখস্থ করায় বিপদ আছে—আপনি কী একটা যাত্রাপালার গল্প বলেন—

মহারাজ : হ্যাঁ, মুখস্থ করতে গিয়ে হয়েছে কী—বলছে, ভীম হস্তে গদার প্রবেশ। (সকলের হাসি) একটু উলটে গেছে। ভীম হস্তে গদার প্রবেশ—বলতে বলতে ঢুকেছে। তারপরে এক জায়গায় লেখা আছে, ব্রাকেটের মধ্যে, পদাঘাত। এখন ব্রাকেটের মধ্যে—ব্রাকেট খুঁজে পাচ্ছে না। (সকলের হাসি) তারপরে অধিকারী এসেছে। তাকে দেখেই পদাঘাত! (মহারাজের হাসি)

॥ ৯২ ॥

প্রশ্ন : আজ রথযাত্রা—

মহারাজ : "রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।"

—মহারাজ, আপনি পুরীর রথ দেখেছেন?

মহারাজ : টিভিতে দেখেছি।

—না মহারাজ, ওখানে সাক্ষাৎ—?

মহারাজ : না, সাক্ষাতে কখনো দেখিনি।

—স্নানপূর্ণিমা? স্নানযাত্রা? স্নানযাত্রা দেখেছেন কখনো?

মহারাজ : একটা যাত্রা দেখেছি বটে—চন্দনযাত্রা।

—চন্দনযাত্রা বলে। রথের ওপরে উঠে ভক্তরা জগন্নাথকে আলিঙ্গান করে। এটা দিনের বেলায় ওরা করতে দেয় না। ঐ রাতের বেলা যখন লোকজন খুব কমে যায়, তখন—

মহারাজ : হ্যাঁ, তখন। মাস্টারমশায়কে একবার ঠাকুর বলেছিলেন, জগন্নাথকে আলিঙ্গান করবে। তা তিনি—রথে না, এমনি মন্দিরে গেছেন। তা রত্নবেদি পরিক্রমা করতে দেয়। কিন্তু রত্নবেদিতে উঠতে দেয় না। তার তো কথা ছিল, ঠাকুর বলেছেন—আলিঙ্গান করতে হবে। তা, রত্নবেদিতে না উঠে তো আলিঙ্গান হয় না। এখন বুদ্ধি করে করলেন কী, কিছু খুচরো সিকি, আধুলি, দু-আনি—এমনি করে নিয়ে গেছেন। গিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছেন। দিব্যি সব কুড়াতে লেগেছে। এরই মধ্যে উনি রত্নবেদিতে উঠে জগন্নাথকে আলিঙ্গান করলেন। (সকলের হাসি)

—বা বা! কিরকম বুদ্ধি দেখেছেন! রত্নবেদিতে লাফ দিয়ে উঠেছেন, আলিঙ্গান করেছেন। তারপরে এখানে ফিরে এসে ঠাকুরকে বলেছেন। শুনে ঠাকুর খুব খুশি হয়েছেন। ঠাকুর আবার তাঁকে আলিঙ্গান করেছেন। পাণ্ডাগুলো ওপরে বসে থাকে।

মহারাজ : আর কতগুলি ছড়িদার আছে। খপ্পাৎ করে মারে। তা আমাদের রামময় মহারাজ, তখনো সাধু হয়নি—গেছে, ওকেও মেরেছে। খট্ করে মেরেছে। আর ও তো কুস্তি-টুস্তি করত। পালোয়ান ছিল। খুব জোরে কষে এক চড়! (সকলের হাসি)

—পরে কী হল প্রতিক্রিয়াটা?

মহারাজ : পুলিশে ধরল। তারপর ৫ টাকা জরিমানা হল। (সকলের হাসি) তা ওরা যে মারে, যাকে মারে সে পয়সা দেয়। আর, রামময় মহারাজ পয়সা না দিয়ে একটা চড় দিয়েছে!

—আপনাদের ছেলেবেলায় কলকাতায় কোথাও রথের মেলা হতো?

মহারাজ : রথ হতো। আমরা নিজেরাই রথ চালাতাম।

—কোথায়, মহারাজ?

মহারাজ : বাগবাজারে ছোট মন্দির ছিল। ওখানে রথ তৈরি করতাম নিজেরা। চাকা তৈরি করা ছিল। আর বাকিটা নিজেরা তৈরি করতাম। তারপরে রথের দিন তাকে সাজিয়ে টাজিয়ে, ফুল-টুল দিয়ে, পুজো-টুজো করে—আমাদের বলরাম মন্দিরে শালগ্রাম শিলা ছিল—তাকে রথে চড়িয়ে নিয়ে যেতাম। উদ্বোধনে যেতাম, তখনো সাধু হইনি তো—উদ্বোধনে যেতাম। যোগীন মা, গোলাপ মা একটি করে টাকা দিতেন। নিয়ে প্রণাম করতাম।

—ভালই আমদানি হতো। এখানেও ছেলেরা আসে মহারাজ? এখানে নিয়ে আসে মহারাজ—আপনার কাছে?

মহারাজ : আমার কাছে আনে না। তোমাদের সাত দেউড়ি পার হয়ে আসতে পারে না! (সকলের হাসি)

—রাস্তায় বলে মহারাজ, পয়সা দাও। হাতে নকুল দানা যোগাচ্ছে।

মহারাজ : আমরা কিছু কিছু পেতাম ছেলেবেলায়। সেই পয়সা দিয়ে কিছু কিনে-টিনে খেতাম আর কী।

—এই একটু আনন্দ করা আর কী।

মহারাজ : হ্যাঁ, আনন্দ ছাড়া আর কী! দক্ষিণ দেশে রথ আছে?

—আছে। পোঙ্গাল উৎসবের সঙ্গে ওটা হয়।

মহারাজ : কপালীশ্বর মন্দিরে রথ হতো। তা, কপালীশ্বরে সব বিগ্রহ থাকত। রথের দিন রথে চড়ে ঘুরত। তা যখন গেছি, কিরণস্বামী তা আমাদের নিয়ে গিয়েছিল। ওদের বাড়ির সামনে দিয়ে রথ যেত। তা

দেখি, ওদের মা তাড়াতাড়ি জানালা দরজা সব বন্ধ করে দিয়েছে। পাছে শিবের দর্শন হয়!

—ও, আচ্ছা। ওরে বাবা! ওরকম আছে শৈব আর বৈষ্ণবে?

মহারাজ : আয়েঙ্গার তো—

—আয়েঙ্গার কি মহারাজ শৈব?

মহারাজ : না, না। গোঁড়া বৈষ্ণব। র— আছে এখানে, আয়েঙ্গার। (সকলের হাসি)

—মহারাজ, র— কি আয়েঙ্গার? আয়েঙ্গারের সেই ছাপ আছে?

মহারাজ : হ্যাঁ। এঙ্গোলে তেঙ্গোলে।

—তিলক কাটে তাতে।

মহারাজ : U আর V।

—কোন্‌টা কিরকম মহারাজ?

মহারাজ : এই তো মুশকিল। আমি তো এঙ্গোলেও না তেঙ্গোলেও না।

—মহারাজ, আপনি join করবার আগে কখনো রথ দেখতে গেছেন বলরাম মন্দিরে?

মহারাজ : বলরাম মন্দিরে রথ দেখতে যাইনি। বাইরে তো নামাত না। ঐ ওপরেই ঘুরত।

—আগে তো আপনারা নিজেরাই রথ করতেন। মানুষের বাড়িতে রথ দেখবেন কী!

মহারাজ : আমরা নিজেরাই রথ করতাম। আর ফুল তুলতে যেতাম রথের আগে। দমদমে বলরামবাবুদের বাগানবাড়ি ছিল। সেখান থেকে সব ফুল আনতাম।

—দমদম? বাঃ খুব কাছেই যেতেন! (হাসি)

মহারাজ : ওখানে সব বাগানবাড়ি ছিল। গিয়ে ফুল তুলতাম। এক বাগানের মালিরা ধরল আমাকে। বলে, বসে থাক। আমি বসে রইলাম। তারপরে দেখে যে, বসেই আছি। তখন তারা আর কী করবে? তখন নিজেরাই ফুল তুলে দিলে। (সকলের হাসি)

—কোন্ রাস্তা দিয়ে যেতেন মহারাজ?

মহারাজ : যেতাম, বড় রাস্তা দিয়েই যেতাম।

—যশোর রোডেই ছিল।

মহারাজ : যশোর রোড, একটা ছিল পুরনো রাস্তা। কিন্তু নাম মনে নেই। তা, যেতাম শ্যামবাজার, পাতিপুকুর, তারপর দমদম হয়ে। তারপর পথটা বাঁহাতে বেঁকে চলে গেল।

—মহারাজ, বাগানবাড়ি যদি বারাসাতে থাকত, আপনারা হয়তো বারাসাতেই চলে যেতেন।

মহারাজ : তা, যেতে পারতাম।

—শরৎ মহারাজ পয়সা-টয়সা দিতেন?

মহারাজ : শরৎ মহারাজ দিয়েছেন কিনা আমার মনে নেই। তবে উনি দেখতেন সব। আমরা শুধু রথ নয়, দুর্গাপূজা, কালীপূজা—এইসব প্রতিমা নিয়ে উদ্বোধনের সামনে দিয়ে যেতাম। তা উনিও দেখতেন। একবার আমাদের যেতে দেরি হয়েছে। উনি তখন ওপরে উঠে গেছেন। তারপর বললেন—আমি বাতের রোগী, আর নামতে পারছি না। এখান থেকেই দর্শন করছি। আমি বললাম, তাই করুন। ভাবি, দিনগুলো মন্দ কাটেনি!

—আমাদের শুনতেই এখন ভাল লাগছে। আজকে তো একটা বিশেষ দিন। এখান থেকে একটা কিছু—আপনার হাত থেকে কিছু একটা পেলে ভাল হতো।

মহারাজ : ফিরে এসো। ঐ শিবমন্দিরে এসো।

—আমরা শিবমন্দিরে আছি, মহারাজ।

মহারাজ : এখানে শিব তো একবারে ন্যাংটা শিব!

—অনেক দিন পাওয়া যায়নি মহারাজ।

মহারাজ : কামারপুকুরে গেছি। তখন মন্দির হয়নি। তা ঠাকুরের ঘরেই শুতাম গিয়ে। বৈঠকখানায়। তা, শিবুদা বলছেন—ভাই, জান তো এখানে

শিবের সংসার। অর্থাৎ খেতে দিতে পারবে না। (সকলের হাসি) তারপর আমরা বললাম—শিবুদা, কোন চিন্তা নেই। আমরা মিঠাই আর মুড়ি কিনে নিয়ে আসব। তখন—হ্যাঁ ভাই, হ্যাঁ। (সকলের হাসি)

—মহারাজ, Ice cream—তাহলে কি আমরা দাঁড়াব?

মহারাজ : তোমাদের কষ্ট হবে। তার চেয়ে— (সকলের হাসি)

—না, ঠিক আছে মহারাজ, আমরা আরো কিছুক্ষণ দাঁড়ব। যদি কিছু বেরয়।

মহারাজ : বাবা! অপরের কথা আলাদা। তোমার (পা— মঃ) এই body নিয়ে দাঁড়ালে—

—আপনি বললে আমি সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারব।

মহারাজ : না না। তুমি দাঁড়িয়ে থাকলেও আমি তো সহ্য করতে পারব না। (সকলের হাসি)

—তাহলে আমরা বসেই পড়ি।

মহারাজ : ভবি ভোলবার নয়।

—আজকে মহারাজ রথযাত্রা। আজকে বিশেষ দিন একটা। অন্য দিনে তো আমরা বলি না।

মহারাজ : আরে, এখানে ভেঁপু নেই তো।

—ভেঁপু বাজবে। বিকেলবেলা কিনে বাজিয়ে দেওয়া যাবে।

মহারাজ : কোথায় পাওয়া যায়?

—এখানে পাওয়া যাবে। Main gate-এর সামনেই পাওয়া যাবে। তাল-পাতার।

মহারাজ : তালপাতার নয় তো কি শাল পাতার হবে? ছেলেবেলায় খুব ভেঁপু কিনে বাজিয়েছি।

—কী করেননি আপনি? তাহলে মহারাজ, লজেন্সটা?

মহারাজ : তখনকার দিনে লজেন্স ছিল না যে। (হাসি)

—আমরা তো এখনকার দিনের কথা বলছি।

মহারাজ : এখনকার দিনের কথা—আমি তো তখনকার দিনের কথা বলছি। (সকলের হাসি)

—একটা লজেন্স খেতে কত কথা বলতে হচ্ছে! তা মহারাজ, আসছি আমরা।

মহারাজ : কথাটা মনে পড়ে গেল। রথের দিনে সব তেলেভাজা-টাজা খায়। তা রথের দিন সেটা নয়। একদিন আমাদের ম্যানেজার প্রিয়দা বললেন, তোমাদের সব বেগুনি ভেজে খাওয়াব। তখন নতুন জায়গা কেনা হয়েছে। ঐ বাগান যে, ঐ জায়গায়। এখন যেখানে বাড়ি হয়েছে—অফিস বাড়ি। তখন ঐ নতুন জায়গাটা কেনা হয়েছে। তা একটা চুলোর মতো করা হল, বাগানের বেগুন, আর বাকিটা ভাণ্ডার থেকে দিয়ে গরম গরম বেগুনি আর মুড়ি। যে যত পারে।

—মহারাজ, তা আপনি কটা খেয়েছিলেন যেন—

মহারাজ : ৮০টা। (সকলের হাসি)

—মহারাজ, এখনকার কেউ পারবে না। ৮০টা খেয়েছিলেন, মহারাজ? এইরকম আঙুলের মতো বেগুনি মনে হয়।

মহারাজ : আঙুলের মতো বেগুনি হয়? আঙুলের মতো লঙ্কা হয়।

—তাহলে মহারাজ, আজকে রথে কিছু খাওয়ানো দরকার।

মহারাজ : সেইদিনে ফিরে চল, খাওয়াব।

—আপনি ফিরিয়ে নিয়ে চলুন। আমরা যাব।

মহারাজ : না, তোমাদের রেখে আমি যাচ্ছি তো। (মহারাজের হাসি)

—মহারাজ, বেগুনির সাইজ কিরকম ছিল?

মহারাজ : মাঝামাঝি। খুব বড় বড় বেগুনি নয়।

—এইরকম সাইজ হবে আর কী! (শ্রী—মহারাজ হাত দিয়ে গোলাকৃতি দেখালেন)

মহারাজ : না, ওকে কি বেগুনি বলে নাকি? (সকলের হাসি)

—উনি ওটাকে আলুর চপ দেখিয়ে দিয়েছেন।

মহারাজ : আলুর চপ? না, চপ-ছপের নাম করতে নেই। (সকলের উচ্চ হাসি)

—আসছি, মহারাজ।

মহারাজ : এসো। আর আশা যখন নেই। (সকলের উচ্চ হাসি)

—আমরা টের পেয়ে গেছি, আপনার ইচ্ছে আছে। আর কোন কথা নেই, নিয়ে আসুন।

মহারাজ : আশা যখন নেই, তখন আসিই ভাল।

সেবক মঃ—বাঃ বাঃ করব মহারাজ? বাঃ বাঃ করব?

মহারাজ : না না। (সকলের হাসি) এই, অত আছে নাকি? (সকলের হাসি)

সেবক মঃ—আপনি বলছেন যখন, দেখতে পারি।

মহারাজ : তোমরা বড় দুষ্টু।

সেবক মঃ : না। যদি না থাকে তাহলে আর দেব না। থাকলে দেব।

মহারাজ : আর দিয়ে ফুরিয়ে যাবে যখন?

—তখন আবার এসে যাবে।

মহারাজ : তাহলে হয়তো কিছু বেগুনি—

—মহারাজ, আপনার বেগুনির কথা শুনে এরা যেতে চাইছে না।

মহারাজ : বেগুনি পাবে না। তবে লজেন্স পাবে।

—তাই হোক, মহারাজ।

মহারাজ : আমি তো বলে দিলাম পাবে। থাকে তো পাবে।

—কী যে বলেন মহারাজ? আপনার ভাঁড়ারের খবর আপনি রাখেন না! আমরা ওখানের খবর মাঝে মাঝে পাই।

মহারাজ : ভাঁড়ারের খবর আমার কাছে নেই কিচ্ছু।

—মহারাজ, লজেন্স না থাকলে আরো বিপদ। তাহলে বেগুনি ভাজার ব্যবস্থা করতে হবে। মহারাজ, দেখুন এক গামলা লজেন্স নিয়ে এসেছে।

মহারাজ : দাও আর কী করবে। দুটো করেই দাও। (সকলের হাসি)

—আজকে স্নান করে মন্দিরে যাবেন?

মহারাজ : যাব তো।

॥ ৯৩ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, শেষ পর্যন্ত Ice cream এল, একেবারে brick!

মহারাজ : আচ্ছা, এইরকম একটা brick দিয়ে যদি বাড়ি তৈরি হয়?

—একটা brick দিয়ে তো আর হবে না। সে-গল্পটা কী হল মহারাজ?

মহারাজ : গল্পটা হল—এক বুড়ো, সে খুব খেতে পারত। তার নাতি না কার জন্য প্রচুর কেক নিয়ে যাচ্ছে। Train-এ চেকার ধরেছে তাকে। হতচ্ছাড়া, তুমি এত নিয়ে যাচ্ছ, luggage করনি তো? তা বলে, দাঁড়াও। বলে খেতে আরম্ভ করল। তা, খেয়ে শেষ করল। বলল, এখন? এখন তাকে তো আর luggage করতে হবে না।

মহারাজ : একবার স্বামী নিখিলানন্দ প্রসন্ন হয়ে মাংস খাওয়াতে চাইলেন। তা আটটা পাঁঠা রান্না হয়েছে। নিখিলানন্দ স্বামী জিজ্ঞেস করলেন—কেমন হল? স্বামী গিরিজানন্দ বলছে—এই গিরিজা নয়, আগের গিরিজা বলছে—প্রভু, হয়েছে ভালই, তবে...—তবে কী? তবে—আর একটু হলে ভাল হতো।

—আর, কোন্ মহারাজ বলেছিলেন, বাঘ কি লোম বেছে খায়?

মহারাজ : ঐ ঐ গিরিজা মহারাজই বলেছিলেন।

—মহারাজ, ঘটনাটা কী?

মহারাজ : আমি বলছি, দাঁড়াও। আরে ওটা হচ্ছে, ঐ যে, তখন তো এখানে পাঁঠা নিয়ে এসে ছাড়িয়ে মাংস রান্না করা হতো। তারপরে খাবার সময় তাতে লোম ঠেকছে। কেউ খেতে চায় না। তা গিরিজা মহারাজ বলছেন— বালতিটা নিয়ে এসো এখানে। বাঘ কি লোম বেছে খায়? তারপর শুদ্ধানন্দ স্বামী বলছেন, আমি তো বোকা বনে গেলাম। (সকলের হাসি)

—আমরা যা শুনি, আগের সাধুরা যা খেতেন, সেরকম খাইয়ে এখন আর নেই।

মহারাজ : তা আর কী হবে বল?

—অনঙ্গ মহারাজ নাকি খুব খেতে পারতেন?

মহারাজ : তা পারতেন। অনঙ্গ মহারাজ রসগোল্লা এইরকম পরিমাণ খেতে পারতেন (হাত দিয়ে দেখালেন—হাসি)। একজন দই পরিবেশন করছে। বলেন, কী দই নিয়ে আসে? নে, হাঁড়িটা বসিয়ে দে। (সকলের হাসি) দু-হাঁড়ি দই খেয়ে ফেললেন।

—স— মহারাজ কালকে দুখানা আইসক্রিমের brick খেয়েছে। মহারাজ আসুন এদিকে। (সকলের হাসি) আসছে—আসছে।

মহারাজ : আরেকটু বড় হলে বাড়িটাই খেয়ে ফেলত।

—এই যে স— মহারাজ। (সকলের হাসি)

মহারাজ : এক ব্রহ্মচারী ছিল কবিরাজ নামে। তা সে পায়েস খেতে খুব ভালবাসত। তার যে-থালা—উঁচু থালা ছিল। সেটা নিয়ে আসত। তা, ভরে দিতে হবে। এক থালাতে কুলোবে না। দু-তিন থালা খেয়ে ফেলত।

—মহারাজ, আপনি বোধ হয় ওকে চেনেন। অ— রাঁচিতে আছে। অ—, তার ভাই আছে প্র—। তা, অ— খুব খেতে পারে মহারাজ। একবার রসমালাই দিয়েছিল। অনেকগুলো খেয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কতগুলো খেলে? বলছে—কখন গুনব? থালাতে ঢেলে দিয়েছে। আমি খেয়ে নিয়েছি। আরেকদিন এক-থালা বোঁদে খেয়েছে গরম গরম। এক-থালা মহারাজ! গরম বোঁদে। মঠে গরম বোঁদে হয় উৎসব উপলক্ষে। তা, বোঁদে হলে সাধুদের দেওয়া হয়। তা আমি দেখছি, ও পঙ্গাতে আসেনি। জানি, ও খেতে ভালবাসে, তা সে আসেনি! আমি ওর ঘরে গেলাম। গিয়ে দেখি, একটা থালায় বোঁদে নিয়েছে। আর এক ডাব্বাতে মুড়ি। (হাসি) আমাকে দেখে বলল, আপনি চলে যান, আপনি চলে যান।

মহারাজ : ঐ কবিরাজকে সবাই বলত, তার টিকি থেকে বুড়ো আঙুল পর্যন্ত সব ফাঁকা। (সকলের হাসি)

—এর নামও কবিরাজ। ও একটু মহাপ্রসাদ খেতে ভালবাসে।

মহারাজ : মহাপ্রসাদ? সেই কবিরাজকে একদিন জিজ্ঞেস করি—আচ্ছা, যদি এক-থালা রসগোল্লা থাকে আর এক-থালা সন্দেশ থাকে, তুমি কোন্‌টা খাবে? তা বলে, দুটোই খাব। (সকলের হাসি) তাকে যত বলছে যে, দুটো পাবে না, একটা—কোন্‌টা পছন্দ কর? তা বলে, দুটোই খাব। (হাসি)

—মহারাজ, আমরা সবাই বলাবলি করছিলাম—এরকম গতবছর হয়েছিল। এবছর হল, আসছে বছর আবার হবে। বছর বছর হবে।

মহারাজ : যার নাম করে খাচ্ছ সে আগামী বছর থাকে কিনা দেখ!

—ওকথা বললে হবে না, মহারাজ। Ice cream খাওয়ানোর জন্য অন্তত আপনাকে থাকতে হবে।

মহারাজ : না, যাহোক না থাকলে ভাণ্ডারা তো একটা হবে।

—আমাদের ইচ্ছা হচ্ছিল কালকে আপনি যদি একটু ওখানে থাকতেন, একটু দেখে আসতেন, খুব ভাল হত। সবাই বলছিল মহারাজ, যখন কাঁকুড়গাছি আমরা গেছি, মহারাজ ঘুরে ঘুরে দেখতেন। বলতেন—একে দাও, ওকে দাও। কাঁকুড়গাছিতে ডাব খাওয়া নিয়ে আপনি একদিন কী একটা ঘটনা বলেছিলেন?

মহারাজ : কী বলেছি, মনে নেই।

—সেই ডাবের খোলা ছুঁড়ে ছুঁড়ে ভিতরে ফেলে দিয়েছিল।

মহারাজ : ও। ডাবগুলো কেটে তো খেয়েছে। তারপর খোলা সব গুলো গেটের বাইরে জমা করে রেখেছে। জমাদারের সঙ্গে পরামর্শ করা থাকত, ওগুলি দিয়ে সোফা তৈরি করবে। নিয়ে যাবে পরে, গেটের কাছে জমা করে রাখত। সব পাড়ার ছেলেগুলো আসছে, আর একটা একটা করে ভেতরে ছুঁড়ে দিচ্ছে। (মহারাজের হাসি)

—মহারাজ, কে একজন ছিল অনেক খেতে পারত?

মহারাজ : আধমুণে কৈলাশ। আধমুণে মানে আধ মণ খেত।

—নিশ্চয় বামুন ছিল মহারাজ। একমণ খেতে পারত, বাপরে!

মহারাজ : একজনের কথা আমি শুনেছি, তা দেখিনি। যে দেখেছে সে বলেছে। একজন সাধু—নাম ভূতানন্দ। সে গঙ্গার ধারে খেতে বসত। লোক জমা হয়ে যেত তার খাওয়া দেখবার জন্য। ডাব একটার পর একটা ধরছে, মুখে দিচ্ছে ফেলে দিচ্ছে। শেষে পঞ্চাশটা ডাব খেয়ে ফেলল। তারপর খৈ আর ক্ষীর মিশিয়ে খাবে। তা, কয়েক হাঁড়ি খেয়ে উঠে গেল।

—কোথা থেকে পেতো ওরকম? এত ক্ষীর?

মহারাজ : আরে! খাওয়ানোর জন্য ওরকম লোকও জোটে। তারপর যার কাছে শুনেছি, তিনি ব্রাহ্ম ধরনের ছিলেন। তা বলছেন, খালি খাচ্ছে—এতে তো ওর কোন প্রয়োজন নেই, তবু খাচ্ছে। যোগৈশ্বর্য আছে। এটা গরিবরা পেলে অনেকে খেয়ে বাঁচত—মনে মনে ভাবছেন। তা সাধু ওঁকে ডেকে বলছে—ও চিন্তা যো মনসে আতা হ্যায়, ও কুত্তাকো কুত্তাকো মাফিক দেতা হ্যায়, হাতিকো হাতিকো মাফিক দেতা। (সকলের হাসি)

প্রশ্ন : তোতাপুরী রেগে গিয়ে চিমটে দিয়ে একজনকে মারতে যাচ্ছেন—এরকম কেন হয়, মহারাজ?

মহারাজ : একে বলে আভাস। ব্যবহারটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। অনেকের মতে, অবিদ্যার লেশ থাকে—তা থেকেই ঐরকম ব্যবহার হয়।

—মহারাজ, আপনি বলেন যে, দেহধারী হলেই মায়ার অধীনে থাকতে হবে। ফলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেও যিনি দেহধারী হন, দেখা যায়, তাঁর এরকম ব্যবহার।

মহারাজ : হ্যাঁ, মায়ার হাত থেকে যেন কারোরই নিস্তার নেই।

—এটা প্রত্যক্ষ দেখা যাচ্ছে। এতে যুক্তি আর কী তুলব?

মহারাজ : তাই? বাঁচা গেছে! (সকলের হাসি)

—প্রত্যক্ষই যখন প্রবল। অবতারেরাও তো দেহধারী, তাহলে তাঁরাও মায়ার অধীন থাকেন?

মহারাজ : না, অবতারেরা মায়াধীশ।

—মায়াধীশ? মায়ার অধীনে নন তাঁরা?

মহারাজ : না, অধীন নয়, অধীশ।

—অধীশ?

মহারাজ : অধীশ। মায়া না থাকলে মায়াধীশ কী করে হবেন?

—তাহলে এরকম কেন? ক্ষুধা, তৃষ্ণা এগুলো দেখা যাচ্ছে। রোগ—রোগে ভুগছেন।

মহারাজ : এরই নাম ব্যবহার।

—ব্যবহার? তার মানে তো দেখা যাচ্ছে, তাঁরাও মায়ার অধীনে ব্যবহার করছেন।

মহারাজ : এটা তুমি দেখছ। "নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।" (গীতা, ৫।৮) তিনি নিজে কিছু করছেন না।

—নিজে কিছু করছেন না?

মহারাজ : না। তোমরা আরোপ করছ। আমি জ্ঞানলাভ করেছি—তিনি সেকথা বলছেন না। তোমরা বলছ। অমুক অজ্ঞান ছিল, জ্ঞানলাভ করেছে।

—কিন্তু, ঠাকুর নিজেই তো বলছেন যে, আগে এই রকম মায়ের জন্য ব্যাকুল হয়েছেন : "মা দেখা দে, দেখা দে"; তারপরে মায়ের দর্শন হল। নিজেই বলছেন।

মহারাজ : এ তো সবটাই ব্যবহার।

—আমরা বলছি না, তিনিই তো বলছেন।

মহারাজ : তাঁর সবটাই ব্যবহার।

—এটাও কি আমাদের দেখার ভুল?

মহারাজ : হ্যাঁ।

—সেকি! ঠাকুর নিজে বলছেন, কাঁদছেন কষ্টতে!

মহারাজ : ঠাকুর আর যা বললেন, সেটা মনে নেই যে—এর ভেতরে দুটি আছে—একটি ভক্ত, আর একটি ভগবান। কখনো তিনি ভক্তরূপে বলেছেন, কখনো ভগবানরূপে।

—দুটির মধ্যে কোন্‌টি তিনি?

মহারাজ : দুটিই তিনি।

—দুটিই তিনি? তাহলে দুরকম ব্যবহার হচ্ছে তো!

মহারাজ : আবার ব্যবহার দু-রকম! সব ব্যবহারই একরকম। আরোপ।

—তিনিই বলছেন, আমার এইরকম হচ্ছে, আমরা আরোপ করলাম কোথায়?

মহারাজ : বলছি তো, সব ব্যবহারই আরোপ। অব্যবহার্য বলে ব্রহ্মকে বলেছে। কাজেই ব্যবহারের অতীত হল ব্রহ্ম। আর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা মানে—অজ্ঞানে ছিল আর তার থেকে কোন ঘর ডিঙিয়ে বেরিয়ে পড়ল, তা নয়। অজ্ঞান ছিলই না তার। সে নিত্য জ্ঞানস্বরূপেই স্থিত।

—এ তো বড় কঠিন ব্যাপার। সহজ করে বুঝিয়ে দিন। এগুলি বেশ কঠিন হয়ে যাচ্ছে। মহারাজ, সময় ফুরিয়ে গেছে।

মহারাজ : থাক, আর কী। কাগজটা রেখো। (সকলের হাসি)

—এদিকেও আছে, আবার ওদিকেও আছে। বড় কাগজ আছে।

মহারাজ : বাঁচা গেল। কিছু খোরাক পাওয়া গেল।

প্রশ্ন : ঠাকুর গোপালদাকে বলছেন—দেখ গোপাল, লাটু বলছে, এখানকার কথা বুঝিয়ে দিন। এখানকার কথা কি বোঝানো যায়? গোপালদা বলছেন—আপনি যদি না বুঝিয়ে দেন, তাহলে আর কে বোঝাবে? আমরা এসেছি কেন?

মহারাজ : "ঘুচে যাবে তুমি আমি চিরতরে,
ভাবময় দেহতরী ভাব সাগরে।
পাদপদ্ম রাখি হৃদয় পরে।
নিতান্ত শিশু আমি অবোধ অতি।
তোমার চরণ বিনে নাহি যে গতি।"

তারপরে শেষকালে আছে—'ঘুচে যাবে তুমি-আমি চিরতরে'।

—তুমি-আমি ঘুচে যাবে?

মহারাজ : চিরতরে। কী জানি, কবে হবে জানি না।

॥ ৯৪ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, ঠাকুরের তিথিপূজার সময় যে জীবিত মাছ গঙ্গায় ছাড়া হয়, এর তাৎপর্য কী?

মহারাজ : তাৎপর্য হল মুক্তি। মাছকে বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেওয়া।

—দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের অবস্থানকালেও কি এটি চালু ছিল?

মহারাজ : কে চালু করবে? (মহারাজ একটু হাসলেন)

প্রশ্ন : মহারাজ, ঠাকুর একজায়গায় বলছেন, পরদা গুটানো, বাক্সে চাবি দেওয়া, সেলাই করা—এগুলি পছন্দ করি না। ওগুলির তাৎপর্য কী?

মহারাজ : এগুলি বন্ধনের কারণ।

—পরদা গুটানো মানে—পরদা টাঙানো আমরা যাকে বলি?

মহারাজ : গুটানো মানে roll করা, তোলা।

—পরদা তোলা?

মহারাজ : হ্যাঁ।

—আচ্ছা। পরদা টাঙানো মানে যেন কোন কিছু গোপন করা।

মহারাজ : সেই, গোপন করা—তার বিপরীত।

—পরদা গুটানো।

মহারাজ : একই কথা। আর তার কারণ হচ্ছে, আমরা কিছু গোপন করতে চাচ্ছি। ঠাকুর কিছু গোপন করতে চাচ্ছেন না।

—সেলাই করাটা?

মহারাজ : সেলাই করাটা—যে ফাঁক হয়ে যাচ্ছে, তাকে জুড়ছি। সংসার-বন্ধনের একটা প্রতীক।

প্রশ্ন : মহারাজ, আরেকটি প্রশ্ন। জ্ঞানী 'নেতি নেতি' বিচার করে। এই বিচার করতে করতে যেখানে আনন্দ পায় সেই ব্রহ্ম—তাই তো?

মহারাজ : আনন্দ—ব্রহ্ম তো সচ্চিদানন্দ? তা বিচার করতে করতে ঐ অন্য উপাধিকে বাদ দিয়ে দিয়ে যা রইল—যা অবশিষ্ট, তা-ই আনন্দ।

—অবশিষ্ট রইল। অর্থাৎ নেতি করার আর কিছু নেই—এটা কী করে বোঝা যাবে?

মহারাজ : বিষয়ের বোধ না থাকলে বিষয় ত্যাগ করবে কী করে?

—যতক্ষণ আছে ততক্ষণ—

মহারাজ : ততক্ষণ তাকে বিচার করতে হয়। নেতি, নেতি—এ নয়, এ নয়।

—কিন্তু যেখানে আনন্দটা পাচ্ছি সেখানে তো আমরা বিষয়ানন্দ যেটা সেটাকে পেয়ে থাকি।

মহারাজ : না, বিষয়ানন্দ নয়।

—সাধনার আনন্দ, ভজনানন্দ যেটা বলছি, সেটাও তো হতে পারে।

মহারাজ : না। বিষয়ের আনন্দ নয়। বিষয় দূর হলে যে-আনন্দ—নির্বিষয় হলে যে-আনন্দ।

—মহারাজ, যেটা বোধ হচ্ছে, সেটাই তো বিষয়? যেটা আমরা বোধ করছি?

মহারাজ : হুঁ।

—তাহলে আনন্দটা যে বোধ করছি—

মহারাজ : আনন্দ বোধ করছি না। আনন্দ—সচ্চিদানন্দকে কেউ বোধ করবার থাকে না। অবশিষ্ট হল ঐ। আমি বিচার করছি। বিচার করতে করতে আমার বিচার্য বিষয় শেষ হয়ে গেল, তখন রইল সচ্চিদানন্দ।

—বিষয়ের কথা বলছি না। বোধের কথা বলছি।

মহারাজ : বোধের কথা? বোদ্ধা রইল না। বোদ্ধা—বোধকর্তা রইল না।

—আনন্দ পাওয়াটা তাহলে কিভাবে বুঝব?

মহারাজ : আনন্দ পাওয়া নয়। আনন্দে থাকা। আনন্দ পাওয়া নয়। কে পাবে?

প্রশ্ন : মহারাজ, ঠাকুর বলছেন, জ্ঞানীর স্বভাব কিরকম? জ্ঞানী আইন অনুসারে চলে।

মহারাজ : আইন অনুসারে মানে, বিচার দ্বারা যা সিদ্ধ হয়, তাই গ্রহণ করে।

—তাতে বিদ্যা, অবিদ্যা দুই-ই আছে। অবিদ্যা সংসারে ভুলিয়ে দেয়। আর বিদ্যামায়া জ্ঞান-ভক্তি, সাধুসঙ্গ, ঈশ্বরের দিকে লয়ে যায়। বিদ্যা—তা তাকে মায়া বলা হচ্ছে কেন?

মহারাজ : দেখো, চণ্ডীতে আছে—

"সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী॥" (১।৫৭-৫৮)

তিনি বন্ধনের কারণ, মুক্তিরও কারণ। মায়া এইজন্য বলে যে, বন্ধন-মুক্তি—এগুলি সব ব্রহ্মের ওপর আধারিত। মায়া এই বন্ধনমুক্তির স্বরূপ যে-ব্রহ্ম—তার ওপর আধারিত। এইজন্য তাকে মায়া বলছে।

—মুক্তি তো স্বরূপ। মুক্তি আবার আরোপিত কেন?

মহারাজ : মুক্তি আরোপিত এইজন্য যে, স্বরূপ যে—তার উৎপত্তি নেই। মুক্তির উৎপত্তি হওয়া মানে মুক্তি স্বরূপ নয়। মুক্তস্বরূপ আমরা, মুক্তি আমাদের স্বরূপ নয়।

—না, যেটা মুক্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছে—বিদ্যা মায়া, সেটাকে আবার মায়া বলা হবে কেন? সেটা তো মুক্তির কারণ হল।

মহারাজ : যতক্ষণ নিয়ে যাচ্ছে—ততক্ষণ অবিদ্যার মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তো? কাজেই পথটাও মায়া।

—পথটাও মায়া। যেটা বললেন—জ্ঞান, ভক্তি, সাধুসঙ্গ বিদ্যামায়া ঈশ্বরের দিকে লয়ে যায়। এই পথটা—ওগুলিও মায়ার অন্তর্ভুক্ত, সেইজন্য?

মহারাজ : হ্যাঁ। ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এইজন্য তাকে মায়ার ভিতর বলা হচ্ছে।

প্রশ্ন : ঠাকুর অন্যত্র বলছেন—"ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। শক্তি না মানলে জগৎ মিথ্যা হয়ে যায়। আমি-তুমি, ঘর-বাড়ি, পরিবার সব মিথ্যা। ঐ আদ্যাশক্তি আছেন বলে জগৎ দাঁড়িয়ে আছে। কাঠামোয় খুঁটি না থাকলে কাঠামোই হয় না, সুন্দর দুর্গাপ্রতিমাও হয় না।" এখন প্রশ্ন মহারাজ, এই যে আদ্যাশক্তি আছেন বলে জগৎ দাঁড়িয়ে আছে—এটা কী?

মহারাজ : তা তো বটেই। শক্তির প্রভাবেই জগৎ-বোধ হচ্ছে। ব্রহ্মতে জগৎ আরোপিত। সেই আরোপিত বিষয়টি হল অবিদ্যা।

—কিন্তু ঐ আদ্যাশক্তি তো মিথ্যা?

মহারাজ : আদ্যাশক্তি মিথ্যা নয়। আদ্যাশক্তির ওপরে আরোপিত যাকিছু, সব মিথ্যা।

—শক্তি আর আমরা যেটাকে প্রকৃতি বলি বা মায়া বলি, সব তো এক।

মহারাজ : এক নয়। এক নয়।

—মায়া আর আদ্যাশক্তির পার্থক্যটা আরেকটু বলুন।

মহারাজ : মায়া আর আদ্যাশক্তি এক হিসাবে সমার্থক। সম অর্থ।

—সম অর্থ হলে মায়া তো মিথ্যা, মায়া তো আরোপিত। তাহলে শক্তিও তো আরোপিতই হয়ে গেল। শক্তিও মিথ্যা হয়ে গেল।

মহারাজ : মায়া তো উৎপন্ন হয় না। মায়া অনাদি। এইজন্য আদ্যাশক্তি। অনাদি বলে আদ্যাশক্তি।

—তা ঠিক, তবে তা সত্য নয় তো?

মহারাজ : আবার সত্য নয় মানে—ব্রহ্মস্বরূপের অনুভূতি হলে মায়া থাকে না। সত্য নয় মানে, জগৎ সত্য যে বোধ হচ্ছে তাতে মায়া অসত্য নয়।

—বাধিত হচ্ছে, থাকছে না যেটা সেটা তো আর ব্রহ্মের মতো সত্য নয়। ব্রহ্ম আর শক্তি এক হল কী করে?

মহারাজ : এক হয় এইজন্য যে, অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি। আগুনকে ভাবলে তার দাহিকা শক্তিকে ভাবতে হয়। দাহিকা শক্তিকে ভাবলে আগুনকে ভাবতে হয়।

—সে তো মহারাজ, একটা জিনিসেরই দুটো দিক। সেটি আমরা উদাহরণে বুঝতে পারি—অগ্নি আর দাহিকা শক্তি। কিন্তু ব্রহ্ম আর শক্তির ক্ষেত্রে?

মহারাজ : একই কথা। অগ্নি ছাড়া দাহিকা শক্তি থাকে না, দাহিকা শক্তি ছাড়া অগ্নি থাকে না। শক্তি ছাড়া ব্রহ্ম নেই। ব্রহ্মকে যখন আমরা অনুভব করব বলছি, তখন শক্তির ভেতর দিয়েই যাচ্ছি।

—কিন্তু নির্বিশেষ যে-ব্রহ্ম, সেখানে তো শক্তি নেই।

মহারাজ : শক্তি নেই মানে, শক্তি ব্রহ্মতে লীন হয়ে আছে।

—শক্তি ব্রহ্মতে লীন হয়ে গেল! ও আচ্ছা।

মহারাজ : কারণেতে কার্য লীন হয়ে যায়।

—তাহলে মহারাজ, প্রশ্ন যেটা ছিল যে, আদ্যাশক্তি আছেন বলে জগৎ দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু যেটাকে আমরা আদ্যাশক্তি বলছি, জগৎ-রূপ ভ্রম যখন চলে যায়, তখন তো আদ্যাশক্তির—

মহারাজ : আর প্রয়োজন হয় না। জগৎই নেই, তা জগৎ দাঁড়াবে কি?

—তাই। তাহলে সেটা তখন মিথ্যা।

মহারাজ : মিথ্যা নয়। সে ব্রহ্মতে একীভূত হয়ে যায়। ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যায়। মিথ্যা মানে তাকে পৃথক সত্তা করে মিথ্যা বলা হচ্ছে, তা নয়।

—আচ্ছা। কিন্তু মায়ার ক্ষেত্রে তা নয়। মায়া যে ব্রহ্মে আশ্রিত এতক্ষণ মনে হচ্ছিল, সেটা দূরীভূতই হল।

মহারাজ : দূরীভূত নয়, সেটা ব্রহ্মতে লীন হয়ে গেল।

—না, মায়ার ক্ষেত্রে যখন আমরা বলি—

মহারাজ : যখন সাপ আর দড়ি বলছি, সাপটা কি দূরীভূত হয়? আসলে সেটা আমাদের বোধ থেকে চলে যায়। তাতে কী হল? দূরীভূত তো হয়নি। দড়িই ছিল, তাকে সাপ বলে বোধ হচ্ছিল। সাপটা গেল কোথায়? দড়িতেই চলে গেল।

প্রশ্ন : মহারাজ, ঠাকুর বলেছেন—মদের নেশা কমানোর জন্যে চালুনির জল দিতে হয়। চালুনির জলটা কী?

মহারাজ : চাল ধোওয়া জল।

—আর একটা আছে, মহারাজ। ঠাকুর বলছেন, একজন হরিতাল ভস্ম খেয়েছিল। হরিতাল ভস্মটা কী?

মহারাজ : হরিতাল বোধ হয় গন্ধকের preparation।

—ওষুধ?

মহারাজ : হুঁ।

—একটা আছে, মহারাজ। পিছনে লিখেছে, হত্তেল, হত্তেল। হরিতাল বা হত্তেল।

মহারাজ : হোত্তেল, হোত্তেল। হোত্তেল—(সকলের হাসি)

—আমাদের উচ্চারণটা ঠিক হচ্ছিল না বলে ধরতে পারছিলাম না।

মহারাজ : হোত্তেল। লৌকিক নাম অনুসারে হয়েছে।

—হোত্তেল একটা ওষুধ। আয়ুর্বেদিক ওষুধ হবে। যাহোক্, আর একটা জায়গায় আছে, মহারাজ—হরিশ লাটু ওরা ধ্যান করে। ওগুনো কি? তখন হাজরা বলছে, হ্যাঁ। ওরা আপনার সেবা করে সে এক। আবার ঠাকুর তারপরে বলছেন, একটা কথা—হবে। ওরা উঠে গিয়ে আবার কেউ আসবে। ঠিক দেখছি—কথাগুলোতে কেমন যেন পরম্পরা পাচ্ছি না।

মহারাজ : ওরা উঠে গিয়ে মানে, ওরা চলে যাবে। আবার কেউ আসবে।

—হরিশ, লাটু—এদের প্রসঙ্গো বলছেন, ওরা উঠে গিয়ে আবার কেউ আসবে।

মহারাজ : উঠে গিয়ে, মানে ঊর্ধ্বগতি হবে। উঠে গিয়ে মানে ঘুঁটির থেকে উঠে গিয়ে।

প্রশ্ন : "হাতি চড়া জোড়া পরা ভুলেছ কি ধেনুচরা? ব্রজের মাখন চুরি করা, মনে কিছু হয়?" 'হাতি চড়া জোড়া পরা'—হাতি চড়া তো—হাতিতে চড়েছিলেন গোকুলে। তা একথাটা বুঝতে পারি। কিন্তু 'জোড়া পরাটা' কী?

মহারাজ : জোড়া মানে পোশাক। হাতি চড়া মানে ঐশ্বর্যের জন্য। জোড়া পরাও ঐশ্বর্যের জন্য।

—ও। এগুলো ভগবান করেছিলেন মথুরায়। সেগুলো বলছেন আর কী। 'হাতি চড়া জোড়া পরা ভুলেছ কি ধেনুচরা'—এটা বলছেন।

মহারাজ : 'ধেনুচরা' মানে গরু চরানো। অর্থাৎ, এখন ঐশ্বর্য হয়েছে—এখন কি তোমার ঐ গরু চরানো ভুলে গেছ?

—ব্রজধাম বলতে কি মথুরা-বৃন্দাবন দুটোকেই বলা হয়?

মহারাজ : না, না। মথুরা ব্রজধাম নয়। ব্রজ হচ্ছে গোকুলের কাছে।

—ও, মথুরাও নয়, বৃন্দাবনও নয়? গোকুল বলতে কি বৃন্দাবনকে বোঝায় মহারাজ?

মহারাজ : বৃন্দাবন হচ্ছে বন, যেখানে ভগবান লীলা করতেন। গোকুল হচ্ছে নন্দের রাজধানী। ব্রজ হল শহরের বাইরে যেখানে গরু থাকত সব।

—ও ব্রজ, মথুরা, বৃন্দাবন—সব আলাদা আলাদা! মহারাজ, একটা গানে আছে—

"সুখময় সায়র মরুভূমি ভেল্।
জলদ নেহারি চাতকী মরি গেল।"

মহারাজ : ভেল্ নয়, ভেল।

—ভেল? মানে কী মহারাজ? মরুভূমি ভেল?

মহারাজ : ভেল মানে হল—

—এসব চণ্ডীদাসের মৈথিলী ভাষা। 'সুখময় সায়র মরুভূমি ভেল।' মানে সাগর মরুভূমি হয়ে গেল?

মহারাজ : হ্যাঁ, হ্যাঁ।

—আর 'জলদ নেহারি'?

মহারাজ : জলদ মানে মেঘ। মেঘ দেখে।

—ও আচ্ছা, ঠিক আছে। 'চাতকী মরি গেল'?

মহারাজ : চাতকী মানে সে মেঘের জল খায়। কিন্তু মেঘ দেখেই সে মরে গেল। জল খাওয়া হল না।

—আনন্দে মহারাজ?

মহারাজ : আনন্দে নয়, বিরহে।

—মেঘ দেখে চাতক মরে গেল!

মহারাজ : জল পেল না।

—কেন সেটা?

মহারাজ : জল পেল না। দূর থেকে দেখল। কিন্তু জল পেল না। না পেয়ে মরে গেল। চাতক তো মেঘের জল ছাড়া খাবে না। কাজেই জল

পেল না, মরে গেল। ভগবান চলে গেলেন, তখন গোপীরা মরে গেল। বিরহ-অগ্নিতে পুড়ে মরে গেল।

—আরেকটা গানে আছে মহারাজ, 'দন্তে তৃণ লয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে দাস্য মুক্তি যাচেন দ্বারে দ্বারে।' দন্তে তৃণ লয়ে—

মহারাজ : দাঁতে ঘাস কেটে। এটা দীনতার চিহ্ন।

—দীনতার চিহ্ন? আচ্ছা! এরা বলছে যে, গরু মারা গেলে—

মহারাজ : হ্যাঁ, দাঁতে খড় নিয়ে ভিক্ষে করে।

প্রশ্ন : ঠাকুর বলছেন—ত্যাগী আছে বৈকি। ঐশ্বর্য ত্যাগ করলে লোকে জানতে পারে। এমনই আছে জানে না। 'পশ্চিমে নাই'। পশ্চিমে বলতে?

মহারাজ : উত্তরাখণ্ডে।

—উত্তরাখণ্ডে? রাজস্থান, গুজরাট—এগুলো পড়বে না?

মহারাজ : ওখানে অত সাধু থাকে না। "অমিয় সাগরে সিনান করিনু সকলি গরল ভেল।" এসব পড় না কেন?

—পড়েছি, এটা পড়েছি।

মহারাজ : তা 'ভেল' জান না?

—ভেল মানেটা জানব কী করে? পড়েছি।

মহারাজ : তা কিরকম পড়া? মানে না জেনে পড়া? এ আবার কিরকম পড়া?

—আরো অনেক কথা আছে মহারাজ। যেমন আমরা কালীকীর্তন করি মহারাজ, একটা ভাল ভাব আছে—এই জানি। কিন্তু সব শব্দের অর্থ জানি না।

মহারাজ : জানতে হয় তো।

—কিন্তু সবাই বলতে পারে না।

মহারাজ : তা সবাই না বলতে পারে, কেউ কেউ বলতে পারে তো? (সকলের হাসি)

—সেই জন্যই তো এখানে আসা। আর জিজ্ঞাসা করে যতটা জানতে পারা যায়।

মহারাজ : গম্ভীর মহারাজ বলতেন—গম্ভীর মহারাজ তখন দেওঘরে। তা, জ্বর হয়েছে, পড়ে আছেন। আর পাশে কালীকীর্তন করছে। "আশাবাসা ঘোর তমো নাশা বামা কে মোহিনী?" (সকলের হাসি) আশাবাসা ঘোর—আমি বলি, আশাবাসা মানে জানেন? বলছেন—না। আশা মানে দিক্। দিগ্বসনা—মানে ন্যাংটো। (হাসি)

—ওটা আর কী করে বলবে? আশাবাসা বলছে, ভাল কথা বলছে। ন্যাংটা কথা কী বলা যায়?

মহারাজ : আরে, ন্যাংটো। কবিতা মিলাতে হবে তো। ন্যাংটো বললে মিলবে কী করে! নানান রকম করে বলা আছে। তারপরে 'দিগ্বসনা চন্দ্র ভাল', 'আশাবাসা ঘোর তমো', 'উলঙ্গিনী নেচে ধায়'—এসব আছে।

—'বসন নাহিক গায়'—এটাও আছে। 'দেখ না চেয়ে ন্যাংটা মেয়ে করতেছে কি কারখানা।'

মহারাজ : 'করতেছে কি কারখানা'।

—মহারাজ, আরেকটা, এই সঙ্গে আমরা পাই—শিখা-সূত্র-যজ্ঞোপবীত। শিখা তো আমরা বুঝি। সূত্র কোন্‌টাকে বলে? শিখা-সূত্র-যজ্ঞোপবীত?

মহারাজ : তাহলে কী হল?

—লীলাপ্রসঙ্গে ঠাকুরের সন্ন্যাসের প্রসঙ্গে রয়েছে—শিখা-সূত্র-যজ্ঞোপবীত সব আহুতি দিলেন।

মহারাজ : যজ্ঞোপবীত—পৈতে।

—সূত্রটা কোন্‌টা?

মহারাজ : সূত্রকেই যজ্ঞোপবীত বলে।

—ও শিখা-সূত্র-যজ্ঞোপবীত—এই সূত্র আর যজ্ঞোপবীত এক; ঠিক আছে।

প্রশ্ন : একদিন গোপালের মা জপ করছেন দেখে ঠাকুর বলছেন—তোমাকে আর জপ করতে হবে না। ওসব তোমাকে আর করতে হবে না। তোমার হয়ে গেছে। তখন গোপালের মা জিজ্ঞাসা করছেন—হয়ে গেছে? দুবার ঐরকম জিজ্ঞাসা করতে ঠাকুর বলছেন—হ্যাঁ, হয়ে গেছে। তখন বলছেন,

আচ্ছা করতে পার। নিজেকে দেখিয়ে—এর জন্য করতে পার। তা এর জন্য করতে পারাটা—

মহারাজ : ঠাকুরের কল্যাণের জন্য। আসলে হচ্ছে—গোপালের কল্যাণের জন্য। তা গোপাল তো ঠাকুর—কাজেই এর কল্যাণের জন্য!

—ভগবান, তাঁর কল্যাণের জন্য আবার—

মহারাজ : তা বড়রা করে না ছোটদের কল্যাণের জন্য?

—ঠিক আছে মহারাজ, আজকে এই পর্যন্ত থাক।

মহারাজ : আজকে তত্ত্বকথা হল না। সব শব্দার্থ হল।

—হবে, আমাদের জিজ্ঞাসা আছে। আজকে এপ্রসঙ্গের মধ্যে খাপ খাবে না।

॥ ৯৫ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, ভৈরবী ব্রাহ্মণী ঠাকুরের সঙ্গ করলেন ছ-সাত বছর। এত সাধন-ভজন করলেন। আবার শাস্ত্রজ্ঞান অগাধ ছিল, কিন্তু তার পরেও দেখা যাচ্ছে, তিনি ঠাকুরের সঙ্গে থাকতে পারছেন না। কামারপুকুর ছেড়ে কাশীতে চলে গেলেন। তা, এটা তো একটা অপূর্ণতা।

মহারাজ : অপূর্ণতা নেই, কে বললে? কোথায় পেলে তুমি যে অপূর্ণতা নেই?

—আমাদের প্রশ্নটা জেগেছে কেন বলছি। তিনি ঠাকুরের সঙ্গে থাকলেন, এত সাধন-ভজন করলেন—তাতেও অহঙ্কার, ক্রোধ তাঁর মধ্যে বেশ ছিল।

মহারাজ : তা ছিল।

—সেগুলো দূর হল না? এত সাধন করার পরেও?

মহারাজ : না। তা হৃদয় যে ঠাকুরের এত সেবা করল, তার কী হল?

—তার সাধন-ভজন ছিল না। তার শাস্ত্রজ্ঞানও ছিল না। কিন্তু ভৈরবী ব্রাহ্মণী সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, বোঝা যায়। গুরু ছিলেন ঠাকুরের। ঠাকুরকে শিষ্যরূপে তো গ্রহণ করেছেন। আবার—

মহারাজ : ঠাকুরকে তিনি possess করতে চাইছিলেন। Possession, অধিকার—তাই হয়নি।

—বলছেন, আরে আমি তো ওর চোখ খুলে দিলাম। এত অহঙ্কার! সেই অহঙ্কারের পরিণতি দেখা গেল। তিনি ঠাকুরের কাছেই থাকতে পারলেন না—এটা কেন?

মহারাজ : এটা সতর্কতার বাণী। সতর্কতা কেন? এর দ্বারা মানুষ সতর্ক হবে। যে উঠবে সে আবার পড়তে পারে। উঠেও আবার পড়তে পারে।

—মহারাজ, না, আরেকটা কথা যে, ঠাকুরের কাছে থাকলে যে সব হয়ে যাবে, তা নয়।

মহারাজ : সে তো বটেই। কাছে থাকা—সে তো হৃদয়ও ছিল। তা নয়—এটা দেখানো যে, এত সাধন-ভজন করেও মানুষের কাম-ক্রোধাদি সহজে যায় না। এটাই দেখবার। সম্পত্তি থাকলেই তার সদ্ব্যবহার হয় না।

—মহারাজ, হৃদয় ঠাকুরের যে এত সেবা করল, তার কি কোন ফল নেই?

মহারাজ : ফল ছিল। শেষে ঐ ফেরি করতে হল! (সকলের হাসি)

—তাতে লাভ কী হল?

মহারাজ : তাতে দু-চার পয়সা লাভ হল!

—ভগবানের যে এত সেবা করল কাছে থেকে—তার কী ফল হল?

মহারাজ : মাস্টারমশাই বলেছেন—বোধ হয় হৃদয় নিঃস্বার্থভাবে ঠাকুরের সেবা করতে পারেনি।

—ঠাকুরের সঙ্গে থেকেও কিছু উন্নতি হবে না?

মহারাজ : না। হল না। হল না তো!

—আমরা বলি সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ। সে অবতারের সঙ্গ করল।

মহারাজ : সঙ্গ করেনি। কাছে ছিল।

—হ্যাঁ, কাছে ছিল। সেটাও কি কম মহারাজ?

মহারাজ : কমও নয়, বেশিও নয়। অনেক সময় একটা ঘটনা বলি এই প্রসঙ্গে। শরৎ মহারাজের কাছে একজন নবাগত ছেলে এসে বলছে—সাধুসঙ্গ করতে এসেছি। তখন শরৎ মহারাজ বললেন—যারা কালীবাড়ির কর্মচারী, ঠাকুরের কাছে তারা চব্বিশ ঘণ্টা বছরের পর বছর ছিল, তাদের কারো জীবনে বিশেষ কিছু উন্নতি হয়েছে বলে শোনা যায় না। তা, সাধুসঙ্গ মানে সাধুর কাছে থাকা?

—না, আমরা অন্য একটা দিক দেখি। তাঁর কৃপা মানে যেন তিনি যেচে কিছু করে দিচ্ছেন। ঠাকুর অনেককে অযাচিতভাবে কৃপা করেছেন।

মহারাজ : কৃপায় কোন condition নেই।

—তা ঠিক, তবে ঠাকুর তো কৃপাময়। আমরা বলি এবং দেখিও। তাঁর জীবনে দেখি—অনেক ক্ষেত্রে তিনি অযাচিতভাবে কৃপা করছেন। কিন্তু তাঁর কাছে রইল চৌদ্দ বছর তাঁরই ভাগনে—তার একটু আধ্যাত্মিক কল্যাণ হোক—এটা কি তিনি ইচ্ছা করলে করতে পারতেন না?

মহারাজ : দেখাতে হবে তো দৃষ্টান্ত যে, এত কাছে থেকেও কিছু হয় না।

—এই শিক্ষাটা দেওয়ার জন্য? এগুলি একটু বিপরীত বলে মনে হয়। এটাই বলছি। মহারাজ, আমরা বলছি যে, যদি সকামভাবেও করে থাকে, নিষ্কামভাবে যদি নাও করে থাকে, মাস্টারমশাই যেমন বলছেন যে হৃদয় নিষ্কামভাবে করেনি ঠাকুরের সেবা—যদি সকামভাবেও করে থাকে, তাও তো কিছু হল না।

মহারাজ : কিছু হল না কে বলল? এখন অবধি আমরা তার নাম করছি! এতে কিছু হল না! (সকলের হাসি)

—তার জীবনে সে কী পেয়েছে?

মহারাজ : হিরণ্যকশিপু, সে কী পেল? তাকে তো ভগবান শেষ করলেন।

—তার তো বিপরীতভাব ছিল। কিন্তু হৃদয় তো ঠাকুরের সাধনকালে শরীররক্ষা করার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করেছেন।

মহারাজ : গালাগালও দিয়েছে। এমনকি ঠাকুর তার অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে গঙ্গায় ডুবে মরতে গিয়েছিলেন।

—মহারাজ, এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ল। এটা কি আপনি শুনেছেন, একটা বইতে লিখেছে—ঠাকুর নাকি একদিন খুব রেগে গিয়ে হৃদয়কে ঝাড়ু নিয়ে মারতে গেছেন?

মহারাজ : কী নিয়ে মারতে গেছেন?

—ঝাড়ু।

মহারাজ : ঝাড়ুতে কি মারা যায়? অপমান করা যায়। মারা যায় না।

—নারকেল ঝাড়ু দিয়ে মারলে মহারাজ খুব লাগবে! কিন্তু একথা কি বিশ্বাস করা যায়?

মহারাজ : হ্যাঁ, হ্যাঁ। কেন যাবে না? হৃদয়কে বলছেন—দেখ হৃদয়, তুই যখন রেগে যাবি তখন আমি চুপ করে থাকব। আর আমি যখন রেগে যাব, তুই তখন চুপ করে থাকবি। তা না হলে খাজাঞ্চি পুলিশ ডাকবে।

—তবে হৃদয়ের একটা দর্শন হয়েছিল মহারাজ।

মহারাজ : দর্শনের অত মূল্য দেওয়ার কিছু আছে নাকি?

—দর্শনের মূল্য নেই?

মহারাজ : না।

—আধ্যাত্মিক দর্শন, ভগবৎ দর্শন?

মহারাজ : ভগবৎ দর্শনের রকমারি আছে। ভূত দেখাও তো দেখা। ভগবানের চার হাত দেখল। তাতে কী হল, ঘোড়ার ডিম!

—কিন্তু সেই দর্শনে তার যে-অভিব্যক্তি, তাতে একটা বড় কথা বলছে সে।

মহারাজ : তা নয়। ভগবদ্ভাবে তন্ময় হওয়াটা বিশেষ দরকার।

—ভগবদ্ভাবে তন্ময় হওয়া?

মহারাজ : হ্যাঁ। দর্শন হওয়াটা বিশেষ কিছু নয়। ভগবানকে দর্শন করাটা খুব বড় কথা নয়।

—ভগবদ্ভাবে দর্শন করাটা বিশেষ কিছু নয়। ভগবানের ভাবেতে তন্ময় হওয়াটাই বিশেষ, কিন্তু সেবাটা কিছু নয়?

মহারাজ : সেবা করার মূল্য আছে। সেবা করতে করতে তদ্ভাবে ভাবিত হবে। তা যদি না হয়, তাহলে সেবার মূল্য নেই।

—এ-জন্মে না হোক, পরজন্মে হবে। মহারাজ, ভগবদ্দর্শনের পরেও কী ভগবদ্ভাবে তন্ময়তা আসবে না?

মহারাজ : না।

—সে কী! সেটা তো একটা বিশ্বাসের সৃষ্টি করবে। ভগবদ্দর্শনে তার মনটা আরো ভগবানের দিকে যাওয়ার কথা।

মহারাজ : আরে বিশ্বাস হয় না। দেখার পরেও বিশ্বাস হয় না।

—গোপালের মাকে ঠাকুর বলছেন—তোমার সব হয়েছে। গোপালের মা বললে—আমার সব হয়েছে? হ্যাঁ। তিনবার তিনি যাচাই করে নিচ্ছেন। ঠাকুর বললেন—হ্যাঁ, তোমার সব হয়েছে। দর্শন হওয়ার পরেও সংশয়, অজ্ঞানতা—এটা কিরকম?

মহারাজ : দর্শন হওয়ার পর অজ্ঞানতা ছিল না নয়—অজ্ঞানতা যায়নি।

—যায়নি?

মহারাজ : না।

—এটা আশ্চর্যের কথা নয় কি মহারাজ? দর্শনের পর সমস্ত সংশয় দূর হয়ে যাওয়ার কথা তো।

মহারাজ : হৃদয়ের মতো গোপালের মার কথা তো এখানে প্রযোজ্য নয়। তাঁর ভাল জীবন ছিল। কাজেই সেটা এখানে আনলে হবে না।

—না। আমি হৃদয়ের সাথে তুলনা করছি না। আমরা বলছি ভগবদ্দর্শনের পরেও সন্দেহ থাকে—সে-প্রসঙ্গে কথাটা উঠল, তাই বলছি।

মহারাজ : ঐ যে বললাম—দর্শনের চেয়ে তন্ময়তাই হল বড় জিনিস। তন্ময়তাই বড় জিনিস।

—বুড়ো গোপালদা একবার ঠাকুরকে গিয়ে ধরেছেন যে, সবারই কিছু কিছু দর্শন হচ্ছে। আমায় কিছু করে দিতে হবে। ঠাকুর বলছেন—দূর! তোর তো ভারি হীনবুদ্ধি। দেখ না নরেন, তার এত ত্যাগ, এত বিশ্বাস—ওর তো এইরকম দর্শন-টর্শন হয় না। বলছেন—তার জীবনটা দেখ।

মহারাজ : এর থেকে বোঝ, দর্শন করেও কাজের কাজ হয় না।

—ঠাকুর পরিষ্কার ঐ জায়গায় বলেছেন, লীলাপ্রসঙ্গে রয়েছে। আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিচায়ক কী, তা বোঝাতে শরৎ মহারাজ খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন। তা হল—বিশ্বাস, চরিত্রশক্তি আর ত্যাগ।

মহারাজ : এগুলি দ্বারা যাঁর সেবা করেছে, তাঁর ভাবে ভাবিত হওয়া। তখন নিজের 'আমি' চলে যাবে, তারপরে ভগবদ্ 'আমি' প্রতিষ্ঠিত হবে। এই।

—গৃহিভক্তরা—

মহারাজ : তাদের জীবনের যদি পরিবর্তন আসে তাহলে দর্শনের মূল্য আছে।

—আপনি বলেছিলেন, স্থায়ী পরিবর্তন হওয়া দরকার। আমার মনে আছে আপনি কথামৃত ক্লাস নিতেন মঠের লাইব্রেরি হলে। আমার এই কথাটা মনে আছে আপনি বলেছিলেন যে, আধ্যাত্মিক উন্নতি বলতে জীবনে স্থায়ী পরিবর্তন একটা আসবে।

মহারাজ : বুঝলে? সেবা করা মানে শুধু খাওয়া নয়। (সকলের হাসি)

—বৈষ্ণবেরা বলে, সেবা কী হয়েছে? মহারাজ, গম্ভীর মহারাজ আপনাকে কী বলতেন?

মহারাজ : হ্যাঁ, বলতেন—কী মশাই, ভোজন কি হল?

প্রশ্ন : সংসার কি মিথ্যা? ঠাকুর বলছেন, যতক্ষণ তাঁকে না জানা যায়, ততক্ষণ সংসার মিথ্যা। যতক্ষণ পর্যন্ত ভগবানকে না জানছি, ততক্ষণ পর্যন্ত সংসারটা মিথ্যা।

মহারাজ : তার মানে সংসারটাকে ত্যাগ করতে হবে, তবে তাঁকে জানা যাবে।

—কিন্তু ঠাকুর বলছেন উলটো করে। যতক্ষণ তাঁকে না জানা যায় ততক্ষণ মিথ্যা।

মহারাজ : ঐ তো হল। মিথ্যাকে ত্যাগ করতে হবে, তবে তো তাঁকে জানা যাবে।

—তাঁকে জানলে পরে—

মহারাজ : তখন আর ত্যাগ করবার কিছু নেই।

—তখন জগৎ কি সত্য?

মহারাজ : সত্য মানে ঈশ্বররূপে সত্য।

—ঈশ্বররূপে সত্য। আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে, ঘটটা সত্য কিনা। তা যদি কেউ বলে—না, এটা মাটিরূপে সত্য। তাহলে ঘট আর রইল কোথায়? মাটির ঢেলাই রইল।

মহারাজ : "বাচারম্ভনং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্।" (ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ৬। ১। ৪) মৃত্তিকা ঘটের রূপে আছে এখন। বদলাতেও পারে। কাজেই ঘটটা মিথ্যা।

—কিন্তু বলা হচ্ছে যে, ঘটটা উৎপত্তির আগেও ছিল।

মহারাজ : উৎপত্তির আগেও ছিল কল্পনারূপে।

—না, তা কেন? ওরা তো শাস্ত্রপ্রমাণ দিয়েই বলছেন যে—না, "সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ।"

মহারাজ : একমেবাদ্বিতীয়ম্।

—একমেবাদ্বিতীয়ম্।

মহারাজ : তাহলে? ঘট রইল কোথায়?

—এই যে জগৎ, ইদম্—এটা ছিল, আছে। সৎ ছিল।

মহারাজ : অদ্বিতীয়ম্ কথাটা বাদ দিচ্ছ কেন?

—তাহলে ওদের যে-সিদ্ধান্ত তা হল, জগৎসৃষ্টির পূর্বেও যেটা ছিল—তা হল সৎকার্যবাদ। জগৎসৃষ্টির আগেও সৎ ছিল—এই সিদ্ধান্ত তাহলে থাকছে কী করে?

মহারাজ : "সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ।" তা সৎটা কী হল? অগ্রে—জগৎ সৃষ্টির পূর্বে সৎ আসীৎ।

—সৎ ছিল।

মহারাজ : সদেব—সৎ মাত্রই ছিল।

—সৎ মাত্রই ছিল! জগৎ ছিল না?

মহারাজ : জগৎ-বৈচিত্র্য ছিল না, ব্রহ্মরূপে ছিল।

—ব্রহ্মরূপে ছিল?

মহারাজ : হ্যাঁ।

—এই ব্রহ্মরূপে থাকা, তাকে কি জগৎ থাকা বলা হয়?

মহারাজ : না, তা বলা হয় না। জগতের ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন সত্তা নেই।

—মহারাজ, এই প্রসঙ্গে স্বামীজী এক জায়গায় বলেছেন, আদিতে শব্দমাত্র ছিল। সেই শব্দ ব্রহ্মের সঙ্গেই ছিল। আর সেই শব্দই ব্রহ্ম। এখানে তো আবার আরেক রকম। শব্দ এসে গেল—আদিতে।

মহারাজ : শব্দ ব্রহ্মের কার্য যদি হয়, তাহলে কার্য তো কারণাতিরিক্ত নয়। কাজেই শব্দ ব্রহ্মের কার্য। ব্রহ্মরূপেই ছিল।

—শব্দ কার্য?

মহারাজ : কার্যটা কারণরূপে ছিল।

—শব্দটা কার্য বলছেন?

মহারাজ : হ্যাঁ। "এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ।" (তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, ২।১।৩)

—"আকাশাৎ বায়ু।"

মহারাজ : তাহলে আকাশ সম্ভূত হল তো, কার্য হল তো?

—তাহলে আদিতে শব্দমাত্র ছিল, কী করে বলা যাবে?

মহারাজ : শব্দমাত্র মানে সৃষ্টি ব্যাকৃত। সৃষ্টির আগে শব্দ ছিল।

—এইটা বুঝতে পারছি না, মহারাজ। ব্যাকৃত হলে তো কার্য হয়। অব্যাকৃত অবস্থায় তো কার্য বলা হবে না তাকে। তখন তো—

মহারাজ : ব্রহ্মের তুলনায় শব্দটা কার্য। কিন্তু জগতের তুলনায় শব্দটা নিত্য। কেননা, সকল কার্যের কারণ সেটা।

—ব্রহ্ম, তারপরে শব্দ, তারপরে জগৎ-রূপ—এই বৈচিত্র্য। সেই কথাটাই আবার কর্মযোগেও বলছেন মহারাজ। এই কথাটাই সকল ধর্মে শব্দশক্তিরূপে স্বীকৃত হয়েছে। এমনকি, কোন কোন ধর্মে সমগ্র সৃষ্টিই শব্দ থেকে

উৎপন্ন হয়েছে বলা হয়। ব্রহ্ম আর শব্দ কি এখানে অভেদ? এইরূপে যে ব্রহ্মই শব্দরূপে—

মহারাজ : কোন কোন মত বলে।

—বৈয়াকরণেরা তাই বলেন—শব্দ ব্রহ্ম। শব্দটাই ব্রহ্ম, তা নয়। ঠাকুর বলছেন যে, শব্দের তো একটা প্রতিপাদ্য থাকবে। শব্দের অতিরিক্ত একটা জিনিসকে নির্দেশ করছেন।

মহারাজ : প্রতিপাদ্য মানে অতিরিক্ত নয়। শব্দের দ্বারা যাকে বোঝাচ্ছে।

—তাই বলছি। একজন ভক্ত বলেছিলেন যে, শব্দ থেকে সব হয়েছে। ঠাকুরের মত তা নয়। ঠাকুর বলছেন—কেন, শব্দের একটা প্রতিপাদ্য থাকবে তো।

মহারাজ : শব্দের প্রতিপাদ্য মানে, শব্দ যাকে বোঝাচ্ছে, মানে নির্দেশ করছে—ব্রহ্ম।

—সেইটাই। ব্রহ্ম। তার মানে ঠাকুর শব্দকেই চরম সত্তা বলছেন না।

মহারাজ : আরে দেখ—যেদিক দিয়েই দেখতে চাও, প্রথম কারণ হচ্ছে—শব্দ। তার পরে সেটা ব্রহ্মের তুলনায় কার্য। কিন্তু জগতের তুলনায় কারণ। "অনন্যত্বং আরম্ভন শব্দাদিব"—অর্থাৎ, কার্যের কারণ থেকে অনন্যত্ব হবে।

—'শব্দাদিব'—শব্দের থেকে।

মহারাজ : 'আরম্ভন শব্দাদিব'।

—'আরম্ভন শব্দাদিব'। এ কী ব্রহ্মসূত্রে আছে?

মহারাজ : হ্যাঁ। আছে। "তদনন্যত্বং আরম্ভন শব্দাদিব।"

—আরেকটা কথা মহারাজ, ওঁরা বলেন যে, ব্রহ্ম হচ্ছে জগতের নিমিত্ত কারণ আবার উপাদান কারণ।

মহারাজ : কারণ—জগতের বিকৃতির কারণ যে হচ্ছে, তা কে থাকবে সেখানে? ব্রহ্মাতিরিক্ত সত্তা তো নেই। কাজেই ব্রহ্মই হলেন উপাদান। ব্রহ্ম নিমিত্তও বটে।

—ওরা সাধারণত যে-দৃষ্টান্ত দেন সেখানে দেখা যাচ্ছে যে, কুলাল বা কুম্ভকার ঘট তৈরি করে মাটি দিয়ে, সেখানে কুলাল বা কুম্ভকার—সে তো নিজে আর বিকৃত হয়ে যায় না।

মহারাজ : না, সেখানে সে নিমিত্ত কারণ। সেরকম ব্রহ্মাতিরিক্ত—যদি নিমিত্ত কারণ ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কেউ থাকে, যার দ্বারা বিকৃত হবে? ব্রহ্ম ছাড়া কেউ নেই। কাজেই ব্রহ্মই নিমিত্ত কারণ।

—হ্যাঁ। তাঁরা ঊর্ণনাভির দৃষ্টান্ত দেন—

"যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি
তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্।।" (মুণ্ডকোপনিষদ্, ১।১।৭)

অর্থাৎ, মাকড়সা যেরকম নিজ শরীর থেকে সূতা উৎপাদন করে ও আত্মসাৎ করে, পৃথিবীতে যেরকম ওষধিসমূহ জন্মায়, সজীব পুরুষশরীর থেকে যেমন বিজাতীয় কেশ ও লোম সকল নির্গত হয়, সেইরকম অক্ষর থেকে এই সংসারমণ্ডলে নিখিলবস্তু উৎপন্ন হয়। কিন্তু ঊর্ণনাভির দৃষ্টান্ত যে দেন, তা ঊর্ণনাভির একটা শরীর আছে। জড় শরীর আছে। কিন্তু ব্রহ্মের তো সেরকম জড় শরীর নেই।

মহারাজ : নানাবিধ দৃষ্টান্ত যে দেয়, সেটা পুরোপুরি সঠিক বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত নয়। ঐ ঊর্ণনাভির যে-জাল সেটা সে ভেতরে মোটেই গ্রহণ করে না।

—ভিতরে নেয় না জালটা?

মহারাজ : না।

—শুধু বার করে?

মহারাজ : না না, জালটা গুটিয়ে ফেলে দেয়।

—ও, কিন্তু বলা হয় যে, নিজে নিজে খেয়ে নেয় একসময়। তা ওরকম কোনদিন দেখিনি, শুনিনি। তা আপনি বলছেন যে, ব্রহ্ম থেকে উৎপত্তি হয় জগতের, আবার ব্রহ্মতে বিলীন হয়ে যায়।

মহারাজ : এটা প্রবাদ থেকে নেওয়া হয়। দৃষ্টান্ত তো বোঝাবার জন্যে। যেটা মানুষ জানে তার দ্বারা দৃষ্টান্ত বোঝানো হয়। তা "ঊর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্যতে চ।" এটা লোক-প্রতীতি। তার জন্য দৃষ্টান্ত।

—দৃষ্টান্ত যেটা দেওয়া হয়, ব্রহ্মের সঙ্গে ঊর্ণনাভির দৃষ্টান্ত, তাতে তার থেকে সৃষ্টি যে হয় সেটা তার শরীর থেকে হয়। ব্রহ্মের তো এইরকম কোন শরীর নেই যে, তার থেকে এই জগৎটা উৎপন্ন হবে।

মহারাজ : শরীর থেকে হয়। ব্রহ্ম শরীর নয়। কিন্তু জগতের ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন সত্তা নেই তো।

—এইজন্য তো উপাদান। তাই সাংখ্যেরা বলছে যে, প্রধানকে মানতে হয়। প্রধান বা প্রকৃতিকে স্বীকার করতে হয়।

মহারাজ : জগতের আদি কারণ যে, তাকে বলে প্রকৃতি। এখন আদি কারণ কি নিজে বিকৃত হয়? না, কারো সান্নিধ্যবশত বিকৃত হয়? পুরুষের সান্নিধ্যবশত এই বিকার চলছে অনাদি কাল থেকে। এইজন্য প্রকৃতিকে নিত্য বলে।

—তা, ওখানে দুটি তত্ত্ব স্বীকার করা হয়েছে। একটি নিমিত্ত কারণ, অন্যটি উপাদান কারণ। এটা আমরা পরিষ্কার কুম্ভকারের দৃষ্টান্ত থেকে বুঝে নিতে পারি। কিন্তু বেদান্ত-মতে দুটিকে স্বীকার করা হচ্ছে না। একটিকেই স্বীকার করা হচ্ছে।

মহারাজ : কারণ, একটিকে স্বীকার না করলে জগৎ যে তাঁর থেকে সৃষ্টি হয়েছে—একথা বলা যাবে না। নাসদীয় সূক্তে যেমন বলা হয়েছে, কিছু ছিল না।

—কিছু ছিল না। অন্ধকার অন্ধকারের দ্বারা আবৃত ছিল। কিন্তু যেটা আমরা স্বীকার করব, সেটা তো যুক্তি এবং শ্রুতির সঙ্গে মিলিয়েই করব।

মহারাজ : তা তো বটেই।

—তাহলে এখানে সাংখ্যরা পরিষ্কার বলবেন যে, তোমাদের এরকম ধরনের সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক হয়ে যাচ্ছে।

মহারাজ : না, "সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ।" তার কী করবে?

—সৎ ছিল।

মহারাজ : সাংখ্যরা কী বলবে সেখানে?

—সৎ ছিল। ওরা তো বলে যে, পুরুষ ছিল।

মহারাজ : তা, ছিল মানে—'সদেব'; 'এব' কথাটি বাদ দিও না।

—তা যদি বলেন যে, ওটা সৎই ছিল।

মহারাজ : আরে বাবা, প্রকৃতি আনছ। কিন্তু 'এব' কথাটির মানে কোথায় গেল?

—হ্যাঁ। তা ঐ প্রকৃতিই ছিল। প্রকৃতি থেকেই উৎপন্ন হয়েছে।

মহারাজ : হয় না। প্রকৃতি জড়। তা থেকে উৎপন্ন হয় না। পুরুষের সান্নিধ্য ছাড়া প্রকৃতি কাজ করে না।

—সাংখ্য পক্ষে যেমন দোষ আরোপ হচ্ছে, তেমনই বেদান্ত পক্ষেও তো দোষ এসে যাচ্ছে।

মহারাজ : না, না। প্রকৃতিই বিকৃত হল। স্বয়ং পুরুষ বিকৃত হয় না।

—হয় না, পুরুষের সান্নিধ্যবশত প্রকৃতি বিকৃত হয়। সেইজন্য ওরা বলে যে, পুরুষ তো হল নিমিত্ত কারণ। উপাদান কারণ কী করে হবে?

মহারাজ : না, কী করে হবে মানে—ঐ ব্রহ্মে—'সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ'—এই কথা থেকে হবে।

—শ্রুতি মানতে হবে। শ্রুতি থেকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

মহারাজ : 'সদেব' সৌম্য ছিল, তাকে দেখল কে? (হাসি)

—এ-প্রশ্ন তো থাকবে।

মহারাজ : এইজন্য শ্রুতি মানতে হয়।

—সৎ ছিল, আর কোন দ্রষ্টা ছিল না।

মহারাজ : শ্রুতির কথা নেবে। শ্রুতির কথা নিতে হবে।

—শ্রুতির কথা?

মহারাজ : শ্রুতি—বেদের কথা।

—শুধু ঈশ্বরই আছেন, আর কিছু নেই। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বা "ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্"।

মহারাজ : সর্ব কোথায়? সর্ব তো ব্রহ্মতে অধ্যস্ত। ব্রহ্মস্বরূপই সর্বরূপে প্রতীত হচ্ছে। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—এসমস্তই ব্রহ্ম। সমস্তরূপে ব্রহ্ম কী? তাহলে ব্রহ্ম বিনাশী হয়ে যেতেন। ব্রহ্ম তো অবিকারী? কাজেই বিকারী বস্তু ব্রহ্ম নয়।

—এটা প্রতীতি—মিথ্যা। প্রতীতি হচ্ছে মাত্র।

মহারাজ : মাণ্ডূক্যকারিকায় আছে—

—কোন্‌টা? "আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্তমানে অপি তৎ তথা।" আদি ও অন্তে যে-জিনিসটা থাকে না, বর্তমানেও তা থাকে না। এইটা বলছেন?

মহারাজ : তার পরে আছে যে, "উপায়ঃ সোঽবতারায় নাস্তি ভেদঃ কথঞ্চন।" (অদ্বৈতপ্রকরণ, ১৫) বোঝাবার জন্য এগুলো বলা। তারপর এরকম অনেক জিনিস অনেকভাবে বলা আছে। শঙ্কর বলেছেন কোথাও 'তেজবন্ন'—তিনটি কারণ। কোথাও 'পঞ্চ কারণ' বলেছেন। এ কী হল? তফাৎ কেন? তা বললেন—তাতে তাৎপর্য তো নয়।

—তাই। তাতে তাৎপর্য তো নয়। এগুলি হল বাহ্য।

মহারাজ : দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাবার জন্য।

—ঠিক আছে। আসছি মহারাজ।

॥ ৯৬ ॥

প্রশ্ন : বিজ্ঞানীর অবস্থার কথা ঠাকুর বলেছেন অনেকবার। আর বলেছেন ভাবমুখের অবস্থা।

মহারাজ : ভাবমুখ ঠাকুর বলেননি।

—জগন্মাতা আদেশ করেন—'ভাবমুখে থাক' এবং সেইজন্যই ভাবমুখে রইলেন।

মহারাজ : ভাবমুখ সম্বন্ধে লীলাপ্রসঙ্গে শরৎ মহারাজ বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

—ভাবমুখের কথা অন্যত্র পাওয়া যায় না?

মহারাজ : না।

—তা সেইজন্য আমরা একটু পরিষ্কার করতে চাই। বিজ্ঞানীর অবস্থা আর ভাবমুখের অবস্থা কি একই জিনিস?

মহারাজ : বিজ্ঞানীর অবস্থা হচ্ছে সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন। আর ভাবমুখ হচ্ছে যেখান থেকে বৈচিত্র্য—বিশিষ্টতা সব বেরচ্ছে। সেই অবস্থায়—তারই মুখে, তারই কেন্দ্রস্থলে। Source-এ। উৎপত্তিস্থানে।

—বিজ্ঞানী সব অবস্থাতে সব কিছুতেই ব্রহ্মদর্শন করছেন। আর ভাবমুখের অবস্থাতেও কি সবকিছুর মধ্যে ব্রহ্মকে দেখছেন না?

মহারাজ : না। তা নয়। যেখান থেকে বৈচিত্র্যের উদ্ভব হচ্ছে, সেই স্থানেতে অবস্থান করা—ভাবমুখে থাকা।

—সেই স্থানে অবস্থান করা এবং সেইখান থেকে একজন কিরকম দেখে জগৎটাকে, সেটা শরৎ মহারাজ বলছেন—ভাবময় বলে দেখে। সমস্ত জিনিসগুলো ভাবময়। ঈশ্বরের যে বিরাট মন—সে বিরাট মনে এইসমস্ত এক একটি জিনিস যেন এক একটি ঢেউ। তা, সেজন্য আমাদের এ-দুটো জিনিস পরিষ্কার নয়। এ-দুটোর মধ্যে কী তফাৎ আছে, না একই জিনিস?

মহারাজ : পরিষ্কার কেন হবে না? এটা একটি দৃষ্টি দিয়ে দেখা। বিজ্ঞানী—তাকে বলছেন যে, সে সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন করে। সর্বও আছে এবং ব্রহ্মও আছে। ব্রহ্মরূপে সর্ব।

—ঠাকুর যেমন বলছেন, সব মানুষকে দেখি যেন বালিশের খোল। কোনটা লম্বা, কোনটা গোল, কোনটা বা চওড়া। কিন্তু সবগুলোর ভিতরে একই তুলো, এক সচ্চিদানন্দ। এ দর্শনই কি বিজ্ঞানীর দর্শন?

মহারাজ : এটা তোমাদের বোঝাবার জন্য। যা বুদ্ধির অতীত, তাকে বোঝাবার জন্য এইভাবে বলা। তা না হলে বালিশটা, খোলটা কোত্থেকে এল?

—এটাই তো। দৃষ্টান্ত দিয়েই তিনি বোঝাচ্ছেন। জগৎটা তিনি কিরকম দেখেছেন, তাঁর অনুভবটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছেন।

মহারাজ : এই আর কী।

—এটাই কি বিজ্ঞানীর অবস্থা মহারাজ? মোমের বাগান, মোমের গাছ, মোমের ফুল—সমস্ত মোম দিয়ে তৈরি। ঠাকুর বলছেন তাঁর দর্শনের কথা। সেখানে মাস্টারমশাই কথামৃতে heading লিখেছেন—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।

মহারাজ : যে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছে। ঠাকুর তো মার্কা মেরে বলেননি। তাঁর ভাষায় তিনি বলেছেন।

—মাস্টারমশাই যেরকম বললেন আর বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সম্পর্কে তাঁদের বইতে অন্যরকম পাওয়া যায়। তাঁরা বলেন যে, এই জগৎটা হল—চিৎ অচিৎ উভয়ই। চিৎও আছে, অচিৎও আছে।

মহারাজ : চিৎ-বিশিষ্ট অচিৎ-বিশিষ্ট যা অদ্বৈত। যে চিৎ-বিশিষ্ট, সেই অচিৎ-বিশিষ্ট—এইভাবে অদ্বৈত।

—ঠাকুরের বর্ণনাতে রয়েছে—সেখানে তিনি সবই চিৎ দেখছেন। জড় তো কিছু দেখছেন না।

মহারাজ : কে বলেছে? যখন সব বলছ, তখন? সব মানে কী?

—সব বলতে আমরা যাকিছু দেখছি, শুনছি।

মহারাজ : তা, এগুলোর তো আকার রয়েছে।

—আজ্ঞে মহারাজ।

মহারাজ : পার্থক্য রয়েছে, তা-ও দেখছ। এইজন্য বিশিষ্টাদ্বৈত বলছেন। আর কিছু বল—

প্রশ্ন : ঠাকুর বলছেন—জ্ঞানীরা ভয়তরাসে। কিন্তু বিজ্ঞানীর ভয় নাই।

মহারাজ : জ্ঞানীরা মুক্তি চান। তাঁরা বারবার আসতে চান না।

—এইজন্য জ্ঞানীরা ভয়তরাসে? তাঁরা নেমে এসেও খেলেন। ঠাকুর বলছেন, কেউ কেউ চিকে উঠেও খেলেন। বিজ্ঞানীদের কথা বলছেন। তাঁদের ভয় নেই।

মহারাজ : কাটিয়ে খেলেন।

—জ্ঞানের পর যেহেতু থাকেন, দেহ থাকে সেইজন্যে; না মহারাজ?

মহারাজ : বিজ্ঞানীদের ভয় নেই।

—আবার বলছেন, কেউ আম খেয়ে মুখ পুঁছে ফেলে। কেউ আম ভাগ করে খায়।

মহারাজ : সে আলাদা কথা।

—বিজ্ঞানীর কথা বলছেন যে, তাঁরা ভাগ করে খান—

মহারাজ : মার্কাটা না মারলেই হয়। কেউ সকলকে মুক্ত করার জন্য চেষ্টা করেন। কেউ নিজে মুক্ত হয়ে পাট চুকিয়ে দেন।

—সেটাই। জ্ঞানী নিজের পাট চুকিয়ে দিচ্ছেন। তিনি আর অন্যের জন্য চেষ্টা করছেন না।

মহারাজ : ভক্তের ভেতরও তো হতে পারে।

—আরেকটা কথা মহারাজ। এই যে হতে পারে কী হতে পারে না—আমরা বলছি, এটা কি নিজের ইচ্ছার ওপরে, না ক্ষমতার ওপরে নির্ভর করে?

মহারাজ : কোন্‌টা?

—এই যে অপরের মুক্তির জন্য সহায়তা করা। সেটা কি মুক্ত পুরুষদের নিজের ইচ্ছার ওপরে নির্ভর করছে, নাকি তাঁদের ক্ষমতারই কম-বেশি আছে?

মহারাজ : ক্ষমতা আবার কোত্থেকে এল?

—ক্ষমতা মানে শক্তি। ঠাকুর বলছেন, কেউ কেউ বাহাদুরি কাঠ। এইরকম উদাহরণ দিয়ে সেই শক্তির কথা বলছেন।

মহারাজ : শক্তি আছে সকলের, কেউ কেউ শক্তি প্রয়োগ করতে চান।

—আমার প্রশ্ন ছিল যে, তাঁরা কি ইচ্ছা করবেন, না করবেন না—সেইটাই। নাকি, তাতে শক্তির কম-বেশি আছে?

মহারাজ : সে ইচ্ছার ওপরে নির্ভর করে।

—শক্তি তো আছেই। কেউ দুধ খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়েছেন—ঠাকুর বিজ্ঞানীর কথা বলছেন। জগৎকল্যাণের জন্য, ভাবমুখে থেকে ঠাকুর উপদেশ করেছেন।

মহারাজ : ভাবমুখের সঙ্গে এটিকে মিলিও না। এক এক দিক দিয়ে বর্ণনা করা। সবগুলোকে একসঙ্গে জড়িয়ে ফেললে গোলমাল হয়।

—বৈচিত্র্য যেখান থেকে সৃষ্ট, সেইখানে তিনি অবস্থান করছেন—তিনি কি জগৎ-বৈচিত্র্য দেখছেন না তখন?

মহারাজ : হ্যাঁ, দেখছেন। কিন্তু কোথা থেকে বৈচিত্র্য আসছে, তা-ও দেখছেন।

—উৎস। এই যে উৎস আর তিনি নিজে কি এক—এই বোধ করেন?

মহারাজ : নিজেও তো একটা ভাব?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

মহারাজ : তবে?

—তা, এই ভাব কি তিনি বোধ করেন যে, আমিও সেই ঈশ্বরের সঙ্গে এক?

মহারাজ : তিনি অনুভব করেন—বৈচিত্র্য যত কিছু, তাঁর থেকে আসছে। এই তো হল।

—লীলাপ্রসঙ্গে বলা হচ্ছে যে, ঈশ্বরের সঙ্গে তখন তাঁর মনের অবাধ সংযোগ হয়।

মহারাজ : তা হোক। ঈশ্বরের মন আর তাঁর মন দুটো এক বলছেন। তার মানে জগৎ-কর্তৃত্ব কি তাঁর আছে?

—জগৎ-কর্তৃত্বের কথা—

মহারাজ : নেই।

—নেই। ওকথা নেই। তাঁরা বলেন—না, ঈশ্বরেরই কেবল জগৎ-কর্তৃত্ব আছে, অপর কোন মুক্ত পুরুষের তা থাকে না। সেটা অস্বীকার করা হয়েছে।

মহারাজ : তা না হলে তো গোলমাল লেগে যাবে।

—এটা কী হল? ঠাকুর যে বলেছেন, মা এরকম আদেশ করছেন—ভাবমুখে থাক।

মহারাজ : মানে, সমাধিতে ডুবে গেলে হবে না।

—ঠিক। এইজন্যই আমরা বিজ্ঞানীর দেহে থাকা আর জগৎকল্যাণের জন্য ভাবমুখে থাকার মধ্যে একটা মিল খোঁজার চেষ্টা করি।

মহারাজ : আবার বিজ্ঞানীকে টেনে আনা কেন? এ তো ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা। একটির সঙ্গে আরেকটি জুড়ে দিলে গোলমাল লাগে।

—লীলাপ্রসঙ্গে ভাবমুখের বর্ণনা আছে, মহারাজ। আর দেখি ব্রহ্মসূত্রের অনুবাদ করেছেন বিশ্বরূপানন্দজী—রামগতি মহারাজ। তাঁর বইতে তিনি বেশ লম্বা করে ভাবমুখের বর্ণনা করেছেন শাস্ত্রীয় দিক থেকে।

মহারাজ : ও। তা, রাম হয়েছে গতি যার? না রামের গতি? না, রামই গতি?

—রাম গতি যার। এই ভাল—রামই যার গতি।

মহারাজ : রামের গতি, আর রামই গতি—এ-দুটোয় তফাৎ হচ্ছে তো?

—হ্যাঁ, তফাৎ হচ্ছে।

মহারাজ : এ যে দেখছি, তার নামের বর্ণনা দিয়ে দিলে?

—তিনি লেখার প্রথমে ঠাকুর, মা, স্বামীজী ও গুরুর বন্দনা করেছেন। শরৎ মহারাজের বন্দনা করেছেন শ্লোকাকারে। সুন্দর বর্ণনা আছে।

মহারাজ : না করে পারবে না, কারণ তাঁরই চেলা।

—তা হোক। এটা ওঁর একটা মহত্ত্ব বলব। কারণ, ঠাকুর, মা, স্বামীজীর ভাব মাঝে মাঝে একটু একটু নিয়ে এসেছেন। একটা বিরাট কাজ করেছেন উনি। তবে তাঁর ব্যাখ্যা অন্যান্য ব্যাখ্যার সঙ্গে তুলনা করলে একটু তফাত মনে হয়। উনি সেখানে পরিষ্কার করে বলছেন যে, ঠাকুরের এই যে ভাবমুখের অবস্থা আর বিজ্ঞানীর অবস্থা—একই।

মহারাজ : এই মুশকিল হচ্ছে। এ দুটো ভাবকে একসঙ্গে করলে গোলমাল। বিজ্ঞানী সর্বত্রই সেই ব্রহ্মকে দেখেন। আর ভাবমুখ মানে যেখান থেকে বৈচিত্র্যের উদ্ভব হচ্ছে। দুটো এক হল?

—দৃষ্টির তফাৎ আছে, ব্যাখ্যার তফাৎ আছে। এখন এঁরা এক কি দুই—সে তিনিই বলতে পারতেন। তিনি যদি বলে যেতেন, তাহলে আমরা স্বীকার করতাম।

মহারাজ : ন্যায় জান তো? ‘দেহলী দীপক ন্যায়’?

—দেহলী দীপক ন্যায়, বলুন মহারাজ।

মহারাজ : দরজার চৌকাঠে একটা দীপ রাখলে তাতে ঘরের ভিতরটাও দেখা যাচ্ছে, বাইরেটাও দেখা যাচ্ছে—এটাই ভাবমুখ। অদ্বৈত আর দ্বৈতের মেলভূমি।

—লীলাপ্রসঙ্গে যে বর্ণনা আছে—শরৎ মহারাজ এটাই সেখানে বলেছেন।

মহারাজ : এটাকে বলে 'দেহলী দীপক ন্যায়'। যাহোক, কথাটা মনে রাখতে হবে যে, আমাদের কী করে অজ্ঞান দূর হয়। যেরকম করে পার অজ্ঞান থেকে মুক্ত হও। তারপরে তোমার সেই বিশিষ্টাদ্বৈতই কী, অদ্বৈতই কী, দ্বৈতই কী—তাতে কিছু আসে যায় না। এক-একজন এক-একটা brand লাগিয়ে দেয়। দিয়ে তারপরে ঝগড়া।

—মহারাজ, এরকমই বলছিলেন একজন training centre-এ। Western Philosophy পড়াতে আসেন একজন অধ্যাপক। খুব বড় পণ্ডিত অধ্যাপক—নীরদবাবু—নীরদবরণ চক্রবর্তী। তিনি পড়ানোর মধ্যে ব্রহ্মচারীদের বলেছিলেন, Western Philosophy-তে First the philosophers have to create a problem, then they try to solve it. First you have to create a problem—এটা বেশ মজার ব্যাপার।

মহারাজ : বলা হয়—Philosophy-র বর্ণনা হচ্ছে—Searching of a blind man in a dark room for a black cat which is not there. (সকলের হাসি)

—মহারাজ আসছি।

মহারাজ : এসো। যাত্রা শুভ হোক।

॥ ৯৭ ॥

প্রশ্ন : আগেকার সাধুদের কথা শুনি—গ্রহণের আগে ওঁরা স্নান করতেন, পরেও আবার স্নান করতেন, কেন মহারাজ?

মহারাজ : তার পরে মুক্তিস্নান। তিনবার স্নান।

—এত স্নান করে কি কিছু হয়?

মহারাজ : কাঁপুনি হয়। (সকলের হাসি)

—ল— মহারাজ বলছেন, অনেকে ঐসময়টা জলেই থাকে।

মহারাজ : তাই নাকি?

—বললেন যে, আগে আর পরে করতে হবে। গ্রহণের মধ্যে করতে হয় একবার, আর গ্রহণের পরে করতে হয়। তা সেই সময় গিয়ে অনেকে জলেতেই দাঁড়িয়ে থাকে।

মহারাজ : কোন্ সময়—তার ওপর নির্ভর করে। শীতের দিনে যদি হয়, তাহলে টের পেয়ে যায়। মুক্তি সঙ্গে সঙ্গে। (হাসি)

—কালকে মহারাজ ঠান্ডা ছিল না।

মহারাজ : না। কী করে ঠান্ডা হবে! এখন তো গরম।

—আরেকটা খবর আছে, মহারাজ।

মহারাজ : বল।

—কালকে বলা হয়নি। আমাদের চিরতার জল খাওয়ানো এতদিন চলল। আজ থেকে বন্ধ।

মহারাজ : বন্ধ তো হল!

—এ এক জ্বালা।

মহারাজ : আমাদের সময় মা— মহারাজ ছিলেন Dispensary-র compounder। আমরা একবার বললাম : মা— মহারাজ, শরবত খাওয়াতে হবে। তা এসো। গিয়ে দেখি, বেশ সুন্দর রং—একটা গ্লাসে শরবত ভরে দিয়েছে। মুখে দিয়ে দেখি—quinine। (সকলের হাসি) তা আমি মুখ একেবারে বিকৃত না করে খুব আমোদ করে খেলাম। তার আনন্দটা মাটি হয়ে গেল! (সকলের হাসি)

—মজা করতে পারল না একেবারে। ঠকাতে পারল না। বেশি দেয়নি, সেজন্য।

মহারাজ : বেশি দেয়নি! আমাকে জব্দ করার জন্য কি আর কম দিয়েছে? (সকলের হাসি) তখন রং করাই থাকত।—Edward's tonic। এখন আর Edward's tonic চলে না।

—এখন তো আমাদের Dispensary থেকে অনেক tablet, capsule—এ-সব দেয়।

মহারাজ : আগে War-এর সময় দিত। Mapacrin খেলে চোখ দুটো হলদে হয়ে যেত। তারপরে Mapacrin-এর বদলে হল Paludrin। তারপর soldier-দের line করে দাঁড় করিয়ে খাইয়ে দিত। তা না হলে খাবে না। তার নাম ছিল Paludrin drill। (হাসি)

—খেতে হবে। খুব তেতো তো।

মহারাজ : আজকে দেখছি আর ভাল কথা হবে না। (সকলের হাসি)

—আপনি যে বিষয়টাকে এরকম করে ঘুরিয়ে বলবেন, আমরা তো ভাবিনি। (হাসি)

মহারাজ : আমি ভাবলাম, প্রথম বলি তোমাদের কাগজখানা কই? তারপরে ভাবলাম, গ্রহণের সময় জপ-ধ্যান অনেক করেছে। আজ আর কথা নাইবা হল! (হাসি)

—সেইরকম ঠাকুর বলেছিলেন গোপালদার উদ্দেশে। ওষুধ দেবেন গোপালদা। ওষুধ দিতে আর আসেন না। তা বলেছেন—কী হল? ঐ বুড়ো লোকটা কোথায় গেল? ওষুধ দেওয়ার কথা আছে। খবর নিয়ে জানলেন যে, ঘুমাচ্ছেন। তা বলছেন—থাক থাক। সারারাত জেগেছে, ডেকো না। তুমি বরং ওষুধটা ঢেলে দাও। তখন ওষুধটা আরেকজন ঢেলে দিল। কাশীপুরের ঘটনা।

মহারাজ : গ্রহণেতে ঘুমটা খুব ভাল হয়েছিল।

—ভাল হয়েছিল? তাহলে ভাল মহারাজ। স্বামীজী একবার গ্রহণে ঘুমানোর চেষ্টা করেও ঘুমাতে পারেননি।

মহারাজ : কোনদিক দিয়ে চাঁদ এল, কোনদিক দিয়ে গেল—কিছু বুঝতে পারিনি।

—না, কালকে আকাশ খুব পরিষ্কার ছিল তো। খুব সুন্দর দেখা গেছে।

মহারাজ : দেখলে কী করে? জপ-ধ্যান করছিলে তো দেখলে কী করে? (সকলের হাসি)

—আপনি তো দেখছি—

মহারাজ : Baptist's school নামে একটা মেয়েদের স্কুল ছিল। সে Bap's স্কুলে আমার এক মামাতো বোনকে আমি আনতে যেতাম। তা গিয়ে দেখছি, একজন Mother একটি মেয়েকে বকছে : তুমি prayer-এর সময় চোখ চেয়েছিলে কেন? তারপর তার Superior একজন এসে বলছে : তুমি জানলে কী করে সে চোখ চেয়ে ছিল? তোমারও চোখ তাহলে খোলা ছিল! (সকলের হাসি) একজন সাধু ছিল। একবার সে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করছে ঠাকুরকে। তা আর ওঠে না। তারপরে কে তাকে উঠিয়ে দিল। তারপর বলে—আমার নাক-মুখ ফুলে গেছে।

—একদিন হল কী—ভোগ নিবেদন হয়ে গেছে। পূজারি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে উঠে আসবে। এখন ভোগও নামে না, পূজারিও আসছে না। সবাই বলছে, কী হল? মন্দির তো বাইরে থেকে বন্ধ। হলটা কী? তা গিয়ে দেখে, পূজারি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছে। তারপরে দেখে, নাক ডাকছে।

মহারাজ : ঠাকুরকেই ডাকছে। (সকলের হাসি) একটা কথা মজা করে আমি বলি। জপে সিদ্ধ হয়েছে। সেটা কী করে বুঝব? যখন জপ করতে করতে জপের মালা নিচে পড়ে যাবে তখনি বুঝবে, জপে তিনি সিদ্ধ হয়েছেন। (হাসি) তা ভক্তেরা বলে, আমাদের তো হামেশাই হচ্ছে। (হাসি)

—মহারাজ, গোবিন্দ মহারাজ এসেছেন। কিছু বলবেন।

মহারাজ : গোবিন্দ মঠ ছাড়তে পারছে না। এজন্য ফিরে ফিরে আসছে।

—না মহারাজ। এক সপ্তাহ আসেননি।

মহারাজ : এই এ-ত-দি-ন? (সকলের হাসি)

প্রশ্ন : মহারাজ, মঠে একবার চোর ধরা পড়েছিল—

মহারাজ : কারণ, তারা গাছের ওপরে ছিল। পালাতে পারেনি। তারপর তাদের ধরে প্রথমে মারা হল। তারপর নারকেল গাছে বেঁধে রাখা হল। ধর্মানন্দ স্বামী বিকেলে ওদিক দিয়ে যেতে যেতে হাতজোড় করে বললেন—আহা! সাধুদের কী দয়ার শরীর! (সকলের উচ্চ হাসি)

—মানে, আমাদের এক একজন মডেল।

মহারাজ : বিকালেও গাছে বাঁধা আছে দেখে আমি আর পারলাম না সহ্য করতে। প্রিয়দা তখন মঠের ম্যানেজার। তাঁকে বললাম—প্রিয়দা, এবার ছেড়ে দিন ওদের। বললেন—হ্যাঁ, দে। সেদিন জেনারেল মিটিং ছিল, তার প্রসাদ ছিল। তাদের প্রসাদ কিছু দিলাম। তারপর বললাম—কালকে এসো Dispensary থেকে ওষুধ দেব। (সকলের হাসি) কেটে-কুটে গেছে, তাই আয়োডিন-ফায়োডিন দেওয়া দরকার। তা বলছি, কালকে এসো। Dispensary থেকে ওষুধ দেবো। বলছে—আবার মারবে না তো? (সকলের উচ্চ হাসি)—না। তা আর আসেনি। একজন বলছে, মারবে না। কিন্তু আরেকজন কী করবে ভরসা ছিল না। (মহারাজের হাসি)

—যিনি বলছেন, তিনি তো মারেননি। মহারাজ, আরেকবারের চুরির ঘটনা বলেছিলেন, সাধুরা লাঠি খুঁজছিল—

মহারাজ : হ্যাঁ, একজন সাধু লাঠি খুঁজছেন। আরেকজন জিজ্ঞাসা করলেন—লাঠি দিয়ে কী করবেন? লাঠি দিয়ে লাঠিবাজি করতে হবে। চোর এসেছে ঐ নারকেল চুরি করতে। তা, লাঠি খুঁজছে সব। কিন্তু লাঠির তো ব্যবস্থা নেই। লাঠি কোথায় পাবে? পণ্ডিতমশাইয়ের একটা লাঠি ছিল। সেটা জোগাড় করেছে। সেটা নিয়ে গিয়ে সবচেয়ে বড় যে চোরটা, তাকে একটা মেরেছে। তা সে সহ্য করতে পারল না। পড়ে গেছে। আবার তুলেছে। তা, আমি তখন চোর ছেড়ে ওকে ধরেছি। করছ কী? মরে যাবে যে! ছেড়ে দাও। (হাসি) এক সাধু, সে দোতলা থেকে লাফ মারল নিচে। ধ্যান করছিল। আর আমাদের বড় স— ছুটে গিয়ে তাকে মারতে গেছে। তখন ছিল জোয়ারের সময়—আমাদের পোস্তা আর নৌকাটা সমান সমান। নৌকায় উঠে গিয়ে তাদের মারতে আরম্ভ করেছে। ইতোমধ্যে আরো অনেকে জুটল মারতে। এমন পেলে কে আর ছাড়ে! (সকলের হাসি)

—অনেকদিন পর পাওয়া গেছে।

মহারাজ : তখন বেদান্ত পাঠ করছিলাম। (মহারাজের হাসি) তা বেদান্ত ছেড়ে মারধর কারা করে, দেখতে গেলাম। অ— উঠে মারছে সবাইকে—মাল্লাগুলোকেও। তারপর প্রথমে মাল্লাগুলো একটু হুমকি দিয়েছিল। তা, দলে ভারি তো এরা। আমি ভাবলাম, সর্বনাশ! অ— যদি ধাক্কা খায়, জলে পড়ে যায়, তাহলে আর রক্ষা নেই। সাঁতার জানত না তো!

—আচ্ছা, সাঁতার জানতেন না আবার গঙ্গার ওপর গেছেন মারামারি করতে?

মহারাজ : হ্যাঁ। যাই হোক, তারপর সে-পর্ব তো চুকে গেল। অ—এর তারপরে হাতে যন্ত্রণা। হাতে খুব লেগেছে। হাতে গুলেড লোশন দেওয়া হল।

—মহারাজ, নৌকাটা তুলল?

মহারাজ : বড় গাধাবোট। শেষে তারা চলে গেল।

প্রশ্ন : মহারাজ, আজ আমাদের মধ্যে রায়পুরের আত্মানন্দজীর কথা হচ্ছিল।

মহারাজ : ও খুব সুন্দর বক্তৃতা অনুবাদ করত। আমি দীক্ষা দিতে গেলে কিছু না কিছু বলতে হতো। তাছাড়া উৎসবাদির বক্তৃতা উত্তর ভারতে আত্মানন্দই ইংরেজি থেকে হিন্দি করত। অন্য শহরে গেলে আরো interpreter থাকত, তারা মাঝখানে অন্য ব্যাখ্যা চালিয়ে দিত। যখন দেখি ব্যাখ্যাটা অন্য লাইনে চলে যাচ্ছে, তখন বলতাম আমি এটা বলিনি—ঠিক কর। আমি একবার মাদ্রাজে দীক্ষা দিচ্ছি। তামিল আমি তো জানি না; তা interpreter-রা হিন্দি করে বলছে। অনুবাদ করে দিচ্ছে। আমি বললাম—যাক, অনুবাদ করতে হবে না। ওর চেয়ে আমি হিন্দি ভাল বলতে পারব। (সকলের হাসি) যদিও খুব আমার confidence ছিল না, তাও বলেছি। দরকার হলে হিন্দিতে বলেছি।

—আপনি গুজরাটিতে বক্তৃতা দেননি?

মহারাজ : অনেক, অনেক দিয়েছি।

—সেটা সহজ। হিন্দির চেয়ে সহজ আপনার কাছে।

মহারাজ : হিন্দি? না, এখন হিন্দিটাই সহজ। গুজরাটি বলার অভ্যাস নেই তো এখন।

স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ : মহারাজ, রাশিয়াতে অনেকেই প্রশ্ন করে—বৌদ্ধধর্ম আর অদ্বৈতবেদান্তের মিল কোথায়, আর তফাত কোথায়?

মহারাজ : মিল সুন্দর আছে। বাসনাত্যাগেই মুক্তি। এইখানে মিল আছে। আর মুক্তি ও নির্বাণ শব্দের তাৎপর্যে মিল নেই। অদ্বৈতবেদান্তের তাৎপর্য হচ্ছে ব্রহ্মতে। আর ওদের তাৎপর্য হচ্ছে শূন্যতে।

—শূন্যের ধারণাটা তো দুর্বোধ্য।

মহারাজ : তা দুর্বোধ্য, তবে তারা বলে—এ-শূন্য সে-শূন্য নয়।

—যারা মহাযানী তারা বলে শূন্য—nothingness আমরা কোন সময় বলি না।

মহারাজ : এখন মুশকিল হচ্ছে, মাধ্যমিক যারা তারা শূন্য বলে। যখন ভাষার stock শেষ হয়ে যায়, তখন শূন্য। এমনকি বেদান্তও তাই বলে। কিন্তু শূন্য বলে না, ব্রহ্ম বলে। ওদের দৃষ্টান্ত দীপ-নির্বাণ। শিখাটি নিভে গেল, কী রইল? কিছুই রইল না। আমাদের সমস্ত উপনিষদ্ বলছে—জ্ঞানে কী রইল? যাতে উপাধি আরোপিত হচ্ছিল, তা রইল।

—আমরা বলছি এভাবে। কিন্তু ওরা বলছে, কিছুই রইল না।

মহারাজ : ঐ হচ্ছে মুশকিল। শূন্যেরও বর্ণনা নেই। ব্রহ্মেরও বর্ণনা নেই।

—ওরা বলছে, বোধি হল, জ্ঞান হল। জ্ঞানটা হল—কী হল?

মহারাজ : ওরা জ্ঞান বলে না।

—বোধি তো বলছে।

মহারাজ : বোধি মানে হচ্ছে জ্ঞান। বস্তুর অস্তিত্ব নেই—এই জ্ঞান, এই বোধি।

—তাই তো। স্বামীজী তো এটাই বলছেন, বস্তু আর গুণ—দুটো একসঙ্গে ধারণায় আসে না। হয় গুণ নতুবা বস্তু।

মহারাজ : মুশকিল হচ্ছে, অবস্তুর অনুভব হয় না। অবস্তুকে অনুভব করতে গেলে কোন বস্তুর মাধ্যমে করতে হয়। তা না হলে অবস্তুকে

জানবে কে? জ্ঞান ছাড়া কোন বস্তুর প্রকাশ হয় না। প্রকাশ হতে হলে জ্ঞান দরকার। এখন জ্ঞানের সঙ্গো সঙ্গো তার আরোপ এসে যাচ্ছে। বিনা আরোপেতে জ্ঞান—আমাদের অনুভব হয় না। যখনি অনুভব হবে—আরোপের সঙ্গো সঙ্গো জ্ঞানের অনুভব হয়। "উদ্ধেতৃবর্গমধ্যস্থ-পুত্রাভ্যাম্ শব্দবৎ"। পণ্ডিতমশাই সকলের সঙ্গো একসঙ্গো ঘোষছে। ঘোষতে থাকে, তো সমস্বরে বলে যাচ্ছে। এখন যার ছেলে সেও তো দলের ভেতরে রয়েছে—তার শব্দটা আছে তো। কিন্তু পণ্ডিতমশাই আলাদা করে ছেলের স্বরটা বুঝতে পারছে না। সকলের সঙ্গো মিশে আছে। এরকম ব্রহ্মকে আমরা সকলের সঙ্গো মিশ্রিতরূপে দেখি, পৃথক-রূপে দেখতে পাই না। এই পৃথককরণই হল সাধনা। সমস্ত আরোপকে বিলীন করে দিয়ে যাতে আরোপিত হচ্ছে, সে-আধারমাত্রে অবস্থান— আমাদের সে-জ্ঞান হয় না। যখনি জ্ঞান হয়, উপহিত বস্তুর জ্ঞান হয়।

—তাহলে আরোপিত বিষয়ের পৃথক যে-বস্তুটি—

মহারাজ : পৃথক-রূপে জ্ঞান হবে না।

—কিন্তু অনুভব হবে।

মহারাজ : অনুভব আর জ্ঞান—তফাতটা কোথায়? পৃথক-রূপে জ্ঞান হবে না, পৃথক-রূপে অনুভবও হবে না। অনুভব শব্দটা একটা জটিল শব্দ।

—কিন্তু, আমি এইরকম তো বলতে পারি যে, ব্রহ্মকে জানা যায় না। কিন্তু ব্রহ্মকে অনুভব করা যায়।

মহারাজ : অনুভব করা যায়—কথাটার মানে কী? জানা আর অনুভব করা—তফাত কী?

—আমি যে ব্রহ্ম—এটা স্বতঃসিদ্ধ জানা।

মহারাজ : স্বতঃসিদ্ধকে জানা যায় নাকি? কে জানবে? কী দিয়ে জানবে? "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ"।

—Objectively জানা যাবে না। কিন্তু আমি আমাকে জানি।

মহারাজ : তুমি তোমাকে জান—কী করে জান? তুমি কর্তা, ভোক্তা, জ্ঞাতারূপে জান।

—আর শুদ্ধরূপে?

মহারাজ : জান না। জ্ঞানস্বরূপরূপে জান না। জ্ঞাতারূপে জান। কর্তা, ভোক্তা, জ্ঞাতা—এইরূপে জান।

—তাহলে ব্রহ্মকে জানা যাবে না?

মহারাজ : ব্রহ্মস্বরূপেতে জানা যাবে না। বাক্য-মনের অতীত। যে মনের অতীত, তাকে জানবে কী দিয়ে?

—হওয়া যাবে। একটা কিছু তো হচ্ছে?

মহারাজ : এ্যাঁ?

—এই যে হওয়া যাবে, নিজের স্বরূপে ফিরে আসা যাবে—এরকম কিছু আছে?

মহারাজ : কথা হচ্ছে, সমস্ত আরোপকে বাদ দিলে যা থাকে, তা-ই ব্রহ্ম। কিন্তু আরোপকে বাদ দিয়ে কী থাকে তা বর্ণনা করা যায় না।

—তাহলে তো Buddhism-এ কোন ভুল নেই। তারা ঐ কথাই বলছে।

মহারাজ : Buddhism সেখানে শূন্য বলছে। দীপটা নিভে গেল—কোথায় গেল? ছিলই না। তা যাবে কোথায়! দীপটা যে দেখছিল, তার যা continuity বলে মনে হচ্ছিল, সেটা ভ্রম। ভ্রমটা দূর হল। প্রজ্বলিত যে তেলের কণা—এই যে তেলের কণাগুলিকে আমি একটা শিখা বলে মনে করছিলাম, আসলে শিখা বলে কিছু নেই। প্রজ্বলিত তেলের কণাগুলি আছে—এরকম বৃত্তিপরম্পরা আছে, কিন্তু তার পেছনে কোন স্থায়ী বস্তু নেই।

—এটাই হল Buddhism-এর বক্তব্য। আমরা ওটাকে কিভাবে বলব?

মহারাজ : আমরা বলব, মিল খুব আছে। তবে ওরা শূন্যতে পর্যবসিত করে, আমরা ব্রহ্মতে পর্যবসিত করি।

—আমরা তাকেই পূর্ণ বলি?

মহারাজ : তা কী করে হবে? সিদ্ধান্ত তো ভিন্ন ভিন্ন। ওরা বলে শূন্যতে পর্যবসিত। আমরা বলি ব্রহ্মে পর্যবসিত।

—কিন্তু জ্ঞান তো এক হল। জ্ঞানটা তো একপ্রকার। মতবাদটা ভিন্ন হোক।

মহারাজ : জ্ঞান বলে কোন বস্তুই ওরা মানে না। তা জ্ঞানটা এক হবে কী করে? জ্ঞান যাকে বলি আমরা—ওরা তাকে বলে বৃত্তিপরম্পরা। বৃত্তি-পরম্পরা—তাই নেই, নিভে গেলে কী থাকে? কিছুই থাকে না। আমরা বলি বৃত্তিশূন্য যে-জ্ঞান, তাই থাকে। বৃত্তির ভাসক, যা সাক্ষী—তা থাকে না। ওরা সাক্ষী-টাক্ষী মানে না। 'যদি স্যাৎ উপলভ্যেত'—যদি থাকত, তাহলে তার উপলব্ধি থাকত। কিন্তু শুদ্ধ জ্ঞানের উপলব্ধি হয় না। সুতরাং নেই। এটা ভাবতে হবে তো।

—আজকে এই পর্যন্ত থাক।

মহারাজ : আর মাথায় ঢুকবে না। (সকলের হাসি)

স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ : আমি Buddhism-এর ওপরে একটা বক্তৃতা দিয়েছিলাম। সেখানে দালাই লামার এক representative এসেছিল। আমি তো স্বামীজীর ওখান থেকে quality আর substance—তারা কেন শুধু quality-টা মানে তা বলেছি। আর বেদান্ত কী সাধনার কথা বলে—সেসব বলে দিয়েছি। সেখানে উপস্থিত বৌদ্ধ পণ্ডিতরা বলল—এ তো সাংঘাতিক ব্যক্তি, খুব জানে তো! (সকলের হাসি)

মহারাজ : মুশকিল হচ্ছে—'তত্ত্ব না নিশ্চয় হয়।' তত্ত্বকে কেউ স্থির করতে পারছে না। রামপ্রসাদ সোজা কথায় বলে গেছেন—তত্ত্ব না নিশ্চয় হয়। যাকিছু অনুভব হচ্ছে সবই সৎ।

—যতক্ষণ অনুভব হচ্ছে ততক্ষণ আমি যদি সৎ বলে সেটিকে গ্রহণ না করি, তাহলে সমস্ত ব্যবহারই মিথ্যা হয়ে যাবে।

মহারাজ : ব্যবহার কি সত্য নাকি?

—শাস্ত্র ব্যবহারকে তো সত্য বলে ধরে নিচ্ছে। আমরা যেখানে আছি, সেখান থেকে তো শাস্ত্র আমাদের সাহায্য করছে।

মহারাজ : তুমি যেখানে আছ সেখানে ধরে নিচ্ছ। কিন্তু তোমার সমষ্টি অনুভূতি—সে হল মিথ্যা।

—শাস্ত্র বলছে, অপরেরা বলছে, আমি তো বোধ করছি না।

মহারাজ : তুমি কী বোধ করছ?

—আমি বোধ করছি, এইগুলি সব—আমার পঞ্চেন্দ্রিয় আমাকে যা জ্ঞান দিচ্ছে, তা অনিত্য কিন্তু শাস্ত্র জানাচ্ছে সেই জ্ঞানের পিছনে যে-সত্তা আছে, সেইটা সত্য।

মহারাজ : স্বপ্রকাশ জ্ঞানকে না মানলে অনবস্থা দোষ হয়। অনবস্থা দোষ—এই অনবস্থা দোষকে পরিহার করতে হলে স্বপ্রকাশ জ্ঞানকে মানতে হবে।

—একটা জায়গায় তো দাঁড়াতে হবে।

॥ ৯৮ ॥

মহারাজ : ঐ দেখ, পেছনে একজন উমেদারী করছে। (সকলের হাসি)

—না, না। উমেদারী নয়। উমেদারী কেন করবেন। উনি তো টাকার ওপরে বসে আছেন।

মহারাজ : অ-শুদ্ধ। (সকলের হাসি)

প্রশ্ন : সাংখ্যেরা বলেন ঈশ্বর নেই—তা কেন? জগৎকর্তা যে-ঈশ্বর, তিনি কেন করবেন? যদি প্রয়োজন থাকে, তাহলে তাঁর ঈশ্বর হওয়ার কোন কথাই হয় না।

মহারাজ : প্রমাণাভাবাৎ। "ঈশ্বরাসিদ্ধে প্রমাণাভাবাৎ।"

—ঈশ্বরের কোন প্রমাণ নেই—প্রত্যক্ষ, উপমান, অনুমান যা আছে—প্রমাণ নেই, সে সব কোন প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বরকে সিদ্ধ করা যায় না?

মহারাজ : না।

—আবার ঈশ্বর হচ্ছেন জগৎ সৃষ্টিকর্তা। ফলে ঈশ্বর যদি জগৎ সৃষ্টি করেন—তা, একটা প্রয়োজনে করবেন তো?

মহারাজ : তাই তো।

—যদি প্রয়োজন না থাকে, তাহলে তিনি সৃষ্টি করতে পারবেন না।

মহারাজ :

"কিমীহঃ কিংকায়ঃ স খলু কিমুপায়স্ত্রিভুবনং
কিমাধারো ধাতা সৃজতি কিমুপাদান ইতি চ।
অতর্ক্যৈশ্বর্যে ত্বয্যনবসরদুঃস্থো হতধিয়ঃ
কুতর্কোঽয়ং কাংশ্চিন্মুখরয়তি মোহায় জগতঃ।।"

(শিবমহিম্নঃস্তোত্র-৫)

অর্থাৎ, বিধাতা কিরকম চেষ্টা করে, কোন্ শরীর দ্বারা, কি উপায়ে, কোন্ আধারে, কি উপাদান দ্বারা ত্রিলোকের সৃষ্টি করেন?—মূঢ় ব্যক্তির এই প্রকার কুতর্ক তর্কাতীত ঐশ্বর্যশালী তোমাতে অবকাশ পায় না; কিন্তু উক্ত তর্ক জগতের মোহের জন্য কাহাকে কাহাকে বাচাল করে থাকে।

তার জবাবে পরের শ্লোকে আছে—

"অজন্মানো লোকাঃ কিমবয়ববন্তোঽপি জগতা-
মধিষ্ঠাতারং কিং ভববিধিরনাদৃত্য ভবতি।
অনীশো বা কুর্যাদ্ভুবনজননে কঃ পরিকরো
যতো মন্দাস্ত্বাং প্রত্যমরবর সংশেরত ইমে।।"

(শিবমহিম্নঃস্তোত্র-৬)

মানে, সাবয়ব হয়েও পৃথিব্যাদি লোক কি উৎপত্তিশূন্য হতে পারে? জগতের উৎপত্তি কি জগৎকর্তার অপেক্ষা করে না? আর জগৎকর্তা যদি স্বাধীন না হন, তবে জগতের সৃষ্টি কিভাবে হবে? এভাবে তোমার কর্তৃত্ব স্বীকার্য হলেও হে সুরশ্রেষ্ঠ, যারা মন্দমতি তারা তোমার বিষয়ে সংশয় করে।

—উত্তরটা কী হল, মহারাজ?

মহারাজ : বলছে, জগৎটা সাবয়ব বস্তু। সাবয়ব হলে তার কি একজন অবয়ব সংযোজনকর্তা থাকবে না? তা যদি কেউ থাকে তাহলে সে—'ভববিধিঃ অনাদৃত্য ভবতি।' ভববিধির উৎপত্তির যে-প্রণালী সেটাকে ত্যাগ করে হবে। তারপরে কে আসবে তাহলে? কে এ যোগাড় করবে?

কে যোগাযোগ করবে? 'অনীশো বা কুর্যাৎ ভুবনজননে কঃ পরিকরো'—যিনি ভুবন সৃষ্টি করছেন, তিনি ঈশ্বর ছাড়া আর কে হতে পারেন? জগৎ-নিয়ন্তা ছাড়া জগতের সৃষ্টি কে করবেন?

—ঠিক। জগৎ-নিয়ন্তাই সৃষ্টি করতে পারেন। তা মহারাজ, কোন একটা সৃষ্টি করার পিছনে একটা প্রয়োজন থাকে, জগতে এটা দৃষ্ট। কিন্তু ভগবানের যদি কোন প্রয়োজন থাকে—তাহলে?

মহারাজ : না।

—প্রয়োজন থাকলে তিনি তো ঈশ্বর পদবাচ্য নন।

মহারাজ : প্রয়োজন নেই, তিনি সর্বসিদ্ধ, সিদ্ধকাম। তাঁর আবার প্রয়োজন কী?

—তাহলে আবার তিনি সৃষ্টি করলেন—এটা তো কোন কথা হল না—

মহারাজ : এই তো খেলা।

—খেলা?

মহারাজ : ছোট বাচ্চারা যে খেলাঘর করে ভাঙে, তার কি কোন প্রয়োজন আছে?

—কিন্তু সেটাও তারা একটা আনন্দ পায় বলে—একটা আনন্দ পায়।

মহারাজ : ঈশ্বর তো আনন্দস্বরূপ।

—তাঁর আনন্দের অভাব আছে কি?

মহারাজ : না, তিনি আনন্দস্বরূপ যে।

—সেই তো। তাহলে আবার আনন্দ পাওয়ার জন্য তিনি কি জগৎসৃষ্টি করবেন?

মহারাজ : জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। ধর, ঈশ্বর নেই—জগৎ সৃষ্টি কী করে হল?

—এই তো আমাদের প্রশ্ন।

মহারাজ : যখন জগৎ সৃষ্টি হয়নি—অর্থাৎ সাবয়ব বস্তু সৃষ্টি না হলে সেটা কী করে এল? এই হল যুক্তি। বিরুদ্ধ যুক্তি।

—বিরুদ্ধ যুক্তি, মহারাজ ঠিকই—বিরুদ্ধ মতকে খণ্ডন করা হচ্ছে, কিন্তু স্বপক্ষকে সিদ্ধ করা যাচ্ছে না।

মহারাজ : সিদ্ধ করা যাচ্ছে না—বিরুদ্ধ যুক্তি খণ্ডন করলে স্বতঃসিদ্ধ যিনি—তিনি আপনা থেকেই সিদ্ধ হলেন না?

—স্বতঃসিদ্ধ কী? জগতের সৃষ্টি ঈশ্বরকে অপেক্ষা করে তো—

মহারাজ : তা করে। ঈশ্বর ছাড়া কেউ সৃষ্টি করতে পারে না তো। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। তা, সর্বশক্তিমান—তাঁকেই তো ঈশ্বর বলি।

—ঈশ্বর বলেই তাঁর কোন প্রয়োজন থাকা উচিত নয়।

মহারাজ : প্রয়োজন থাকবে কী না থাকবে—তিনিই জানবেন। লীলা—'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্'।

—এর উত্তরে বলছেন যে, আমরা যেমন খেলা করি, আবার—যেমন রাজা মৃগয়া করতে যান—কেন করতে যান? না, তাতে একটা আনন্দ আছে। সুখের জন্য যান—তা এরকম লীলা-খেলার পিছনে ঈশ্বরের কি কোন অভিপ্রায় থাকে?

মহারাজ : না। এটা তাঁর আনন্দের অভিব্যক্তি। আমরা তাঁর আনন্দের তো স্বাদ পাই না। কাজেই এর ভেতর দিয়ে, আমরা বলি তাঁর আনন্দের অভিব্যক্তি।

—তাঁর সৃষ্টি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমরা—

মহারাজ : আমরা তাঁকে বুঝি।

—এটা আমরা বুঝতে পারছি। কিন্তু তিনি আনন্দস্বরূপ, সেটা আমরা বুঝতে পারছি না। সেটা অব্যক্ত আমাদের কাছে।

মহারাজ : এই তো লক্ষ্মীছেলের মতো বুঝে ফেলেছ! (সকলের হাসি)

—আমরা বুঝতে পারি, ঠাকুর বলেছেন, আপনি বলছেন। আমরা মিলিয়ে নিই। কিন্তু বিরুদ্ধ মতবাদীরা কোনমতেই বুঝতে চায় না।

মহারাজ : ও, খল তোমরা! বুঝতে পার না, অথচ বুঝে নিয়েছি বল! (সকলের হাসি)

—না, বুঝে নিয়েছি বলি না, বিশ্বাস করে নিই।

মহারাজ : ও, বিশ্বাস। তা, বিশ্বাস যুক্তিবিরুদ্ধ হলে কি সেটা বিশ্বাস হয়?

—মহারাজ, প্রয়োজনের কথা তো গীতাতে বলেছেন—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" (গীতা, ৪।৮)

এই যে অবতার হয়ে আসছেন, তার তো প্রয়োজন আছে। এবং প্রয়োজনগুলো তো উল্লেখ করলেন।

মহারাজ : "তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্।" (গীতা, ৪। ১৩) তাও তো আছে। (হাসি)

—নির্বিশেষ অবস্থার কথা বোঝাচ্ছেন, মহারাজ?

মহারাজ : আছে কী না? (হাসি)

—আছে, মহারাজ। এর আগেই বলেছেন, "চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।" (গীতা, ৪।১৩) এই শ্লোকের পরেই বলছেন—আমাকে অকর্তা বলে জানবে।

মহারাজ : (মজাচ্ছলে) ভগবান কী বলছেন তার ঠিক নেই। মাথার গোলমাল। (সকলের হাসি)

—তাহলে মহারাজ, ঐ যে উদ্দেশ্যগুলি বা প্রয়োজনগুলি আমরা কী করে বুঝব?

—ধর্মসংস্থাপন এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ—এই যে প্রয়োজনগুলি সিদ্ধ করতে আসেন—এইগুলি আমরা কী করে ধরব?

মহারাজ : তারপরে বলছেন—ঐগুলি আমি করি না।

—না, তাহলে শাস্ত্র কি বিরুদ্ধ কথা বলছে? বিরুদ্ধ যুক্তিগুলো—কথাগুলোকে আমরা কিভাবে বুঝব?

মহারাজ :

"চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্॥"

(গীতা, ৪।১৩)

—এই যে করছি বা কর্তৃত্ববোধ যেটা আমরা দেখছি, এটা ব্যাবহারিক। এগুলি পারমার্থিক সত্তা নয়। সেজন্য এগুলি তাঁর ব্যবহার।

মহারাজ : পারমার্থিক সত্যকে মুখে বলতে পারবে কি?

—না।

মহারাজ : তাহলে? আর—

—কোন্‌টা নয় সেটা বলে দিচ্ছেন। এগুলি পারমার্থিক নয়—এটা বলছেন।

মহারাজ : তা, পারমার্থিক কী লোকে প্রশ্ন করবে?

—প্রশ্ন করলে সেটা ব্যাবহারিক।

মহারাজ : সট্‌কা দিয়ে উড়িয়ে দেবে? (সকলের হাসি)

—বিপরীত ক্রমে বলা যায় যে, ব্যাবহারিক বা প্রাতিভাসিক যা নয়—তাকেই পারমার্থিক বলা যায়।

মহারাজ : এটি শূন্যও হতে পারে। প্রাতিভাসিকও নয়, ব্যাবহারিকও নয়।

—আবার এটা অভাব বস্তু মহারাজ। অভাব বস্তুকে আমরা পারমার্থিক বস্তু বলতে পারি না।

মহারাজ : তাহলে add কর, add কর। বিশেষণ যোগ দাও। ঐ বিশেষণ যোগ দিয়ে ব্যাপ্তিপঞ্চক হল। কারণ কী—কারণত্ব কোথায়? যা বলে তাতেই দোষ। শেষকালে—শেষপর্যন্ত বলে যে, পাঁচটা লক্ষণ করেছি। পাঁচটা লক্ষণই দুষ্ট। বলছে—"যত্র যত্র এব প্রামাণিকাণাং কারণত্ব ব্যবহার। তত্র তত্র এব কারণত্বম্।" প্রামাণিকেরা যেখানে কারণত্ব বলেন, সেখানেই কারণ বলব।

—ব্যবহারকেই স্বীকার করে নেওয়া হয়। প্রামাণিকত্বের ব্যবহার। ওঁরা যা বলবেন সেটাই আমরা স্বীকার করে নেব। এটাই যখন শেষপর্যন্ত এল—এটা আগেই বলতে পারতেন।

মহারাজ : না। চেষ্টা-টেষ্টা করে দেখল দাঁড় করাতে পারা যায় কিনা। তা দেখে যে, দাঁড়ায় না। তখন বলে, বা বা! ওঁরা যা বলেন তাই কর।

—এবং খুব সুন্দর; শঙ্কর সব যুক্তি দেওয়ার পর একটা সূত্রতে উনি পেয়েছেন, সেটাকে উনি খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন—'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ।'

বলছেন—শ্রুতিতে আছে। আর এই যা ব্যাখ্যা, শব্দমূল—এর পরে অন্য কোন প্রমাণ দেওয়া যাবে না।

মহারাজ : তা, শব্দমূল—অর্থ কী করে এল? অর্থ করবে কে?

—শব্দ মানে বেদ।

মহারাজ : বেদের অর্থ করবে কে?

—করবে কে? ঐ যেরকম দাঁড়িয়ে গেছে। এখন যে বেদের অর্থ তা তো ভিন্ন ভিন্ন। ভিন্ন ভিন্ন হওয়াতে আমাদের—

মহারাজ : এই তো মুশকিল।

—বেদপ্রার্থীদের মধ্যেই তো কত school দাঁড়িয়েছে।

মহারাজ : অতএব অত হ্যাঙ্গামে না গিয়ে চুপ করে বসে থাকাই ভাল।

—চুপ করে বসে থাকলে তো হবে না, মহারাজ।

মহারাজ : হবে না?

—এর একটা সমাধান পেতে হবে। তা না হলে চুপ করে থাকতে পারে না মানুষ।

মহারাজ : এই তো মুশকিল! যা পাওয়া যায় না, তাই পেতে হবে।

—এই তো আবার সেই বিরুদ্ধ কথা এল।

মহারাজ : ছয় কানাতে লিখলে পুঁথি; নাম দিল তার দর্শন।

—অ্যাঁ, কী?

মহারাজ : ছয় কানাতে লিখলে পুঁথি; নাম দিল তাঁর দর্শন। (সকলের হাসি)

—দারুণ তো। এটা বলেননি তো। একটা গান বলতেন আপনি—

—সত্যি মহারাজ, এটাই অদ্ভুত। ঠাকুর পণ্ডিতদের একেবারে—ঐ একটা গান আছে না—'ষড়দরশনে না পায় দরশন', সেই গানটি গেয়ে ওদেরকে ঠান্ডা করে দিচ্ছেন, বিদ্যাসাগরকে পর্যন্ত ঐ গানটা গেয়ে শোনাচ্ছেন। আপনি কিন্তু অন্য একটা গান দিলেন।

মহারাজ : সোজা বললে যে তত্ত্ব কিছুতে আবিষ্কার হবে না। যে-মন দিয়ে আবিষ্কার করতে যাবে, সে-মনটাই তো একটা form-এর ভিতরে,

ছাঁচের ভিতরে। তা ছাঁচ ছাড়া তো বস্তুকে—ঐ Thing in itself-কে কিন্তু বলতে পারবে না।

—নাম দেয়নি?

মহারাজ : অজ্ঞেয়বাদ। অজ্ঞেয়বাদীদের খ্রিস্টানরা গালাগালি দেয়। সে-জন্য প্রথমে ইমানুয়েল কান্ট লিখলেন theory, তারপর আরেকটা লিখলেন practical।

—Theory-টা হল—The Critique of Pure Reason.

মহারাজ : হ্যাঁ, Critique of Pure Reason. Theory-তে হল না কিছু। তখন The Critique of Practical Reason হল। যেগুলিকে অস্বীকার করেছিলেন, তার সব মেনে নিলেন।

॥ ৯৯ ॥

র-মহারাজ—রাশিয়ায় সংস্কৃত ভাষার খুব সমাদর। শুধু রাশিয়াতে নয়, বুলগেরিয়ায়ও গিয়েছিলাম। সেখানে invite করেছে University থেকে সংস্কৃত ভাষার ওপর একটা lecture দিতে। শেষে গিয়েছি। লোকজন অভ্যর্থনা করছে। তার মধ্যে যিনি সংস্কৃত-বিশেষজ্ঞ তিনি তো সংস্কৃততে অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

মহারাজ : তারা যদি তোমার বক্তৃতা শুনে মোহিত হয়ে খ্রিস্টান হয় তাহলে তার কী হবে?

র-মহারাজ—এটার justification তো আছে। সেটা ওদের justification। আমি যদি পছন্দ না করি, খুব চুপচাপ হয়ে যাই, তাহলে কারো কিছু বলার নেই। কিন্তু যদি বলে—না, খ্রিস্টান না হলে তোমার কিছু হবে না—বাবা!

মহারাজ : না, তা বলে না। ছোট বাচ্চাকে যখন নিয়ে যায় তখন সে খ্রিস্টান না হিন্দু না মুসলমান—কোন জ্ঞানই নেই।

র-মহারাজ—কিছু কৌশল করতে হয়। কৌশল সকলেরই আছে কিছু কিছু।

মহারাজ : গঙ্গাধর মহারাজ—অখণ্ডানন্দ স্বামী খ্রিস্টান ছেলেদের জন্যও খুব করতেন।

—(র-মহারাজকে) মহারাজ, আপনি church-এ গেছেন ওখানে? রাশিয়ান orthodox church-এ।

র-মহারাজ—অনেকবারই গেছি। ওদের প্রার্থনা শুনেছি। আমিও করেছি। প্রণাম-ট্রণাম করেছি।

—প্রণাম তো ওদের—

র-মহারাজ—আরে ওদের সব icon আছে। যথারীতি ঠাকুর থেকে আরম্ভ করে সব আছে তো। ওখানে পুজোটুজো হয় মোমবাতি ধরিয়ে। অনেকগুলি থাকে, অনেক প্রকার Icon নানা posture-এর। রীতিমত মাথা ঠেকায়। আমাদের যেমনটি, ঠিক সেরকম করে না। ভক্তির সঙ্গে করে। লোকেশ্বরানন্দজীর সঙ্গে ওখানে যাঁরা ছিলেন তাঁরা আবার গোঁড়া। Fanatic আর কী।

মহারাজ : একটা কাজ উনি করতেন। একটা করে লকেট দিয়ে দিতেন। ক্রুশ।

র-মহারাজ—ঐ চিহ্নটা দিয়ে দিলে খানিকটা এগিয়ে রইল। (সকলের হাসি) আমরাও দিই মহারাজ। ঠাকুরের লকেট। খুব বাচ্চা, ছোট ছেলে-টেলে নিয়ে এল, খুব ভক্ত দেখা যাচ্ছে, আমরা একটা লকেট লাগিয়ে দিই ঠাকুর-মা-স্বামীজী—যা আছে।

মহারাজ : কী, ক্রুশের ওপরে? (সকলের হাসি)

র-মহারাজ—ওরা নিয়ে রাখে। যেখানে যেরকম—যেখানে ক্রুশ দেখাবার, সেখানে ক্রুশ দেখাবে। আমাদের দিকে এলে তখন আমাদেরটা দেখাবে।

মহারাজ : গঙ্গা কিনারে গঙ্গাদাস। যমুনা কিনারে যমুনাদাস। (সকলের হাসি)

র-মহারাজ—ওগুলো, ফেলে না। ওসব ঘরে রাখে।

মহারাজ : আমরা ধর্মান্তর করি না বলি, কিন্তু কেউ যদি ধর্মান্তরিত হয়ে আমাদের ভেতর আসে তখন আমরা কি অখুশী হই?

—আমরা ত্যাগ করি না তাকে।

মহারাজ : ত্যাগ কেন করব? ভেতরে খুশিই হই। (সকলের হাসি)

প্রশ্ন : অভেদানন্দজী মহারাজ বেলুড় মঠ ছেড়ে চলে গেলেন কেন?

মহারাজ : চলে গেলেন—তাঁর ইচ্ছে ছিল, নতুন ধরনের একটি আশ্রম করবেন। সেই আশ্রমের সাধুরা হবে স্বাবলম্বী। এইজন্য তিনি আশ্রম ছেড়ে নতুন আশ্রম করলেন। তাতে বেতের কাজটাজ সব শুরু করলেন, যাতে সাধুরা স্বাবলম্বী হয়ে চলতে পরে। কিন্তু পরে তা আর চলল না।

—অভেদানন্দজীকে আপনি প্রথম কোথায় দেখেছেন, মনে পড়ে মহারাজ?

মহারাজ : হয়তো প্রথমে মঠে দেখেছি। তারপরে তাঁর আশ্রমে। মির্জাপুর স্ট্রীটে তাঁর আশ্রম ছিল। সেখানে দেখেছি।

—তখন কী বেদান্ত মঠ নাম দিয়েছিলেন?

মহারাজ : তা মনে নেই ঠিক।

—মির্জাপুর স্ট্রীটের কোন্ জায়গায় আশ্রম ছিল?

মহারাজ : সে মনে নেই। একটা দোতলা বাড়ি ছিল। আর কয়েকজন সেবক ছিল। উনি বলছেন, তাদের স্বাবলম্বী হতে হবে। তা, বেতের কাজটাজ আরম্ভ করেছে।

—স্বাবলম্বী অর্থে কি নিজেরা আয় করবেন, ভিক্ষা করবেন না—তাই কি?

মহারাজ : পরে বাইরে বিক্রি করতে হয়েছে। শেষে দেখেছি রেলস্টেশনে—হাওড়া স্টেশনে ওদের জিনিস বিক্রি হচ্ছে।

—তখন ওঁর যেসব idea ছিল, এখন ওসব মনে হয় আর নেই।

মহারাজ : না। এখন আর ওসব নেই।

—মহারাজ, আপনি ওঁর বক্তৃতা attend করেছেন?

মহারাজ : বক্তৃতা শুনেছি, class শুনিনি।

—বক্তৃতা শুনেছেন?

মহারাজ : হ্যাঁ।

—আচ্ছা মহারাজ, কোথায়? ওঁর ঐ আশ্রমে? ঠাকুরের সন্তানদের মধ্যে একমাত্র তাঁরই কথা আমরা record-এ পাই। Gramophone record-এ recording হয়েছিল।

মহারাজ : হয়েছিল। প্রথমদিকে আমেরিকা থেকে এসে কখনো কখনো স্যুট-কোট পরে বেরতেন রাস্তায়। একদিন আমি একজন সাধুকে (হরলাল) নিয়ে গেছি ওঁর ওখানে। গিয়ে বলছি—আমি অভেদানন্দ স্বামীর সঙ্গো দেখা করতে চাই। —Did you not see him stepping down? —No, I did not notice. —He is not always Swami Abhedananda, sometimes Mr Abhedananda. (সকলের হাসি)

—আমেরিকায় কতদিন ছিলেন?

মহারাজ : ২৫ বছর।

—২৫ বছর ছিলেন!

প্রশ্ন : শ্রীকৃষ্ণ কি খড়ম বয়েছিলেন উল্লেখ আছে?

মহারাজ : হ্যাঁ। নন্দের খড়ম।

—আচ্ছা?

মহারাজ : ঐ টিভিতে দেখিয়েছিল। (সকলের হাসি)

—ভাগবতে আছে?

মহারাজ : ভাগবতে নেই।

—আরেকটি জায়গায় ঠাকুর বলছেন—ঐ ঘটনা কী ভাগবতে আছে যে, রাধা যশোদাকে বলছেন—কৃষ্ণ চিদাত্মা, আমি চিচ্ছক্তি—কিন্তু উনি আমার কাছে—

মহারাজ : ভাগবতে রাধাই নেই।

—রাধাই নেই?

মহারাজ : ভাগবতে রাধা নেই। এক জায়গায় আছে—"অনয়ারাধিতা মুনিং ভগবান হরিম্।" 'অনয়ারাধিতা' শেষে রাধা হয়ে গেল। (সকলের হাসি)

—এমনি করে বুঝিয়ে দিলে হবে মহারাজ?

মহারাজ : না, এ তো ভাগবতে নেই। তা কী করবে? বৈষ্ণবদের রাধাকে দরকার। কাজেই ঢুকিয়ে দিলেই হল।

—মহারাজ, ওরা বলে যে, রাধা এত উচ্চ তত্ত্ব—ভক্তি প্রেমের এত উচ্চ তত্ত্ব—ভাগবতের সাধ্য নেই যে, তার নাম করে। রাধা ভাগবতের পারে।

মহারাজ : এই শ্লোকটা আছে—"অনয়ারাধিতা মুনিং ভগবান হরিম্।" অনয়ারাধিত—এর দ্বারা আরাধিত।

—যখন অন্তর্ধান হয়ে গেছেন—রাসলীলাতে কৃষ্ণ নাচছেন না, অন্তর্ধান হয়ে গেলেন, তখন ওরা সব খুঁজে বেড়াচ্ছে। খুঁজতে খুঁজতে দেখে যে, কৃষ্ণের পায়ের চিহ্নের পাশাপাশি আরেক জোড়া পায়ের চিহ্ন রয়েছে।

মহারাজ : একজন অন্য গোপী। একে নিয়ে কৃষ্ণ ঘুরছেন। একলা একে নিয়ে। রাধা তো সেখানে নেই। প্রধান গোপী আছে।

—প্রধানা গোপীকা।

মহারাজ : একজন অন্য গোপী। এই আর কী।

প্রশ্ন : ঠাকুরের জীবনে একটা দ্বন্দ্ব দেখা যায় যে, ঠাকুর প্রথমে নিরঞ্জন মহারাজকে, রাজা মহারাজকে চাকরির জন্য বকছেন। কিন্তু তিনি নিজে চাকরি করলেন। (সকলের হাসি) দাদার শূদ্রের প্রতিষ্ঠিত দেবতার পূজা করা মেনে নিলেন না, তারপরে নিজেই সেখানে চাকরি করলেন।

মহারাজ : পাঁচ টাকা মাহিনা। পরে দু-টাকা increment হয়েছে। (সকলের হাসি)

—এগুলি পরস্পর দ্বন্দ্ব তো!

মহারাজ : তিনি চাকরি বলে নিচ্ছেন না। মায়ের পূজা করছেন। তারপরে কী বল।

—বলব মানে, এগুলির মধ্যে তো সব দ্বন্দ্ব বা বিরোধ রয়েছে। সে-বিরোধগুলির সমাধান ঠিক আমরা করতে পারি না।

মহারাজ : বিরোধ কেন—তিনি চাকরি বলে মনে করতেন না এটা। মনে করার ওপর নির্ভর করে।

—যাক, এটা তবু কিছুটা—। তারপর স্বামীজীর মধ্যে কতরকম contradiction দেখা যায়।

মহারাজ : স্বামীজীও চাকরি করেছেন।

—তা, সেইজন্যই মহারাজ, যখন তিনি আমেরিকায় গেলেন, তার একটা কারণ হচ্ছে—তিনি বলছেন, আমি এখানে টাকা জোগাড় করব। দেশে গিয়ে কাজ করব। সেপ্টেম্বরে বক্তৃতা দিলেন শিকাগোতে। তার ছয় মাস পরে ডেট্রয়টে। টাকা দিতে এসেছিলেন অনেকে। নিয়েছেন। নিয়ে হঠাৎ কী মনে করে টাকা ফেরত দিতে চাইছেন। আবার গেছেন আরেকটা শহরে। বক্তৃতা দেওয়ার পরে লোকেরা খুব খুশি। অনেকে টাকা দিতে এসেছেন। বলছেন—না, না। আমি টাকা নেব না। এই কয়েক মাসের মধ্যেই মন এত পালটে যাচ্ছে একটা লোকের!

মহারাজ : প্রথমে উনি বক্তৃতা করে টাকা নিতেন, পরে মনে হল—কেন নিই? আর নিতেন না।

—এরপর আবার নিয়েছেন। আবার নিয়েছেন অনেক টাকা। Secular subject-এর ওপর বক্তৃতা দিয়েছেন। তাতেও টাকা নিয়েছেন। এইজন্য বলছি যে, একেক সময় একেক রকম মনোভাব।

মহারাজ : 'ইতি সঙ্গাদোষৈঃ।' (সকলের হাসি)

—এগুলো থেকে আমাদের কিছু বোঝবার বা শেখবার নেই। আবার ঠিক তেমনিভাবে দেখা যায়—কাজের ব্যাপারে, কাজে একেক সময় তিনি অপরকে খুব উৎসাহ দিচ্ছেন। নিজেও খুব করছেন। আবার কোন সময় বলছেন—all nonsense। কয়েক মাসের মধ্যেই একেবারে বিপরীত মনোভাব। কাজ উনি পছন্দ করছেন না। কে কাজ করবে, কার কাজ করবে, এরকম—কাজকে অস্বীকার করছেন।

মহারাজ : আমি কর্তা—এই বোধ থাকলে হবে না। আমি কর্তা—এই বোধ থাকবে না।

—কিন্তু তিনি পরিষ্কার বলছেন—আমি হিমালয়ে গিয়ে আশ্রয় নিতে চাই। তিনি শুধু কাজের মধ্যে কর্তা-বোধ ত্যাগের কথা বলছেন না। Perfectly

কাজ করার কথা বলছেন। একেক সময় ভাবছেন আমি হিমালয়ে গিয়ে আশ্রয় নেব। এরকম ভাবছেন, কিন্তু যেতে পারছেন না। একেক সময় একেক ভাব হচ্ছে মনের ভিতর।

মহারাজ : শুধু তাই নয়, একবার বলছেন—এখান থেকে চলে গিয়ে মায়ের কাছে থাকব।

—মায়ের প্রতি তাঁর একটা দুর্বলতা ছিল। গর্ভধারিণীর প্রতি।

মহারাজ : দুর্বলতা কেন বলছ?

—দুর্বলতা মানে—সন্ন্যাসী হয়েছি, আর আমার মা-বাবা—এদের দিকে তাকালে হবে না। ঠাকুরের কাজ করতে হবে। এই এক ধরনের মনের ভাব কাজ করছে। কিন্তু আবার তাঁর মায়ের সম্বন্ধে মিসেস বুল, ক্রিস্টিন—ওঁরা যখন কথা তুলতেন, উনি খুব emotional হয়ে পড়তেন। সেইজন্য বলছি আর কী। দুর্বলতা এই অর্থে বলছি। Emotional হয়ে পড়তেন। ওঁর মা আসতেন মঠে। যখন স্বামীজী মঠে থাকতেন, তখন নাকি মাঝে মাঝে আসতেন।

মহারাজ : এসে বলতেন—বিলু কোথায় গেছে?

—ডাকতে ডাকতে ওপরে উঠে যেতেন। তখন স্বামীজী নিজেই নেমে আসতেন।

মহারাজ : তারপর বল, আর কী।

—আর কিছু নয়। এই কয়েকটি মাথার ভিতরে ছিল আর কী।

মহারাজ : তারপর মায়ের জন্য রাজা অজিত সিংহের সঙ্গে কথা বলে একটা মাসোহারা ঠিক করলেন।

—আর ওঁর দু-ভাই—দুজনেই বিয়ে করেননি। মহিমবাবু ও ভূপেনবাবু।

মহারাজ : তিনজনেই বিয়ে করেননি। (হাসি) কেউই বিয়ে করেননি।

—দু-ভাইকেই দেখেছেন? মহিমবাবুকে এবং ভূপেনবাবুকে? ভূপেনবাবু শরীর রেখেছেন ৬১-তে। খুব বেশিদিন আগে না।

মহারাজ : হ্যাঁ দেখেছি, মহিমবাবু গেরুয়া পরতেন।

—ঠাকুর নাকি বলেছিলেন। তোদের বংশ থাকবে না। তাই স্বামীজী একবার নাকি ভূপেনবাবুকে কিল মেরেছিলেন—তুই বিয়ে কর, বিয়ে কর। জোর করেছিলেন ঠাকুরের কথা আটকাবার জন্যে।

—ভূপেনবাবু বিয়ে করেননি। বংশই লোপ পেয়ে গেছে।

মহারাজ : দফা শেষ! (সকলের হাসি)

—দফা শেষ। আজকে এই পর্যন্ত থাক।

মহারাজ : থাক তাহলে।

॥ ১০০ ॥

প্রশ্ন : জ্ঞান হলে যদি দেহ না থাকে তাহলে আর জীবন্মুক্ত বলা হবে কেন?

মহারাজ : কে বলল জ্ঞান হয়নি?

—জ্ঞান হলে পরে দেহ থাকতে পারে না।

মহারাজ : কে বলেছে?

—এই তো আপনি বললেন, জ্ঞান হয়েছে আবার দেহ থাকবে—এ প্রশ্ন ওঠে না।

মহারাজ : 'দেহাত্মনাস্থিতি'। দেহকে আত্মা বলে মনে না করা—এই ভাবেতে অবস্থান করা। যখন মনে করে, তখন সেটা প্রারব্ধেতে অবস্থিতি হয়।

—দেহকে আত্মা বলে বোধ করেন না, উনি আত্মাকে আত্মা বলেই মনে করেন।

মহারাজ : আবার উলটো করে বলছ। দেহকে আত্মা বলে মনে করেন না—এই তো যথেষ্ট হল। আবার কী কথা?

—তাহলে তাঁর জ্ঞানটা কী জ্ঞান? আপনি বলছেন, জ্ঞান হয়—জ্ঞানটা কী জ্ঞান?

মহারাজ : দেহাদি আরোপশূন্য জ্ঞান।

—এটা তো নেতিভাবে বললেন। ইতিভাবে কী বলা হবে?

মহারাজ : ইতি?

—ইতিভাবে। তিনি যে-জ্ঞান লাভ করেন সেটা কিসের জ্ঞানলাভ করেন?

মহারাজ : দেহাত্মভাব চলে যায় তাঁর।

—দেহাত্মভাব চলে যায়। কিন্তু তিনি যে বেঁচে থাকবেন, তাঁর দেহাত্মভাব প্রয়োজন আছে তো?

মহারাজ : কী যে বলছ—দেহকে আত্মা বলে তিনি মনে করেন না।

—মনে করেন না। কিন্তু একটা মানুষ যখন বেঁচে আছে, শরীরটা আছে, সেখানে দেহের সাথে তাঁর একটা সম্পর্ক—একটা তো identification বা অভিমান আছে। না হলে দেহ বাঁচতে পারে না।

মহারাজ : এ আবার কোন্ দেশি কথা হল? দেহকে আত্মা বলে মনে করে না—এইটুকু ধারণা। দেহকে আত্মা বলে মনে করে না।

—না করলেও দেহবিস্মৃতি হয় না। দেহকে দেহ বলে মনে করবে। কিন্তু তা বলে দেহটা—দেহবাচ্য তো বটে—

মহারাজ : আরে, দেহাত্মনাস্থিতি—দেহকে আত্মা বলে মনে করা—এটা সে করে না। দেহকে আত্মা বলে অভিমান তার নেই।

—মহারাজ, দেহের অভিমান তো আছে—শুধু দেহ অভিমান।

মহারাজ : দেহ অভিমান—তাতে কী হল? দেহতে 'আত্মা'—এই অভিমান না থাকলেই হল।

—দেহটার সঙ্গে যদি তার অভিমান, তার নিজের যদি কোনরকম সম্পর্ক না থাকে—

মহারাজ : আরে 'দেহটা আমি'—এই অভিমান তো তার নেই। সে-জায়গায় দেহটা আছে—কার দেহটা আছে?

—দেহটা যদি কারো—দেহ যদি না থাকে, এমন কোন জীবন্মুক্ত পুরুষ কি আছেন যাঁর দেহের সঙ্গে অভিমান নেই, কিন্তু আবার দেহকে আত্মা বলে দেখছেন না—এরকম কোন দৃষ্টান্ত নেই, মহারাজ।

মহারাজ : দেহকে আত্মা বলে মনে করছে, এরকম কোন জ্ঞানীরও দৃষ্টান্ত নেই। (সকলের উচ্চ হাসি)

—নেই। কিন্তু আপনি যে বলেছেন, প্রারব্ধবশে থাকে না শরীরটা—এটারও দৃষ্টান্ত নেই।

মহারাজ : কে দৃষ্টান্ত বলছে—তারা প্রারব্ধ মানেই না।

—প্রারব্ধ মানে না। কিন্তু শঙ্করাচার্য তাঁর ভাষ্যতে বহু জায়গায় বলেছেন, প্রারব্ধটা থাকে।

মহারাজ : শঙ্কর বহু জায়গাতে বলছেন—কার দৃষ্টিতে থাকে? জ্ঞানীর দৃষ্টিতে, না তোমার দৃষ্টিতে?

—আমাদের দৃষ্টিতে থাকে বলছি না। ঠাকুর যখন খাচ্ছেন, রাখালকে বকছেন, আর বলছেন—আমি লুচি খাব না। এই কথাগুলো যে বলছেন, সেগুলি কি আমরা শুধু ভুল করে দেখছি? না তিনি সত্যি এইগুলি বোধ করছেন?

মহারাজ : তিনি বোধ করছেন না।

—তিনি বোধ করছেন না?

মহারাজ : না।

—কিন্তু কান্নাকাটি করছেন পর্যন্ত। সেটাও বোধ করছেন না বলছেন?

মহারাজ : সবই প্রারব্ধ থেকে পৃথক হয়। প্রারব্ধ নিয়ে কথা নয়। প্রারব্ধ কী? জ্ঞান নিত্য। জ্ঞান উৎপন্ন হলে তখন প্রারব্ধ হয়। জ্ঞান উৎপন্নই হয় না। নিত্য জ্ঞান।

—আর প্রারব্ধ প্রারব্ধ বলে যে এত বলছেন—প্রারব্ধ তো থাকেই না, তাহলে আর কী করে ব্যবহার করছেন—এ তো পরস্পর দ্বন্দ্ব!

মহারাজ : তোমাদের দৃষ্টিতে। দ্বন্দ্ব তোমাদের দৃষ্টিতে।

—আমাদের দৃষ্টিতে কোথায়? তাঁরাই বলছেন—আমি এরকম বোধ করছি, সেটা কি স্বীকার করব না, তাঁর কথাটা?

মহারাজ : সে বলে না যে, আমি বোধ করছি।

—ঠাকুর বলছেন কত করে—

মহারাজ : ঠাকুর কার দৃষ্টি দিয়ে বলছেন, সেটা এখন ভাববার কথা।

—তাহলে এই যে তাঁর কথাগুলিকে সত্য বলি, শাস্ত্র বলে আমরা গ্রহণ করি—সেটা তো মিথ্যা হয়ে যাবে।

মহারাজ : আমরা গ্রহণ করছি তো। এইখানেই তো গোলমাল করছি।

—আমরাই গ্রহণ করছি—

মহারাজ : আমরাই গ্রহণ করছি, কাজেই আমাদের দৃষ্টিতে তাঁর প্রারব্ধ আছে।

—আমরা গ্রহণ করছি।

মহারাজ : হ্যাঁ।

—তিনিও বলছেন, আমি এইরকম বোধ করছি।

মহারাজ : তিনি বোধ করলেন, তোমাদের কাছে বলেছেন! (সকলের হাসি)

—তাহলে মহারাজ, সত্যস্বরূপ ভগবানের ওপরে মিথ্যাচার হয়ে যাবে।

মহারাজ : ভগবানের আচার—কার সঙ্গে আচার?

—আচার মাত্রই মিথ্যা।

মহারাজ : আমি তোমার কাছে জানতে চাইছি; তুমি কী বিষয়টা বলছ, সেটা বল। (সকলের হাসি)

—সেই তো বলছি। প্রারব্ধ জ্ঞানীর অধীনে, না জ্ঞানী প্রারব্ধের অধীনে?

মহারাজ : জ্ঞানীর সঙ্গে প্রারব্ধের কোন সম্বন্ধ নেই—এই।

—জ্ঞানীর সঙ্গে প্রারব্ধের কোন সম্বন্ধ নেই?

মহারাজ : না।

—তাহলে শঙ্করাচার্য বারবার যে বলছেন—জ্ঞানীর সঞ্চিত কর্ম, আগামী কর্ম ভস্মসাৎ হয়ে যায়—

মহারাজ : এ, যে-দৃষ্টি তার। যার হয়ে যায়, তার দৃষ্টিতে নয়।

—আচার্য শঙ্কর তো জ্ঞানী ছিলেন?

মহারাজ : আরে, আচার্য শঙ্কর জ্ঞানী ছিলেন, তাঁর জ্ঞান হয়েছিল—এ-কথা তোমার দৃষ্টিতে।

—মহারাজ আমার দৃষ্টিতে নয়। তিনি বলছেন বলে আমরা স্বীকার করছি। প্রারব্ধ ছাড়া অন্য কর্ম যে ভস্মসাৎ হয়—সেটা তো জ্ঞানীর সম্পর্কেই বলছেন।

মহারাজ : কার দৃষ্টিতে?

—এটাই তো কথা। জ্ঞানীর সম্পর্কে বলছেন, কিন্তু—

মহারাজ : দৃষ্টিটা কার?

—যিনি বলছেন, তিনি তো জ্ঞানী। অজ্ঞানীর জন্য বললেও যিনি বলছেন, তিনি জ্ঞানী ও জ্ঞানীর সম্পর্কেই বলছেন। আমাদের প্রশ্নটা এখানেই মহারাজ। অজ্ঞানীর জন্য বলছেন; আমরা দেখছি যে, তাঁর দেহ রয়েছে, তাঁর কর্ম রয়েছে—

মহারাজ : এটা বল যে, আমরা দেখছি জ্ঞান হয়েছে। এটা আমাদের ভ্রান্ত দৃষ্টি।

—তাহলে তার জ্ঞান হয়েছে, একথা আমরা বলব না?

মহারাজ : কারো জ্ঞান হয়েছে—একথা বলো না।

"ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্নবদ্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষুর্নবৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা।।"

(মাণ্ডূক্য কারিকা, ২।৩২)

—তাহলে জীবন্মুক্তির প্রসঙ্গ আসবে কেন মহারাজ? যদি—

মহারাজ : তোমাদের জন্যই আসছে।

—আমাদের জন্যই আসছে, যার জ্ঞান হয়েছে, তার প্রসঙ্গে তো—

মহারাজ : না।

—তাহলে?

মহারাজ : তার প্রসঙ্গ কে করছে?

—সেটাই তো আমরা বুঝতে পারছি না।

মহারাজ : তার প্রসঙ্গ করছে কে? তুমি করছ। তা, তোমার দৃষ্টিতে জ্ঞান হয়েছে এবং জ্ঞানীর প্রারব্ধও আছে।

—জ্ঞান হলে আমরা জানি যে, অজ্ঞান এবং অবিদ্যা, শরীর, মন—সমস্ত কিছুই লয় পায়, কিন্তু এক্ষেত্রে লয় পাচ্ছে না বলেই তো এ-প্রশ্নটা আসছে যে, দেহ থাকছে, শরীর থাকছে—

মহারাজ : তার জন্য থাকছে না।

—তাহলে তিনি কী অবলম্বন করে থাকছেন?

মহারাজ : তিনি আবার কী অবলম্বন করে থাকছেন!

—আছেন তো? যখন আছেন তখন অজ্ঞানই বলব, তাহলে জ্ঞানী বলার প্রসঙ্গ আসছে না।

মহারাজ : তাঁর জ্ঞান হয়নি। একথাটা তুমি হাজারবার স্বীকার কর—জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না।

—কিন্তু তাঁর অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়েছে—একথা বলব না?

মহারাজ : এ তুমি বলবে। (সকলের হাসি) এ-দৃষ্টিটা দুটি ভিন্ন দৃষ্টি—জ্ঞানীর দৃষ্টি আর অজ্ঞানীর দৃষ্টি। তোমার দৃষ্টিতে জ্ঞানীর প্রারব্ধ আছে। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে জ্ঞানীর প্রারব্ধ নেই।

—ঠিক। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে, যখন স্বামীজী, কী ঠাকুর, কী শঙ্করাচার্য বলছেন—জ্ঞানী হিসাবে তো তাঁরা কথা বলছেন। শঙ্করাচার্য ভাষ্যতে যখন বলছেন, তখন তিনি কি জ্ঞানী হিসাবে জ্ঞানীর ব্যবহারটা বলছেন না?

মহারাজ : না।

—এটা আমরা বুঝতে চাই।

মহারাজ : না, করছেন না। মহাপুরুষ মহারাজ বলছেন—জন্মই হয়নি, তার আবার জন্মদিন কী!

—এটা তাঁর দৃষ্টি। এটা বোঝা যায়।

মহারাজ : এ-ই। এ-ই। (সকলের হাসি)

—মহারাজ, আজ এখানেই থাক।

মহারাজ : এরকম করে কুকুরের ন্যাজ কোনদিন ধরতে পারবে না। (সকলের হাসি)

—কুকুরের লেজ ধরাও যাবে না, সোজাও হবে না, মহারাজ।

মহারাজ : তা কী করে হবে! তুমি যে এখন ধরতে যাচ্ছ। কাজেই তোমার পক্ষে সোজা হবে না।

—ধরাই আছে, ভাবতে হবে।

মহারাজ : হ্যাঁ। জ্ঞান নিত্য, অনিত্য নয়। জ্ঞান উৎপন্ন হয় না।

—তাহলে প্রচেষ্টার কী আছে? অজ্ঞান নিবৃত্তির প্রচেষ্টাও তো থাকবে না। এটা যদি আগে আমরা ধরে নিই?

মহারাজ : তুমি অজ্ঞান, তোমাকে জ্ঞানী হতে হবে। যেই জ্ঞানী হলে, তখন বলবে—'আমি কোনদিন অজ্ঞানী ছিলাম না।' এই তো সোজা কথা।

—সবই সোজা, মহারাজ। কিন্তু বলতে গেলেই যত গোলমাল। আজ এই পর্যন্ত থাক, মহারাজ। অনেকক্ষণ ধরে কথা হল। আপনারও কষ্ট হচ্ছে।

মহারাজ : আমার কথার ভেতরে কোন গোলমাল নেই।

—না। বলাটায় গোলমাল আছে।

মহারাজ : তোমাদের কথার ভেতরে গোলমাল আছে।

—হ্যাঁ।

মহারাজ : এই তো। হ্যাঁ বলছ, তা আবার তর্ক করছ? (সকলের হাসি)

—গোলমাল আছে বলেই তো জিজ্ঞাসা করছি।

মহারাজ : না, আমি বলছি কার প্রারব্ধ? জ্ঞানীর প্রারব্ধ? না। অজ্ঞানীর প্রারব্ধ? না।

—থাক, মহারাজ। ধামাচাপা রইল।

মহারাজ : ঐ ধামা আর কেউ খুলতে পারবে না।

—হ্যাঁ। খোলা যায়। ধামাটা খোলা যায়। অতটা দুর্বল আমরা নই।

মহারাজ : তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই—তোমাদের দৃষ্টিতে অজ্ঞান আছে।

—আছে।

মহারাজ : তোমাদের দৃষ্টিতে জ্ঞানী আছে।

—আছে।

মহারাজ : তোমাদের দৃষ্টিতে জ্ঞানের উৎপত্তি আছে।

—আছে।

মহারাজ : তোমাদের দৃষ্টিতে প্রারব্ধ আছে।

—আছে। এখন আমরা আসি।

মহারাজ : হয়ে গেল।

—প্রণাম হয়নি। প্রণাম করিনি।

॥ ১০১ ॥

প্রশ্ন : ছেলে ভিখারিকে এক কুনকে চাল পর্যন্ত দিতে পারে। রেল-ভাড়া যদি দিতে হয় তো কর্তাকে জানাতে হয়। এই কুনকে কি কোন মাপ?

মহারাজ : কুনকে মানে এক রেকের চার ভাগের এক ভাগ।

—ও আচ্ছা। রেক তো বলেছিলেন পাঁচ পো?

মহারাজ : হ্যাঁ।

—এক রেকের চার ভাগের এক ভাগ। এক কুনকে মানে একটা মাপ।

মহারাজ : এক কৌটো।

প্রশ্ন : মহারাজ, স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, অন্তর্জগৎ—যা বাস্তবিক সত্য, তা বহির্জগতের চেয়ে অনন্তগুণে বড়। বহির্জগৎটা সেই সত্য অন্তর্জগতের ছায়া মাত্র, প্রক্ষেপ মাত্র। এই জগৎটা সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়। এটা সত্যের ছায়া মাত্র। এখন প্রশ্নটা হচ্ছে মহারাজ, অন্তর্জগৎ, যা বাস্তবিক সত্য, তা বহির্জগতের চেয়ে অনন্তগুণে বড়—এটা কী অর্থে, কিভাবে একটু বলুন মহারাজ।

মহারাজ : "যাবান্ বহিরাকাশ তাবান্ অন্তরাকাশ।"

—এ তো সমান হল তাহলে। কিন্তু অনন্তগুণে বড়—

মহারাজ : এ তো মুশকিল।

—হুঁ। Inspired Talks-এ স্বামীজীর ছোট ছোট কথায় এরকম অনেক আছে। একটু বুঝলে ভাল হয় আমাদের।

মহারাজ : অন্তরাকাশ বহিরাকাশের চেয়ে অনন্তগুণে বড়। বহিরাকাশ ইন্দ্রিয়ের সীমার ভিতরে। আর অন্তরাকাশ ইন্দ্রিয়ের সীমার বাইরে।

—এটার একটা মালুম পাওয়া গেল। কিন্তু সেটা তো মনেরই অধীন। মনটা?

মহারাজ : মনের অধীন তো বটেই। বহিরাকাশটাও মনের অধীন। অন্তরাকাশটাও মনের অধীন।

—কিন্তু অনন্তগুণে বড় কী দৃষ্টিতে?

মহারাজ : এইজন্য যে, বহিরাকাশকে যতটা জানা যায়, অন্তরাকাশকে তার চেয়ে বেশি কল্পনা করা যায়।

—কল্পনা করা যায়?

মহারাজ : হ্যাঁ।

—ও। তার পরের লাইনটায় এই রকম আছে, কবি বলেছেন—"কল্পনা সত্যের সোনালি ছায়া।" পরের লাইনে কল্পনার কথাটাও এসেছে—"আর এই জগৎটা সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়, এটা সত্যের ছায়া মাত্র।" এটা একটু বলুন।

মহারাজ : জগৎটা সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়।

—কী দৃষ্টিতে?

মহারাজ : সত্য হলে বাধিত হতো না। মিথ্যা হলে তার প্রতীতি হতো না।

—থাকত। হ্যাঁ।

মহারাজ : এই।

—কিন্তু ঐ ছায়ামাত্র বলছেন?

মহারাজ : ছায়ামাত্র এইজন্য যে, অন্তর্জগৎ দিয়ে তো অনুভব হচ্ছে। সেই অন্তর্জগতের ছায়া হচ্ছে। অন্তর্জগৎ বাদ দিলে বহির্জগতের অনুভবই হবে না।

—না। সত্যের ছায়া মাত্র। জগৎটা সত্যের ছায়া মাত্র। সেটা সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়। ঐজন্য সত্যের ছায়া মাত্র।

মহারাজ : সত্য হল ব্রহ্ম। তার ছায়া। তার ছায়া মানে তাতে আরোপিত।

—ব্রহ্মে আরোপিত বা অধ্যস্ত, সেটাই মহারাজ?

মহারাজ : ব্রহ্মের ওপরে আরোপিত। এইজন্য ছায়ামাত্র।

—কিন্তু ছায়াও তো সত্য কায়ার ওপরে নির্ভর করে। তাহলে জগৎটাও সত্য বলতে হবে তো?

মহারাজ : অ্যাঁ?

—ছায়া তো কায়ার ওপরে নির্ভর করে সত্য হল।

মহারাজ : কার ওপরে?

—কায়া। যেটা অধিষ্ঠান। কায়া সত্য বলেই তো ছায়া সত্য। সেদিক থেকে—

মহারাজ : তা তো বটেই।

—সেইজন্য জগৎটাও তো তাহলে সত্য হয়ে যায়। কিন্তু তার আগে—

মহারাজ : জগৎটা সত্য মানে, আগে তো বলেছি ছায়ামাত্র। সত্য হল ব্রহ্ম, তার ছায়ামাত্র।

—আমাদের তো মনে হয়, ছায়া এবং কায়া দুটো একটাই তো।

মহারাজ : তোমাদের মনে হলেই সেটা ঠিক হবে?

—কায়ারই তো ছায়া। কায়া—অধিষ্ঠান সত্য বলে তার ছায়াটা কি মিথ্যা হবে?

মহারাজ : কায়াই ছায়া—এ নয়। কায়া ছাড়া ছায়া থাকে না। ছায়া কায়া ছাড়া থাকতে পারে না।

—ঠিক আছে, মহারাজ। আরেক জায়গায় স্বামীজী বলেছেন : "যখনই কোন সুখ ভোগ করবে, তারপর দুঃখ আসবেই। এই দুঃখ তখন তখনই আসতে পারে, অথবা খুব বিলম্বেও আসতে পারে। যে-আত্মা যত উন্নত, তার সুখের পর দুঃখ তত শীঘ্র আসবে।" মহারাজ, এই লাইনটা একটু বলুন : "যে-আত্মা যত উন্নত তার সুখের পর দুঃখ তত শীঘ্র আসবে।"

মহারাজ : "যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়।" স্বামীজীর 'সখার প্রতি' কবিতায় আছে।

প্রশ্ন : একটা মত আছে—সমষ্টি মুক্তির কথা। সকলের মুক্তি যতক্ষণ না হচ্ছে, ততক্ষণ আলাদাভাবে জীবন্মুক্তি হচ্ছে না। তা এই যে mass হিসাবে বা সমষ্টিগতভাবে আমরা যে সমস্তকিছুতে যোগদান করি—তাতে কি আমাদের ব্যক্তিগতভাবে লাভ হয় না?

মহারাজ : সাধনা ব্যক্তি-সাপেক্ষ। যে যেমন ব্যক্তি তার সেইরকম সাধনা এবং তার সেইরকম ফল। কাজেই একরকম তো সকলের হবে না।

—কিন্তু আমাদের এই যে একসঙ্গে চলার ব্যাপারটা, regimentation যাকে বলছি—তা এটা তো আমাদের ব্যক্তিজীবনকে সাহায্য করবার জন্যই।

মহারাজ : তা, সাহায্য যদি আমরা না নিই, তাহলে কে করবে? সাহায্য নিতে হবে তো! তাকে কাজে লাগাতে হবে তো! কাজেই কে কতটা কাজে লাগাতে পারে, সেটা সেই ব্যক্তির ওপর নির্ভর করে। কাজে না লাগাতে পারলে আসবে, যাবে। তা না হলে ভক্তিশাস্ত্রে—উৎসব একটা ভক্তির অঙ্গ। জপ-ধ্যানটা স্থায়ী। উৎসবটা সাময়িক হয়। কিন্তু তার ছাপটা থেকে যায়।

—ছাপ থেকে যায়। কিন্তু আমাদের মনে উৎসবের সময় আনন্দ যেটা অনুভূত হয়, পরে তো আবার খারাপও লাগে। সেই বোধটাও আবার হয় যে, উৎসব চলে গেল, মনটা ভারাক্রান্ত। তাই আর আনন্দটা স্থায়ী হয় না।

মহারাজ : ওটা কথা নয়। কথা হচ্ছে, আনন্দ যেটা হল—সেটাকে নিয়ে জাবর কাটতে হয়। জাবর যদি কেউ না কাটে তাহলে কী করে হবে?

—সেটাও ব্যক্তি-সাপেক্ষ। নিজেকেই করতে হয়।

মহারাজ : হুঁ। আর কারো কিছু আছে?

—জাবর কাটছে সবাই।

মহারাজ : তা তো কাটছে।

প্রশ্ন : মহারাজ, শুনতে পাচ্ছেন, মহারাজ?

মহারাজ : অত কাছে হবে না। দূর থেকে বল।

—ঠিক আছে। মহারাজ, আপনি একদিন বলেছিলেন, অবতার মায়াধীশ। আর জীব মায়াধীন। তাহলে যে বলে—'পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে'; ওখানে কি জীবের কথা বলছে? ব্রহ্ম মানে কি জীব?

মহারাজ : ওটা দেখাবার জন্য। মায়ার শক্তি দেখাবার জন্য। তা না হলে যাঁর শক্তি—যে শক্তিমান, সে মায়াকে বশ করেই চলে। আর মায়া তাঁর অধীন। এই হল শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত। ঠাকুর যে বলেছেন—সকলেই মায়ার অন্ডারে; তার কারণ হচ্ছে, মায়াকে আশ্রয় না করে অবতার হতে পারে না। ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে বলে, তাহলে তো ব্রহ্ম সাধারণ লোকের মতোই হতেন। তা তো নয়।

—আপনি একদিন আমাদের বলেছিলেন, অবতারের মধ্যে দুটো ভাব আছে—ভক্ত আর ভগবান।

মহারাজ : এটা তো ঠাকুর বলেছেন।

—না, এখানে আমরা ব্রহ্ম মানে কি জীব ধরতে পারি? ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে। ব্রহ্ম মানে কি জীবের কথা বলছেন?

মহারাজ : ব্রহ্ম জীবভাব আশ্রয় করে কাঁদে। ইচ্ছা করলেই ঐ ভাব পরিত্যাগ করতে পারে।

—তখন ঐ ভাব থাকছে না।

মহারাজ : তাহলে লীলা হয় না। লীলা হতে হলে—কিছু অপূর্ণতাকে স্বীকার করে নিয়ে তবে লীলা হয়। যিনি সর্বব্যাপী, একমাত্র তিনিই আছেন, তিনি কাকে নিয়ে লীলা করবেন?

মহারাজ : কী হল, কথা হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ। নেমন্তন্ন না করলে কী করে যাব?

মহারাজ : নেমন্তন্ন আবার আলাদা করে করতে হবে নাকি?

—আপনার পর থেকে বন্ধ হয়ে গেছে।

মহারাজ : গোকুলানন্দ, তুমি ফিরে আসবে তো?

—আজকে ওখান থেকে চলে যাব—যোগোদ্যান থেকে। আপনাকে নেওয়ার তো ইচ্ছে হয় দিল্লিতে, কিন্তু সাহস হয় না মোটে।

মহারাজ : আরে, নেওয়ার কথা বলছি না তোমাকে। আসবার কথা বলছি। (সকলের হাসি)

—মহারাজ, ওখানে ভাণ্ডারা খেয়ে অনেকে সেখান থেকেই চলে যাচ্ছে।

মহারাজ : আমাকে নেমন্তন্ন করা হয়েছে বলে তো জানি না।

—জানেন না, মানে হয়নি। হলে বলতেন—

মহারাজ : আরে বলতেন বলছ? এখন তো আমি back number। (সকলের হাসি) এখন সকলেই বলে, আপনার তো শরীর খারাপ। (সকলের হাসি) শিখিয়ে দিতে হবে না। এতদিন মোহন্তগিরি করেছে। বলে—'আপনাকে তো বলতে পারলাম না।' জানে, আমাকে নিলে অনেক হ্যাঙ্গাম পোহাতে হবে।

—আপনাকে কে না চায়, মহারাজ। সব সাধু, ব্রহ্মচারী—সব centre-এ সবাই চায়।

মহারাজ : তবে গোকুলানন্দ এই অবস্থাতে বলেছে—মহারাজ, তা একবার যেতে পারবেন?

—চায়, সবাই চায়। ভক্তরা পর্যন্ত।

মহারাজ : ভক্তরা চাইলে কী হবে, যাদের ভক্ত তারাই চায় না! (হাসি)

—গতবারে যখন গিয়েছিলেন, অনেক রকম সব item করেছিল। সবাই বলছেন, বহু item হয়েছিল। শুনলাম সব আমরা।

মহারাজ : না, আগে থেকে না বললে তো যাওয়া যায় না। (সকলের হাসি)

—মহারাজ, বাস ছাড়বে; মহারাজ, বাস ছাড়বে—

মহারাজ : যাও, যাও—নতুবা কেলেঙ্কারি হবে। (সকলের হাসি)

—মহারাজ, আপনি গেলেও ভাল হতো—এই বলে আমরা যাচ্ছি।

মহারাজ : ও, আমি গেলেও ভাল হত!

—তার মানে আপনাকে নিয়ে যাবে না। এইটাই বলছে।

মহারাজ : "বামুন বাদল বান, দক্ষিণা পেলেই যান।" দক্ষিণা হাওয়া বইলে বাদল চলে যায়, বানও চলে যায়। কিন্তু বামুন যাওয়ার পাত্র নয়। দক্ষিণা না নিয়ে যান না। (সকলের হাসি)

মহারাজ : ভাল কথা একটাও হল না। কালকে কিছু ভাল কথা হয়েছিল।

—আমাদের সবরকমই কথা হয় মহারাজ। ভাল কথা হয়। খারাপ কথা নয়। আমাদের আশ্রমের কথাই হচ্ছে মহারাজ।

মহারাজ : আচ্ছা তোমরা জান কালার গল্প? একটা আশ্রমের পাঁচ কালার গল্প জান?

—বলুন মহারাজ।

মহারাজ : একজন ভদ্রলোক অধ্যক্ষ মহারাজকে চিঠি দিয়েছেন, তিনি আলাদাভাবে দেখা করতে এবং কিছু আর্থিক সাহায্য দিতে চান। অধ্যক্ষ মহারাজ তাঁর যাতে কোন অসুবিধা না হয় তার সব ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু ভদ্রলোক সবার অপরিচিত। অধ্যক্ষ মহারাজ প্রথমে দারোয়ানকে বলেছেন : "অমুক দিন একজন ভদ্রলোক আসবেন, উনি এলে আমার আফিসে বসাবে।" দারোয়ান সঙ্গে সঙ্গে বলল : "জী মহারাজ।" পরে অফিসে ক্যাশিয়ার মহারাজকেও ঐ একই কথা বলে রেখেছেন। সেদিন একাদশী বলে ভাণ্ডারী মহারাজকে ভদ্রলোকের খাওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা করতে বলেছেন। ভদ্রলোক দুপুরে এসেছেন, তখন অফিস বন্ধ হয়ে গেছে, সাধুদের প্রথম পঙ্ক্তি হয়ে গেছে। দ্বিতীয়বারে আহারের সময় একাদশীতে যা যা খাওয়ার তাই ঐ ভদ্রলোককে দিয়েছেন। খেয়ে তিনি অতিথিনিবাসে বিশ্রাম করতে গিয়েছেন। বিকালে অধ্যক্ষ মহারাজ ভদ্রলোককে ডেকে পাঠান এবং সব খোঁজখবর নেন। অধ্যক্ষ মহারাজ জিজ্ঞাসা করেন : "খাওয়া ভাল হয়েছে তো?" "হ্যাঁ, ভাণ্ডারী মহারাজ যা দিয়েছেন, তাই আমি খেয়েছি।" "কী কী দিয়েছেন?"—জিজ্ঞেস করলেন অধ্যক্ষ মহারাজ। বিনয়ের সঙ্গে ভদ্রলোক বললেন : "সবই দিয়েছে—সাবু-ভেজা, একটা ফল ও এককাপ দুধ।" এই কথা শুনে অধ্যক্ষ মহারাজ ভাণ্ডারী মহারাজকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন : "কী বিশেষ ব্যবস্থা করেছ?" ভাণ্ডারী মহারাজ বললেন : "আপনি যেমন বলেছেন তাই দিয়েছি।" অধ্যক্ষ মহারাজ ভদ্রলোককে বললেন : "আপনি কিছু মনে করবেন না, ভাণ্ডারী মহারাজ একটু কানে কম শোনেন।" এরপর অধ্যক্ষ মহারাজ ক্যাশিয়ার মহারাজকে বললেন :

"এঁর দেওয়া টাকা General Fund-এ যাবে।" পরে দেখা গেল, সাধুসেবার জন্য রসিদ কাটা হয়েছে। অধ্যক্ষ মহারাজ ভদ্রলোককে বললেন : "আপনি কিছু মনে করবেন না, ক্যাশিয়ার মহারাজও কানে একটু কম শোনেন।" এইভাবে দারোয়ান ও অতিথিনিবাসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীও—অধ্যক্ষ মহারাজ যা যা বলেছেন শুনতে ভুল করেছে। সবশেষে অধ্যক্ষ মহারাজ ভদ্রলোককে বললেন : "আপনি কিছু মনে করবেন না, দেখুন, আমিও কানে কম শুনি।" (সকলের হাসি)

—মহারাজ, আজকে এই পর্যন্ত থাক।

মহারাজ : এসো।

—আবার এসো বলছেন? তা আমরা এতজন মিলে এলে আপনি জায়গা দিতে পারবেন না।

মহারাজ : যাও—বলতে গেলে খুব রূঢ় হয়।

—এটাই অর্থ আর কী।

প্রশ্ন : মহারাজ, মঠে যখন ইন্দিরা গান্ধি এসেছিলেন—তখন আপনি ব্রহ্মচারীদের পড়াচ্ছিলেন—

মহারাজ : মনে পড়েছে। ইন্দিরা গান্ধি এসেছেন visit করতে। আমার ক্লাস হচ্ছে। পড়ুয়ারা একটু উসখুস করছে। তা আমি বুঝতে পারলাম। আমি বললাম—যাদের বেদান্ত পড়তে হবে, তারা থাক। যাদের ইন্দিরা গান্ধিকে দেখতে হবে, তারা যাও। (সকলের হাসি)

—তারপর কী হল?

মহারাজ : (হাসতে হাসতে) তারপর আর কিছু করল না।

—আপনি এমন কড়া করে বলে দিলেন?

মহারাজ : না, না। আমি তো সোজা বলেছি। (সকলের হাসি) দেখলাম তারা উসখুস করছে একটু। কাজেই আমি তাদের প্রেসার দিইনি।

প্রশ্ন : মহারাজ, আপনি আমাদের ঈশোপনিষদ্ পড়াতেন। সেদিন বেদান্তের খুব high thought ছিল। আমাদের আর হজম হচ্ছিল না। তারপর মনে হল—যাক, বইটা লুকিয়ে ফেলি। আপনি দেখলেন, বই নেই। আমরা

বসে আছি। আপনি বললেন : "বইটা তোমরা নিয়েছ? বইটা তাহলে কোথায়?"—না, না। মহারাজ, আমরা খাতা নিয়ে এসেছি। তখন আপনি বললেন : "আচ্ছা, দেখি কতটা আমার মনে আছে।" (সকলের হাসি) তারপর সেই যে আরম্ভ করলেন সমস্ত বিকালটা পুরো ঈশোপনিষদ্ পড়ালেন। তখন বুঝলাম আর বই লুকিয়ে রাখা চলবে না। (সকলের হাসি)

মহারাজ : স— এর মা এসেছে। তা আমি বললাম—আপনার দুটি ছেলেই তো সাধু হয়েছে। তা ওরা কী ছেলেবেলা থেকেই এরকম দুষ্টু ছিল? তা মা বলছে—আপনি দেখছি ওদের ঠিক চিনে ফেলেছেন? (সকলের হাসি)

—মহারাজ, আসব?

মহারাজ : আসন আছে, যাওন নাই। আসন আছে, যাওন নাই।

—মহারাজ, কা— মহারাজ ঢাকা থেকে এসেছেন। আগরতলা থাকতে ওদেশের ভাষা খুব ভাল শিখেছিলেন।

মহারাজ : একজন West Bengal-এর লোক ওখানে চাকরি করত—গুজরাটে। তা নিয়ম হচ্ছে যে, বাইরে লোক চাকরি করতে এলে, অফিসার যারা তাদের কাছে একটা পরীক্ষা দিতে হয়। তা সে written test-এ পাশ করে গেল। তারপরে viva voce দিতে হবে। তা একজন মেয়ে অফিসার—viva officer—বলছে, আইপায় আহে? আইপায় আহে? বুঝতে পারছে না, আইপায়টা আবার কী? ভাবছে আয়ব্যয় হবে। তা বলে—হল পলে বাহে। হল পলে বাহে।—মানে, অল্প অল্প আছে। অফিসার হাসছে। বলছে, তুমি তো কিছুই জান না। (হাসি) আইপায় মানে বাপ-মা। বাপ-মা আছে? আইপায় আহে। (সকলের হাসি)

॥ ১০২॥

প্রশ্ন : চৈতন্যের ওপর আধারিত শক্তি, মানে আধার-আধেয় সম্বন্ধ—তাই তো? মানে শক্তি চৈতন্যের ওপর নির্ভর করে।

মহারাজ : তা তো করেই।

—এখানে আলাদা স্বরূপ নেই?

মহারাজ : স্বরূপ আবার আলাদা? এ কী করে হবে?

—তবে ব্রহ্ম বলছেন, চৈতন্য বলছেন যাকে—আর শক্তি, এদের স্বরূপ তো অভিন্ন মহারাজ। ঠাকুর যেমন বলছেন, ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ।

মহারাজ : অভেদ মানে, রজ্জু-সর্প যেমন অভেদ। রজ্জু অতিরিক্ত সাপের কোন সত্তা নেই। সেরকম শিব অতিরিক্ত শক্তির সত্তা নেই।

—ঠাকুর যেমন উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছেন, অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তি—একটা ভাবলে আরেকটা ভাবতে হয়। মানে এরা স্বরূপত অভিন্ন। কিন্তু যখন আমরা দেখছি, তখন ভিন্ন দেখছি। রজ্জু-সর্প স্বরূপত অভিন্ন।

মহারাজ : আমরা দেখছি—কথার মানেটা কী? দ্রষ্টা আর দৃশ্য—শক্তি দৃশ্য, আর শিব হলেন দ্রষ্টা।

—আর শিবই যখন অজ্ঞানে আবদ্ধ হয়ে জীবরূপে এই জগৎটাকে দেখতে যান—শিবই যখন আবার জীব হন—

মহারাজ : তা কখনো হয়?

—হয় না বলেই, কিন্তু আমরা অনুভব করছি। তাই বলছেন যে—পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব।

মহারাজ : এ তো আবার অন্যদিকে চলে গেল।

—আচ্ছা। এটার উত্তর আমরা পেলাম। আরেকটা হল যে, মা কালী জিভ কেটে আছেন। মায়ের জিভ কাটা—এটা কী?

মহারাজ : ওটা, জিভ কাটা করেছে। ভয়ে ভয়ে করেছে।

—কার ভয়ে কে করল?

মহারাজ : না। এমনি লৌকিকভাবে না। শিব হলেন তাঁর স্বামী। স্বামীর ওপরে পা দিয়েছেন। সেই লজ্জায় জিভ বের করেছেন। আরেকটা মানে, জিভ কাটা নয়—লোলরসনা। রক্ত চুষছেন। দুদিকে রক্ত পড়ছে, তাই চুষছেন।

—শবরূপ শিব; বলা হয় শবরূপে শিব আছেন। শবরূপে—ওটা চৈতন্য কী করে হয়?

মহারাজ : শবরূপ মানে নিষ্ক্রিয়।

—নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ। তাকেই বলা হল শবরূপ। ঐ ভাবটা প্রকাশ করা হচ্ছে।

মহারাজ : শব যেমন নিষ্ক্রিয়—

—আরেকটা কথা হল মহারাজ, এই যে শিবের ওপর বাঁ পা দিলে এক রকম, ডান পা দিলে আরেক রকম। এটা কিরকম কথা মহারাজ?

মহারাজ : ও মানুষের লীলা দেখছে—বাম পা, ডান পা। তার আবার এটায় কী আসে যায়, সেটায় কী আসে যায়! আসল কথা হচ্ছে—বামা আর দক্ষিণা। তার থেকে বামাচার আর দক্ষিণাচার—তান্ত্রিক আচার।

—তান্ত্রিক আচারই সাধনার নাম। আচার—বামাচার, দক্ষিণাচার। আর মহারাজ, চণ্ডীতে বলা হয়েছে যে, দুর্গার ললাট থেকে মা কালীর আবির্ভাব ঘটল। এই মা কালী আর এই যে শ্যামা কালী বা দক্ষিণা কালীর পূজা হয়—এ কি একই কালী?

মহারাজ : একই কালী।

—ধ্যানমন্ত্র কী একই, মহারাজ? ধ্যানমন্ত্র আলাদা না? চামুণ্ডা দেবী বলা হয় ওখানে, দুর্গাপূজার সময় সন্ধিপূজাতে।

মহারাজ : কালীর ধ্যান একই। তো মুশকিল হচ্ছে, ভয়ঙ্কর মূর্তি ভাবতে ভয় পায় লোকে। সেইজন্য তাঁকে একটু হাসিমুখ করে দেয়। করালবদনা ঘোরা—এ ভাবতে কষ্ট হয়।

—তা, দক্ষিণাকালী বা বলে কেন, আর বামাকালীই বা বলা হয় কেন?

মহারাজ : দক্ষিণা মানে দানশীলা। বামা মানে সুন্দরী।

—ও, বামা মানে সুন্দরী!

মহারাজ : আরেকটা আছে, বাম মানে প্রতিকূল।

—হ্যাঁ। বাম মানে প্রতিকূল। আর শ্যামাকালী—

মহারাজ : কালো রং তাই।

—কালো রং বলে শ্যামাকালী।

—বামাকালী প্রতিকূল কেন, মহারাজ?

মহারাজ : প্রতিকূল রূপটা চিন্তা করে যখন, তখন তাকে বলে বামা।

—প্রতিকূল রূপ, তার মানে ভয়ঙ্করা রূপ?

মহারাজ : শ্যামা বলে কেন? আদর করে বলে শ্যামা। আর ভয় পেয়ে বলে কালী। আমরা বলি যে, অমুকের রঙটি কিরকম? সকলে বলে কালো। বাপ-মা বলে—শ্যামবর্ণ। (সকলের হাসি)

—বলছে, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। এই যে আমরা কালীর রূপের কথা বা ভয়ঙ্কর রূপ, কালো রূপ—এইসব শুনছি, কিন্তু যাঁরা কালীর সাধক, এই রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত এবং ঠাকুরের জীবনেও দেখি—তাঁরা তো মায়ের অন্য রূপ দেখেন। ভয়ঙ্করা রূপ নয়।

মহারাজ : "ওরূপ যে দেখেছে সেই মজেছে, অন্য রূপ লাগে না ভাল।"

—এই যে মুণ্ডমালা, মুণ্ড ধরে আছেন, অসি ধরে আছেন হাতে—

মহারাজ : সংহার মূর্তিতে। সংহার মূর্তি।

—কিন্তু ঠাকুর ঐরকম কখনোই বলছেন না যে, সংহার মূর্তি বা তাঁকে ঐরূপে ভজনা করা বা এইসব। বলছেন, তিনি চিন্ময়ী এবং তিনি আমার মা। এই পর্যন্তই সম্বন্ধ।

মহারাজ : মা যদি সংহারকারিণী হন, তা কী করবে?

—তবু হয়। কিন্তু যাঁরা এই কালীর সাধনায় সিদ্ধ, আমরা যদি তাঁদের জীবন দেখি—তাঁরা মা কালীকে দেখছেন অত্যন্ত আপনভাবে, কোন ঘোররূপে দেখছেন না বা বলছেন না।

মহারাজ : ঘোরও যদি আপনার হয়?

—তাহলে বলব বীর বটে!—

মহারাজ : বাঘের বাচ্চা?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

মহারাজ : সেই বাঘকে কী বলবে? ঘোররূপ বলবে? বাঘের বাচ্চা কি মা-বাঘকে ভয় পায়? না, তার কাছে নির্ভয় হয়? (সকলের হাসি)

—এ তো বড় কঠিন প্রশ্ন। সত্যিই তাই। আমি তাই বলছিলাম—মানে ঘোররূপটা যদি আপন হয়, তাহলে বলব—বীর বটে। সেও ঐরকম।

তাঁর কাছে ঘোর হবে না, মহারাজ। আপনই হবে। আমাদের কাছে ঘোর বলে মনে হয়, দূর বলে মনে হয়, কিন্তু সে বাঘের বাচ্চা।

মহারাজ : রেডিওতে একটা আলোচনায় এরকম বলছে, ব্যাখ্যা—তান্ত্রিক যে সাধনা, সেটা হচ্ছে নির্ভয় হওয়ার। ভয় থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সাধনা।

—ভয়রূপকে উপাসনা করে ভয়ের অতীতে যাওয়া যায়?

মহারাজ : ভয়ের?

—ভয়ের যে-রূপ, ভীষণা রূপ, সেই ভীষণা রূপকে পূজা করে—

মহারাজ : তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেলে আর ভয় কী?

—মহারাজ, স্বামীজীর কবিতায় আছে—

> "সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
> কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।"

উনি বলছেন, ভয়—সেটাকেই আপন বলে মেনে নিতে হবে। তখন আর সেটা ভয় বলে মনে হবে না। সেটাই ভয়কে জয় করা—এটাই বললাম।

মহারাজ : মৃত্যু যদি সত্য হয়, তাহলে মৃত্যুকে ভয় করবে কেন?

—মৃত্যু যদি সত্য হয়, তার ধর্মটা কি পালটে যাবে?

মহারাজ : ভয় মানে কী? যাকে আমরা চাই না, তাকে বলি ভয়।

—হ্যাঁ। তা তো বটেই। মৃত্যুটাকে আমরা ভয় বলি মানি, মৃত্যুটাকে আমরা চাই না, আমরা বেঁচে থাকতে চাই।

মহারাজ : কিন্তু যারা অমর, তাদের তো মৃত্যুভয় নেই। কাজেই অভয় দিচ্ছেন মা। ভয় নেই, ভয় নেই।

—এটা একটা অদ্ভুত পথের সাধনা। যে ভয়রূপ—তাকেই পূজা করে ভয়ের অতীতে যাওয়া, নির্ভয় পদ লাভ করা।

মহারাজ : ভগবান যদি খালি মুরলীধর হন, তাহলে সংহার করবেন কে?

—সেটা আছে। কিন্তু আমরা তাঁকে উপাস্য হিসাবে সাধারণত গ্রহণ করতে পারি না।

মহারাজ : যদি তিনি সৃষ্টিরূপা হন, তাহলে মৃত্যুরূপাও তিনি।

—হুঁ, মানতে হয়।

মহারাজ : চণ্ডীতে রয়েছে—

"বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে॥"

(শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১।৭৬)

—এটাই ভাল। মাকে পূজা করা হচ্ছে ঐ অভয় পাওয়ার জন্য।

মহারাজ : পূর্ণরূপে জানবার জন্য। যিনি সংহার করছেন সে তিনি, যিনি সৃষ্টি করছেন সেও তিনি, আর যিনি পালন করছেন তাও তিনি।

—মহারাজ, আসছি।

মহারাজ : কালীর 'কাল' শব্দের মানে তো কালো নয়।

—কাল মানে তাহলে?

মহারাজ : কাল মানে যার থেকে সমস্ত ক্রিয়া চলছে—তাকে বলে কাল।

"যোঽয়ং কালস্তস্য তেঽব্যক্তবন্ধো! চেষ্টামাহুশ্চেষ্টতে যেন বিশ্বম্।
নিমেষাদির্ব্বৎসরান্তো মহীয়াংস্তং ত্বেশানং ক্ষেমধাম প্রপদ্যে॥"

(ভাগবত, ১০।৩।২৬)

অর্থাৎ, কালের পরিবর্তনে ব্রহ্মার পরমায়ু শেষ হলে ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চভূতে, পঞ্চভূত সূক্ষ্মভূতে, সূক্ষ্মভূত অহঙ্কারে, অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে এবং মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে লীন হয়ে গেলে একমাত্র আপনিই অপ্রাকৃত ধামে নানা মূর্তিতে লীলাময়রূপে বিরাজ করেন।

এই কাল বলে দিচ্ছেন। কাল মানে কী? ভগবানের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়—সেই যে তাঁর স্বরূপটি, তাকেই বলে কাল। কালকে ভগবানের লীলা বলে বলা হয়েছে।

—এখানে কালরূপ বলা হচ্ছে। শক্তির রূপ বলে। তাঁকে শক্তির রূপ বলে কালী বলা হয়। আসি মহারাজ।

॥ ১০৩ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, স্বামীজী একজায়গায় বলছেন, আমরা নিজেরাই প্রেমস্বরূপ। কিন্তু যখন এই প্রেম সম্বন্ধে চিন্তা করতে চাই, তখনি দেখি, আমাদের একটা কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। তাতেই প্রমাণ হয় যে, জড়বস্তু চিন্তারই বহিঃপ্রকাশ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে মহারাজ, জড়বস্তু কিভাবে আমাদের চিন্তারই বহিঃপ্রকাশ? মানে, আমাদের চিন্তার ফলেই কি জড়বস্তু রয়েছে? আমরা যদি চিন্তা না করি, কোন বস্তু নেই—সেটাই কি প্রমাণিত হয়?

মহারাজ : যখন বাইরে আমরা প্রকাশ করি—তখনি কোন একটা জড়-বস্তুকে আশ্রয় করে প্রকাশ করি। কাজেই জড়বস্তু ঐ চিন্তারই বহিঃপ্রকাশ। এই।

—না, চিন্তাই কি জড়বস্তুগুলোকে, মানে চিন্তার ওপর কি জড়বস্তুর অস্তিত্ব নির্ভর করছে? এটাই হচ্ছে প্রশ্ন।

মহারাজ : জড়বস্তু—হ্যাঁ। চিন্তার ওপর নির্ভর করছে। তা না করলে আমরা জড়বস্তুকে উপলব্ধি করতে পারি না।

—উপলব্ধি করতে পারি না, কিন্তু অস্তিত্বটা?

মহারাজ : আবার অস্তিত্ব! উপলব্ধি ছাড়া তার অস্তিত্ব কিরকম হয়?

—না, আমরা কোন জিনিস জানতে পারছি না বা বুঝতে পারছি না, কিন্তু তা বলে যে বস্তুটা নেই বা তার অস্তিত্ব নেই—তা বলা যাবে না।

মহারাজ : আছে তার প্রমাণ কী? 'অস্তিত্যেব উপলভ্যতে।' তা না হলে আছে যে তার প্রমাণ কী? যে-বস্তু কারও উপলব্ধির গোচর নয়, তা আছে বলে প্রমাণ নেই।

—আমি যদি চিন্তা না করি, তাহলে কি বস্তুটা নেই, জড়বস্তুটা নেই?

মহারাজ : যদি কেউ চিন্তা কোনকালে না করে তাহলে জড়বস্তু যে আছে তা প্রমাণিত হয় না।

—মহারাজ, একটা কথা মনে পড়ছে। এরকম একটা প্রশ্ন উঠেছিল, আর তার একটা পালটা প্রশ্নও হয়েছিল যে, একজন লোক ঘরে হিটারে একটা কেটলিতে জল বসিয়েছে, বসিয়ে দিয়ে বাইরে চলে গেছে। দশ

মিনিট পর ফিরে এসে দেখে, জলটা ফুটছে। এতক্ষণ সেই লোকটা কেটলির কথা ভাবেনি, জলের কথাও ভাবেনি। তার চিন্তার মধ্যে ওগুলো ছিল না। এই দশ মিনিট আগেও জল ছিল না, হিটারও ছিল না। কিন্তু দশ মিনিট পরে এসে দেখছে—জলটা ফুটছে। তাহলে চিন্তাই যদি তার জলের এবং হিটারের অস্তিত্বের কারণ হয়, তাহলে এই যে হিটারে জল ফুটছে—সেটাকে ব্যাখ্যা করা যাবে না।

মহারাজ : আরে, সে এসে দেখলে, জল ফুটছে। তখন ফোটা জলটা তার চিন্তার বিষয় হল কী না?

—তখন তো চিন্তার বিষয় হল। কিন্তু এই দশ মিনিট আগে তার সত্তা যদি স্বীকার করা না হয়—

মহারাজ : সত্তা তার কাছে না থাকলেও কারো না কারো কাছে অস্তিত্ব আছে।

—ডাঃ গৌ— ফোন করেছে।

মহারাজ : হ্যালো। তুমি কেমন আছ বল তো? আমি দারুন ভাল আছি। (সকলের চাপা হাসি) অ্যাঁ, হ্যাঁ। হ্যাঁ। তবে চায়ের বেশি permission নেই। না, কষ্ট হচ্ছে না। অ্যাঁ? তা মন্দিরে তো যাচ্ছি, গাড়ি চড়ে। দী— এসেছিল। দেখে-টেখে বলল—তিনদিন পর আবার আসবে। এসে দেখবে—যন্ত্র দিয়ে দেখবে। তিনদিন কী একটা ওষুধ খেতে বারণ করে গেছে। Aspirin খেতে বারণ করে গেছে। আমি বলি—যা ইচ্ছা দেখ। কিন্তু আর কাটাকাটি করো না। কী হল? ও এমনি দেখ, যা ইচ্ছে। কিন্তু—অ্যাঁ? Surgeon-এর তো হাত চুলকোয়। (সকলের চাপা হাসি) অ্যাঁ? (হাসি) তা উপায় কী বল? আচ্ছা, তুমি ভাল থেকো। তাহলে আমি একটা guide পাই। Guidance ছাড়া তো কথাই চলে না। তাড়াতাড়ি সেরে ওঠ। এদিকে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। তুলকালাম অবস্থা। তুমি তাড়াতাড়ি সেরে ওঠ। আরে সরষে দিয়ে ভূত ছাড়ায়, তা সরষের মধ্যেই যদি ভূত থাকে, তাহলে কী দিয়ে ছাড়াবে? বাইবেলে আছে—"You are the salt of the earth; but if the salt loses its flavour, how shall it be

seasoned?" (Mathew, 5 : 13-16) ইত্যাদি। আচ্ছা ছেড়ে দিচ্ছি। সু— মহারাজের সাথে কথা বল। ও একেবারে ঘাড় বেঁকিয়ে আছে। (সকলের হাসি)

—গৌ— ডাক্তার? যন্ত্রটা লাগিয়ে দাও।

মহারাজ : ও, যন্ত্রটা খুলে গেছে!

—হ্যাঁ। এইজন্য শুনতে পাচ্ছেন না।

মহারাজ : খুলে গেছে, তাতেও তো শুনতে পাচ্ছিলাম।

—ওটা থাকলে পরে, এখান থেকে বলতে হবে। ওটা না থাকলেও আপনি শুনতে পাবেন। এমনিতেও শুনতে পাবেন। অন্তত আমার গলাটা শুনতে পাবেন।

মহারাজ : তোমার গলা তো যমেও শুনতে পাবে। (সকলের হাসি) এবং শুনে ভয় পাবে। (হাসি) যাকগে—ভাল কথা হোক।

—মহারাজ, এই যে বাহ্য জগতের সত্তা—বাহ্য জগতের সত্তা কি একজন দ্রষ্টা, যে চিন্তা করছে—তার ওপর নির্ভর করে?

মহারাজ : নিশ্চয়।

—তাহলে, আমরা বলছি—ধরুন, আপনি এখানে রয়েছেন, আমরা অফিসের কাজ করছি—তখন হয়তো আপনার চিন্তা করছি না। তাহলে আপনি কী এখানে নেই?

মহারাজ : দেখো। এটা কেবল একটা point দেখলে হবে না। ত্রিকালেতে বাধিত হয় যদি, তাহলে তার অস্তিত্ব মানা যাবে না। ত্রিকালে—present, past, future; আর তিনি—আমি, তুমি, তারা—কেউ যদি না দেখল, না অনুভব করতে পারল, তাঁর সত্তা কী করে মানা যায়? যদি সত্তা থাকেও তো মানা যাবে না। যদি মানা না যায়, তাহলে আছে বলে প্রমাণ কী?

—না। সেটা আছে বলে প্রমাণও করা যাবে না। আর নেই—তাও বলা যায় না।

মহারাজ : নাই—তা বলা যাবে এইজন্য যে, 'অস্তিত্যেব উপলভ্যতে'। যদি তা থাকত, তাহলে তার উপলব্ধি হতো। এখন না হয়, অন্য সময়।

আমার দ্বারা না হয় আরেক জনের দ্বারা। এটা ভেবে দেখ। এরকম যদি উপলব্ধি না থাকে কারো, তাহলে সে-বস্তুর সত্তা মানবার কী দরকার?

—আচ্ছা, আচ্ছা। তার অস্তিত্ব—সেটা জানবার যোগ্যতা তার থাকবে। জানবার যোগ্যতা তার আছে। এখন হয়তো আমি জানি না। কিন্তু জানবার যোগ্যতা—জ্ঞেয় হওয়ার যোগ্যতা আছে।

মহারাজ : যোগ্যতা মানে হচ্ছে—আমি না জানলেও আরেকজন জানবে। এখন না জানলেও পরে জানবে।

—ঠিক, ঠিক।

মহারাজ : এই।

প্রশ্ন : আপনাদের সময় Secretary-র অফিস কোন্‌টা ছিল?

মহারাজ : Secretariat বলে কিছু ছিল না। আমরা তখন ক্ষুদে ব্রহ্মচারী। আমরাও কম ছিলাম না। সকলের সঙ্গো খুব মিশতাম। শুদ্ধানন্দ স্বামীর সঙ্গো আমাদের খুব মিলমিশ হতো। তিনিও সেটা পছন্দ করতেন। অফিস আর লাইব্রেরি ঘর একটাই ছিল। কয়েকটা আলমারিতে বই থাকত। মহাপুরুষ মহারাজের সেবকরা ঐ ঘরেই শুত।

প্রশ্ন : আমরা যে শুনি, রামকৃষ্ণলোক—সেটা কী?

মহারাজ : রামকৃষ্ণলোক! তার geography চাও নাকি?

—না, আমরা যেমন শুনি—গন্ধর্বলোক, পিতৃলোক, বৈকুণ্ঠলোক—এরকম তো শুনি—

মহারাজ : এগুলির geography জান?

—কিছুই জানি না মহারাজ। এ তো সব শোনা। বলুন একটু।

মহারাজ : যেমন শিবলোক, বিষ্ণুলোক—এইসব আছে তো। তেমনই রামকৃষ্ণলোক। রামকৃষ্ণলোক বলতে—রামকৃষ্ণ-আদর্শ যেখানে স্বাভাবিক।

—সেটা যেকোন জায়গায় হতে পারে মহারাজ? সেজন্য আলাদা একটা লোক—

মহারাজ : সর্বলোকই এইরকম।

—তা, এই শরীর যাওয়ার পরে সেখানে যেতে হবে বা সেইরকম কিছু? না আদর্শ গ্রহণ?

মহারাজ : শরীর যাওয়ার পর, মানুষ যেমন ভাবে, এই স্থূল দেহেতে 'আমি' বুদ্ধিটা চলে যাবে। (হাসি)

—আচ্ছা। তাহলে শরীর থাকলে তো—প্রেমেশ মহারাজের কয়েকটা চিঠিতেও এইরকম রামকৃষ্ণলোকের কথা আছে। মহাপুরুষ মহারাজও কখনো উল্লেখ করেছেন।

মহারাজ : বিষ্ণুলোক, শিবলোক, দেবলোক। "যত্র দেবাস্তিষ্ঠন্তি সঃ দেবলোকঃ।" "যত্র রামকৃষ্ণভক্তাস্তিষ্ঠন্তি সঃ রামকৃষ্ণলোকঃ।"

—বাঃ। রামকৃষ্ণলোক। মহারাজ, এইরকম একেকজন অবতার আসবেন, তাঁদের একেকটা লোক হবে?

মহারাজ : লোক মানে এই যে, তাঁর ভক্তদের যে-স্থান, সেটা হল লোক।

—নির্বাণলাভ বা মুক্তিলাভ, এরপরেও আবার একটা স্থান হয় মহারাজ?

মহারাজ : তাদের মুক্তির আর কোন স্থান নেই।

—হ্যাঁ?

—কিন্তু যারা মুক্তি চায়, তারা আবার রামকৃষ্ণলোকে যাবে?

মহারাজ : তাদের ইচ্ছা না হলে যাবে না, ইচ্ছা হলে যাবে।

—একবার গিয়ে দেখে আসতে হয় মহারাজ।

মহারাজ : সর্বনাশ! রিটার্ন টিকিট করে যেও। রিটার্ন টিকিট না করে গেলে আমাদের আগে নোটিশ দিতে হবে আচার্য খুঁজতে। (সকলের হাসি)

—রামকৃষ্ণলোক যেটা বলছেন মহারাজ, এটা কি কোন space-এর দিক দিয়ে আছে? যেমন পৃথিবী একটা লোক, একটা space। এইরকম কি কোন particular space রয়েছে?

মহারাজ : আরে, ওগুলি space-এর বাইরে।

—Space-এর বাইরে রামকৃষ্ণলোক?

মহারাজ : রামকৃষ্ণ-আদর্শ যেখানে প্রতিফলিত—ভক্তরা যেখানে রামকৃষ্ণভক্ত। কাজেই তা রামকৃষ্ণলোক।

—না, লোক বলতে যেখানে মানুষ বাস করে, সেরকম জায়গা তো হবে?

মহারাজ : সেখানকার অধিবাসীরা সব রামকৃষ্ণভক্ত।

—হ্যাঁ। তা, যেখানে বাস করে মহারাজ, সেখানে বাস করার একটা উপযুক্ত স্থান হবে তো?

মহারাজ : স্থান মানে কী? যেখানে অবস্থান করে তাকে স্থান বলে। যতোস্থিত স্থান।

—হ্যাঁ, সেই অবস্থিতিগুলো কিরকম হবে, সেটাই জানতে চাইছি।

মহারাজ : ভাবজগৎ।

—ভাব? এই ভাবটা কি ভক্তের, মানে—particular নিজের ভাব? না ঈশ্বরের ভাব?

মহারাজ : ঈশ্বরের একটি ভাব, যা ভক্ত তার সঙ্গে যোগ করে।

—ভক্তের ভাব এবং ঈশ্বরের ভাব? মহারাজ, এ দুটো ভাব কি তাহলে আলাদা?

মহারাজ : ঈশ্বর অনন্ত ভাবময়। তাঁর ভক্ত যে-ভাব গ্রহণ করে সেই ভাব।

—ভক্ত ভাবটি গ্রহণ করে। তাহলে ভক্ত কি ঈশ্বর থেকে আলাদা হল?

মহারাজ : গ্রহণ করে একটি ভাব—

—মানে, যেমন আমার মধ্যে অনেকরকম ভাব রয়েছে। এর কাছে একরকম, আপনার কাছে আবার আরেকরকম ভাব।

মহারাজ : যেটি স্থায়ী ভাব।

—ভাবগুলির সমষ্টি হিসেবে একটা ভাব মহারাজ?

মহারাজ : তা নয়। যে-ভাবটা তোমার মধ্যে সবচেয়ে প্রবল, তুমি সেই ভাবের লোক।

—অন্য ভাবগুলি?

মহারাজ : গৌণ।

—কিন্তু সমস্ত ভাব—এইগুলো তো ঈশ্বরের ভাব।

মহারাজ : সবই ঈশ্বরের ভাব। অনন্ত ভাবময় তিনি।

—আমি হচ্ছি তার একটা ভাব।

মহারাজ : আমার একটা ভাব।

—আমার ভাব যেটা বলছি—

মহারাজ : আমার ভাব মানে, যেভাবে আমি ঈশ্বরকে আস্বাদন করছি, করতে চাই বা করি।

—দ্রষ্টা যেটা। দ্রষ্টা আমি যেটা।

মহারাজ : দ্রষ্টা?

—দ্রষ্টা আমি। আমার মধ্যে দুটো আমি। একটা দৃশ্য আমি, আরেকটা দ্রষ্টা আমি।

মহারাজ : বেদান্তের আমি হলে হবে না, ভক্তের আমি। ভক্তের আমি, বেদান্তের আমি নয়।

—এটার পার্থক্য কী? এই যে বেদান্তের 'আমি' এবং ভক্তের 'আমি'—এর পার্থক্যটা কী?

মহারাজ : পার্থক্য এই—বেদান্তের আমি-র ভিতর আর কোন গণ্ডি নেই। আর ভক্তের আমি-র ভিতরে গণ্ডি আছে।

—ভক্তের ভিতরে কি নিজের সঙ্কীর্ণতা রয়েছে?

মহারাজ : সঙ্কীর্ণতা নয়, বলা যায় বৈশিষ্ট্য। সঙ্কীর্ণতা বললে গালাগালি দেওয়া হয়। তা নয়—বৈশিষ্ট্য।

—একটা কথা বলছি মহারাজ, এই নিজস্ব ভাবের প্রসঙ্গে এই যোগের কথায় স্বামীজী একজায়গায় বলছেন : "Every man must develop according to his own nature. As every science has its methods, so has every religion."

মহারাজ : স্বামীজী খালি ইংরেজিতে কথা বলেছেন। মহা মুশকিল! (সকলের হাসি)

—ঐ তাড়াতাড়ি ইংরেজিতে পড়ছিলাম, তাই তখন ইংরেজিটাই লিখেছি। বাংলাটা লিখব ভেবেছিলাম। তা বাংলাটা খুঁজতে হবে তো, তাই তাড়াতাড়ি—(মহারাজের হাসি)

মহারাজ : বল, বল। আরেকবার বল।

—"Every man must develop according to his own nature. As every science has its methods, so has every religion. The methods of attaining the end of religion are called Yoga by us, and the different forms of Yoga that we teach, are adapted to the different natures and temperaments of men." (C. W., 5.292) এই 'different methods and temperaments of men.'—এটা একটু বলুন। সেটা কি বিভিন্ন মানুষের রুচি—

মহারাজ : সেইজন্য তোমার ভিন্ন যোগ। Temperament-এর সঙ্গে তোমার যোগ। তার ভিতরে প্রধান যেটা, সেটা দিয়েই নাম হয়—জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ইত্যাদি।

—তাহলে সমন্বয় মানে, সব ভাবকে appreciate করছি। আমরা যদি প্রকৃতি অনুযায়ী যোগকে গ্রহণ করি বা গ্রহণ করতে হবে—এইরকম বলি—

মহারাজ : প্রকৃতি মানে, আমাদের প্রকৃতি air-tight তো নয়। একজনের প্রকৃতি মানে যেটা তার প্রবল স্থায়ী ভাব, আর অন্যগুলি আপেক্ষিক ভাব।

—ঐ যেটা বললেন আপেক্ষিক বা গৌণ, তা গৌণগুলিকেও তো স্বামীজী বলছেন যে, গুরুত্ব দিতে হবে। তাহলে সমন্বয় কী করে হবে?

মহারাজ : সমন্বয় মানে সবগুলোকে appreciate করা।

—নিজের জীবনে গ্রহণ না করলেও হবে?

মহারাজ : নিজের জীবনে একটা স্থায়ী ভাব থাকবে। আর বাকিগুলি গৌণ হবে। কিন্তু সেগুলি তুচ্ছ হবে না। একটি ভাব হল স্থায়ী ভাব। আর অন্যগুলি গৌণ—তবে তুচ্ছ নয়।

—ওটাকে সমন্বয় বলা যাবে?

মহারাজ : তুমি তোমার জীবনে দেখ। তুমি বিচার কর। ভক্তি কর, তারপর মনের সংযোগ কর। আবার কর্ম কর। এগুলি সব তো তোমার ভিতরে রয়েছে। তুমি তো সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে চলছ।

—কেউ তো মনে করতে পারে, একটা দুটোর প্রতি আমার fascination আছে, সেটাই করব।

মহারাজ : তা যদি করে, তাতেও হবে। কিন্তু বিভিন্নতা থাকবে।

—না, সে যদি মনে মনে appreciate করে অন্যগুলো, কিন্তু নিজের জীবনে গ্রহণ করল না—

মহারাজ : গ্রহণ করা মানে কী?

—নিজের জীবনে অভ্যাস করা যাকে বলি আমরা।

মহারাজ : তা না করল। তাতেও হবে।

—তাহলে সেটা সমন্বয়ের চরিত্র বলা যাবে? সেটাই বলছি—

মহারাজ : সে যদি সেগুলোকে স্বীকার করে, তাহলে সমন্বয় হবে। স্বামীজী বলেছেন—সবগুলি যার জীবনে পরিস্ফুট তার চরিত্র রামকৃষ্ণমুষায় দ্রুত হয়েছে।

॥ ১০৪ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, স্বামীজী বলেছেন—"It is the heart that reaches the goal. Follow the heart. A pure heart sees beyond the intellect; it gets inspired; it knows things that reason can never know, and whenever there is a conflict between the pure heart and the intellect, always side with the pure heart, even if you think what your heart is doing is unreasonable." (C. W., 1.414)

মহারাজ : আরো পড়ে যাও! আরো পড়ে যাও! (সকলের হাসি)

—Context-টা এখানে মহারাজ—'always side with the pure heart, even if you think what your heart is doing is unreasonable.'

মহারাজ : হৃদয় আর মস্তিষ্ক—এই দুইয়ের মধ্যে যদি বিরোধ থাকে তা-হলে 'go with the heart rather than intellect'। তাতে হৃদয় যা বলবে তা-ই করব। বুদ্ধি যা বলে তার দিকে যাব না। কারণ, বুদ্ধি গোলমাল করে থাকে। সুতরাং হৃদয় যা বলে তা অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করা যায়। সমস্যা হচ্ছে—হৃদয় কোন্‌টি আর বুদ্ধি কোন্‌টি? Thinking-টা বুদ্ধি। Thinking জিনিসটা সত্যের থেকে দূরে থেকে যায়। সাধারণ বুদ্ধি সত্যকে স্পষ্ট করে না। এটা স্বামীজী বলেছেন—একভাব দেখে বলেছেন। কিন্তু শুদ্ধবুদ্ধি কখনো তোমাকে বিপথগামী করবে, না, হৃদয় যদিও কখনো কখনো বিপথগামী করতে পারে। কারণ, তোমার ভালবাসা অপাত্রে অর্পিত হতে পারে। কিন্তু pure intellect—কখনো সে তোমাকে misguide করবে না।

—শুদ্ধবুদ্ধির কথা—পিওর ইনটালেক্ট।

মহারাজ : ইনট্যালেক্ট নয়, ইনট্যাল্যাক্ট।

—এটা শুদ্ধবুদ্ধির কথা নয়?

মহারাজ : না। এটা এমনি বিচার। মানুষের বিচার তার বাসনার দ্বারা রঞ্জিত হয়। এজন্য বাসনাশূন্য হলে পরে তার বিচারটা অভ্রান্ত হবে।

—বুদ্ধি তো আমাদের বাসনার দ্বারা রঞ্জিত হতে পারে।

মহারাজ : Intellect-টা রঞ্জিত হবে। কখনো ভুল করে না, তা নয়। তবুও হৃদয় নিয়ে মাতা ভাল। মাথা নিয়ে খালি মাতা ভাল না। মাথাটা দপ্‌ দপ্‌ করে। হৃদয়টা টিপ্‌ টিপ্‌ করে। (সকলের হাসি)

—এটা ভাল বলেছেন, মহারাজ।

মহারাজ : দুপুরবেলা একটা কালো চশমা পরে থাকতাম। লোকে বলত, শনির দৃষ্টি। চারিদিকে চাইলে ভস্ম হয়ে যাবে। (হাসি) এইজন্য এত সাধনা। চশমা পরে রয়েছি আমার দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়ার জন্য। এই শনির দৃষ্টির কথা বলছি এইজন্য যে, এ খুব highly intellectual।

—এর একটু পর আবার বলছেন স্বামীজী—"Always cultivate the heart; through the heart the Lord speaks, and through the intellect you yourself speak." (C. W., 1.415)

মহারাজ : আবার ইনট্যালেক্ট?

—ইনট্যাল্যাক্ট। এটা একটা অদ্ভুত কথা স্বামীজীর।

মহারাজ : ওটা একটা বলেছেন যে, হৃদয়ের ভিতর দিয়ে ঈশ্বর কথা বলেন। আর বুদ্ধির ভিতর দিয়ে তুমি কথা বল। তার মানে বুদ্ধি অনেক সময় মানুষকে বিপথগামী করে। আর হৃদয় যদি বিপথগামী করেও তবুও হৃদয়। Heartless হয়ে intellectual হলে তার দাম নেই। স্বামীজীর হৃদয় ছিল খুব। এইজন্য বলছেন—বুদ্ধের হৃদয়বত্তা। বুদ্ধের দর্শন নয়, কিন্তু হৃদয়।

—ভাবাবেগ, উচ্ছ্বাস এগুলোকে পরিহার করার জন্য স্বামীজী বিচারের কথাও তো খুব বলেছেন।

মহারাজ : যখন যেটা বলেছেন, সেটার ওপরে জোর দিয়েছেন। তারপর বল।

—স্বামীজী অন্য জায়গায় বলেছেন, সমাধি অর্থে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ ভাব অথবা সমত্ব লাভ করা।

মহারাজ : অভেদ মানে—জীবাত্মা বলে আলাদা কিছু নেই। আর সত্যি কথা—জীবাত্মাও আত্মা, পরমাত্মাও আত্মা। তাদের উভয়ের সমত্ব—যে জীব সেই শিব। একই কথা। অভেদ ভাব আর সমত্ব ভাব। সম মানে সাদৃশ্য। সম বলতে সাদৃশ্য। অভেদ বলতে অভিন্নতা।

—এবার প্রশ্ন, ভাবসমাধিতে কী অনুভব হয়? তখন কি এই সমত্ব বা একত্ব অনুভব হয়?

মহারাজ : তারপর?

—না, এটাই প্রশ্ন। ভাবসমাধিতে কি এই অভেদ ভাব বা সমত্ব ভাব অনুভব হয়? না, ওটা অন্যরকম?

মহারাজ : ভাবসমাধি মানে, যে-ভাবের তরঙ্গ মনে উঠেছে, তাতে মন একেবারে লয় হয়ে যাওয়া, বিলীন হয়ে যাওয়া। একেবারে ভাবচোখে দেখা। মানে, আমরা যে-চোখে দেখি, সে-চোখে দেখা নয়।

—ভাবসমাধি আমরা ঠাকুরের জীবনে দেখছি। সেটা কি এই অভেদ ভাব বা সমত্ব?

মহারাজ : ভাবসমাধিতে বহুত্ব একেবারে লোপ পায় না। আর নির্বিকল্প সমাধি বা জড়সমাধি—তাতে বহুত্ব লোপ পেয়ে যায়।

—জীবাত্মা আর পরমাত্মার যে-অভেদত্ব—এই ভাবটা যদি কেউ গ্রহণ করে, তখন কি তার ভাবসমাধি হতে পারে?

মহারাজ : গ্রহণ করে মানেটা কী?

—এই ভাবটাকে পাকা করতে চায় যে, জীবত্ব মিথ্যা—

মহারাজ : না, তা ভাবসমাধি নয়।

—একে ভাবসমাধি বলা যাবে না। তাহলে কি এটা জড়সমাধি, মহারাজ?

মহারাজ : যদি নির্বিকল্প চরম লক্ষ্য হয়, তাহলে জড়সমাধি হবে। তা না হলে বিচারশীল মন যতক্ষণ, মানে কল্পনা যতক্ষণ; আর তাতে ডুবে যাওয়া হল তোমাদের যোগের ভাষায় সবিকল্প, আর ঠাকুরের ক্ষেত্রে আমরা বলি ভাবসমাধি। এইতো।

—তাহলে, জড়সমাধি আর নির্বিকল্প সমাধি এক?

মহারাজ : একই।

—উন্মনা সমাধি?

মহারাজ : উন্মনা মানে, অন্য বিষয়েতে মন যাচ্ছে না।

—ও আচ্ছা, অন্য বিষয়ে মন যাচ্ছে না।

মহারাজ : হ্যাঁ।

—নির্বিকল্প সমাধিকে জড় বলে কেন?

মহারাজ : জড় মানে চেতন নয়। জড়সমাধি মানে, যাতে দেহটা জড় হয়ে যায়। দেহ সক্রিয় হয় আত্মার সঙ্গে যোগ হওয়ার জন্য। যখন আত্মার সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন দেহটার কোন ক্রিয়া থাকে না। তাই বলে জড়।

—মহারাজ, আর কিছু বলব—

মহারাজ : কাগজখানা? (সকলের হাসি)

—না মহারাজ, আজকে কাগজ আনিনি ইচ্ছে করেই। এখানে এসে একটু হাসি-টাসি হতো, একটু পুরনো দিনের গল্প হতো, সেসব তো প্রশ্নের চাপে আর কাগজের চাপে হারিয়ে যাচ্ছে মহারাজ।

মহারাজ : ও বাবা!

—আর গলাও বসে গেছে।

মহারাজ : তা, আরেকটু হাস। (সকলের হাসি)

—আমাদের একটা পুরনো কথা জানার ছিল, মহারাজ।

মহারাজ : বল।

—জয়রামবাটীতে আমরা এখন দেখি মায়ের পুরনো বাড়ি, নতুন বাড়ি। মায়ের তো জন্ম হল এখন যেখানে গর্ভমন্দির—সেখানে। তখন কি ওঁদের বাড়িঘর ঐদিকে ছিল?

মহারাজ : মায়ের আগের বাড়ি ছিল একটা। নতুনটা করে দিয়েছিলেন শরৎ মহারাজ।

—শরৎ মহারাজ তো করেন নতুন বাড়িটা।

মহারাজ : হ্যাঁ, নতুন বাড়িটা। পুরনো বাড়িটা কে করল?

—পুরনো বাড়িটা তো ওঁদের ছিল।

মহারাজ : তাহলে তাই হবে।

—বড় মামার দাবি, সেটা বড় মামার ঘর। আর, গর্ভমন্দির থেকে মায়ের পুরনো বাড়ি তো অনেক দূর।

মহারাজ : তা দূর—

—তাহলে গর্ভমন্দিরটা মায়ের জন্মস্থান হল কী করে? কিশোরী মহারাজের কথায় আছে, একজন বাগ্দি বুড়ি ছিল। মা বলে দিয়েছিলেন যে—ও জানে, ওর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর। তখন সাধুরা সব গিয়েছিলেন। বুড়ি বলেছিল—হ্যাঁ, আ-মা-কে পাঁ-চ টা-কা দি-তে হ-বে। তা-হ-লে আ-মি ব-ল-ব। তারপরে নাকি দেখিয়ে দিয়েছে সেই জায়গাটা। আর সেখানে ঘর ছিল। থাকার ঘর। যেখানে মন্দির তার উত্তরদিকে যেখানে এখন বাগান, খামারবাড়ি—ঐখানে নাকি সব থাকার ঘর ছিল।

মহারাজ : আরে! ঐ মন্দির যেখানে তার পাশেই মামাদের বাড়ি ছিল। পাশেই, একেবারে গায়ে। সেগুলোকে সরাতে অনেক হ্যাঙ্গাম করতে হয়েছে। আর গ— বলে, আমরা তো দিয়েছি। দিয়েছে মানে, যত পেরেছে টাকা আদায় করেছে, করে—দিয়েছে। একেবারে গায়েই ছিল, পাশেই। মামাদের কথা আর বলবার নয়! দুই মামা ঝগড়া করত খুব। একদিন খুব ঝগড়া করছে। তখন কিশোরী মহারাজ থাকতে না পেরে একটা বাঁশ নিয়ে—"তবে রে! আজ কংস মামাকে ধ্বংস করব!" (সকলের হাসি) কিশোরী মহারাজের তো লম্বা-সম্বা দেহ—ঐ দেখে সব পলায়ন। (হাসি) আজ কংসমামাকে ধ্বংস করব! (সকলের হাসি)

—প্রসন্ন মামার দ্বিতীয় পক্ষের ছেলে হলেন এই আমাদের গ—বাবু।

মহারাজ : বাপরে! কী নক্ষত্রে জন্মেছিল! (সকলের হাসি)

—ওখানে কখনো থাকেন না তিনি। সবসময় খালি এই কলকাতা, এদিক সেদিক।

মহারাজ : আর পিসি পিসি করে অস্থির করে।

—পিসি? ও, মায়ের কথা বলছেন?

মহারাজ : হ্যাঁ, পিসিমা। আমি বললাম, তোমাদের পিসিমা আর আমাদের মা। তা বলে—ও তো পাতানো মা।

—আরে বাবা! (সকলের হাসি) তিনি মাকে দেখেননি বোধ হয়।

মহারাজ : গ— ?

—হ্যাঁ মহারাজ। আচ্ছা, মায়েদের পুরনো ঘরবাড়ি যে ছিল, আগে যখন গেছেন, দেখেছেন?

মহারাজ : দেখেছি।

—মহারাজ, মন্দিরে ঢুকতে ঐ বাঁদিকে একটা পুকুরও নাকি ছিল। এখন যে পুরনো শো-রুমটা আছে ওটা নাকি ভেঙে দেবে। তাহলে বড় জায়গা হয়ে যাবে। বাগান-টাগান করতে পারবে।

মহারাজ : আগে তো জায়গা ছিল না। মায়ের জন্মস্থানটাও দিতে চাইছিল না। অনেক হ্যাঙ্গাম করে ওটা আদায় হয়েছে। সব জায়গায়। ঠাকুরের জন্মস্থানও। সব জায়গায়।

—মহারাজ, কামারপুকুরে যে ঠাকুরের এই জায়গা, সেটার জন্য আমাদের কি মামলা করতে হয়েছে? কামারপুকুরের জমি, ঘর পেতে?

মহারাজ : আমরা মামলা করিনি। আর মামারা তো মামলা লাগিয়েই রাখত। কা—মামা শরৎ মহারাজকে বলছে—টাকা দিন।—তা, কী করবে?—মামলা করব।—কার সঙ্গে মামলা করবে? বলছে—আপনার সঙ্গে। (সকলের হাসি)

—মহারাজ, এগুলি ইতিহাস। এরকম হয় কখনো? এ তো অদ্ভুত কাণ্ড। তা, মহারাজ দিতেন?

মহারাজ : না। আমার বিরুদ্ধে মামলা করবে, আবার আমার কাছেই টাকা চাইছে—তার দরকার কী? (সকলের হাসি) না, অনেক ভক্তেরা টাকা দিত আমার মনে হয়। আমি অত ওদের সঙ্গে মিশতাম না। আমার ভাল লাগত না।

—মা-ও পছন্দ করতেন না যে, ওঁর আত্মীয়-স্বজন যারা আছে তাদের সঙ্গে সাধুরা খুব মেলামেশা করে।

মহারাজ : মায়ের সঙ্গে ওরা এমন ব্যবহার করত যে, ওদের পছন্দ করার কোন কারণ ছিল না। টাকার জন্যে অস্থির করে ফেলত।

—আর আমরা তো মহারাজ একটা কিছু স্মৃতি পেলেই সঙ্গে সঙ্গে গভর্নমেন্টকে বলি—এটা acquire করে দিন। নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ি যখন মঠ থেকে নেওয়া হয়, তখন আমরা গিয়েছিলাম ট্রেনিং সেন্টার থেকে duty করতে। তা পাশের বাড়ি থেকে আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে কী—ভাগ্যিস মা আমাদের বাড়িতে আসেননি। (সকলের হাসি) মহারাজ, আমি একদিন স্বামীজীর মামার বাড়িটা দেখতে গিয়েছিলাম। রামতনু বোস লেনে। তা, ওখানে আমাকে দেখেই ভিড় জমে গেছে। প্রায় ১০/১৫ জন লোক। এসে জিজ্ঞাসা করছে—কী ব্যাপার, মহারাজ? এটাও নেবেন নাকি? (সকলের হাসি)

মহারাজ : সরষেতে—আশ্রমে এসে গাঁয়ের লোকেরা গরু ছেড়ে দিত। সাধুরা বলছে—এখানে এসে গরু ছাড়ছ কেন? তা বলছে—

আপনারা সমস্ত গ্রামটা কিনে নেবেন, আমরা থাকব কোথায়? (সকলের হাসি)

॥ ১০৫ ॥

প্রশ্ন : অ— দূর থেকে বলছে—ফেউ ফেউ। এই আসছে। এই নিয়ে কথা হবে।

মহারাজ : ফেউ জান?

—ফেউ লাগিয়ে দেয়।

মহারাজ : ফেউ কাকে বলে জান কিছু? সেটা একরকমের শিয়াল। বাঘ এলে শিয়ালগুলো দূর থেকে 'ফেউ ফেউ' করে। তাকে বলে ফেউ।

—আমরা শুনি এই কথাটা—যেমন, ফেউ লেগেছে পিছনে।

মহারাজ : একরকমের শিয়াল। সে ভয়ে শব্দ করে ফেউ ফেউ করে।

—শুনেছেন না দেখেছেন মহারাজ?

মহারাজ : আমি আওয়াজ শুনেছি। সকলে বলল ফেউ ডাকছে।

—আচ্ছা। কোথায় মহারাজ? গঙ্গোত্রীতে?

মহারাজ : ওখানে বাঘ কখনো কখনো আসত। তা, নদীর ধার বেয়ে আসত। ওধারে শরবন ছিল। তার ভেতর দিয়ে আসত।

উত্তরকাশীতে আমরা ছত্রে যেতাম যেখানে, সেখানে একটা বড় গাছ ছিল। সেই গাছের ওপর একদিন একটা চিতাবাঘ বসে আছে। হয়েছে কী, তার খেয়াল হয়নি যে, ভোর হয়ে গেছে। আর ভয়ে নামছে না। তখন তার তো ভয়। অপরের তো আরো ভয়! তারপর, ডেপুটি কালেক্টর—তার বন্দুক ছিল, সে সেটাকে গুলি করে মারল। (হাসি)

—মহারাজ, গল্প সাংঘাতিক জিনিস। গল্প করে করে সময় অনেক নষ্ট হয়।

মহারাজ : হ্যাঁ, বাঘের কথা হলে আর কোন কথা হয় না। ভাল কথা বল।

—কথাটা হয়ে যাক মহারাজ। বাঘের কী গল্প মহারাজ?

মহারাজ : আবার বাঘ! (সকলের হাসি)

—আপনি বাঘ দেখেছেন মহারাজ?

মহারাজ : আমি বাঘ দেখেছি গঙ্গার ওপারে। গঙ্গা মানে সরু গঙ্গা। উত্তরকাশীতে।

—এপারে লাফ দিয়ে আসতে পারত না?

মহারাজ : কোথায়? লাফ দিয়ে পার হতে পারবে না। আর সাঁতার দিয়েও আসতে পারবে না। এত current-র জোর—current-এ আসতে পারবে না। বাঘটা একটা ছাগল ধরেছিল। কতগুলো ছেলে হৈহৈ রৈরৈ করছে। তাতে, ছাগলটাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। দৌড়ে পালাচ্ছে না। ধীরে ধীরে যাচ্ছে। আর জিভ দিয়ে মুখটা চাটতে চাটতে—

—ছাগলটা আর বাঁচেনি নিশ্চয়?

মহারাজ : ছাগলটার কী হল জানি না। আমার ছাগলটাতে interest নেই, বাঘটাতে interest।

—পা— মহারাজ আপনাকে কী একটা গল্প বলেছিলেন।

মহারাজ : বলুকগে যাক। (হাসি) ভাল কথা বল। অ— বল।

—বলব?

মহারাজ : বল।

প্রশ্ন : মহারাজ, ঠাকুর একবার খুব সমস্যায় পড়লেন! স্বামীজী বললেন—দেখুন আমার ওপর আপনার এত ভালবাসা, তা মনে আছে তো ভরত রাজার কথা? হরিণ ভেবে ভেবে তাঁর হরিণজন্ম হয়েছিল।

মহারাজ : তুমি মাঝে কথা যোগ করছ যে!

—তখন ঠাকুর তো ভাবনায় পড়লেন। গেলেন মায়ের কাছে, গিয়ে বললেন।—আরে ও কী জানে? ছেলেমানুষ?

মহারাজ : তারপরে বল।

—তারপরে বলছেন যে, তোদের মধ্যে যেদিন নারায়ণকে দেখতে না পাব সেদিন আর তোদের মুখ দেখতে পারব না। এইখানে প্রশ্ন হল, এটা কি

ঠাকুর জানতেন না যে, এদের মধ্যে তিনি নারায়ণকে দেখেন তাই ভালবাসেন?

মহারাজ : স্বামীজীর কথার ওপরে ঠাকুরের খুব বিশ্বাস ছিল। স্বামীজী যখন বলেছেন তখন তিনি ভাবনায় পড়ে গেলেন। মায়ের কথায় আবার ভাবনাটা চলে গেল।

প্রশ্ন : বেদান্তবাদী বলেন, তুমি মুক্ত ও বদ্ধ—দুই-ই। ব্যাবহারিক ভূমিতে তুমি কখনো মুক্ত নও। কিন্তু পারমার্থিক বা আধ্যাত্মিক ভূমিতে তুমি নিত্যমুক্ত। উভয়ের পারে চলে যাও। এই কথাটার মানে কী?

মহারাজ : মুক্তির পারে—বন্ধন থাকলে তো তা থেকে মুক্তি হবে। কাজেই মুক্তির পারে যাওয়া মানে, বন্ধনের পার মুক্তির পার। আমি কোনকালে বদ্ধ ছিলাম না। তাহলে আর মুক্ত হব কী করে?

—মুক্তিই তো লক্ষ্য।

মহারাজ : আবার মুক্তি লক্ষ্য! বন্ধন সত্য হলে তবে তো মুক্তি হবে।

—মুক্ত অবস্থাটা কী তবে?

মহারাজ : মুক্ত অবস্থা—যে নিজেকে বদ্ধ মনে করে তার মুক্তি।

—মুক্ত হল। তার পারে চলে যাওয়াটার মানে কী?

মহারাজ : মানে তুমি কোনদিন বদ্ধ ছিলে না—এই বোধ করা।

—সে তো মুক্ত অবস্থাতে আমরা বোধ করব।

মহারাজ : সে তো কথা নয়। আমাদের মুক্ত হওয়া মানে হচ্ছে—আমি বদ্ধ ছিলাম, মুক্ত হলাম। আর বন্ধনের পারে যাওয়া মানেও তো মুক্ত হওয়া একরকম। কিন্তু মুক্তিরও পারে যাওয়া—অর্থাৎ জানতে হবে, তুমি কোনকালেই বদ্ধ ছিলে না।

—বলছেন এখানে ব্যাবহারিক ভূমিতে তুমি কখনো মুক্ত নও।

মহারাজ : তা তো বটেই!

—তাহলে জীবন্মুক্তি কী?

মহারাজ : জীবন্মুক্তি ব্যবহার যেটা, সেটা আভাসমাত্র।

—সে তো ব্যবহারভূমিতে।

মহারাজ : আভাস মানে কী?

—অসম্পূর্ণও নয়, পূর্ণও নয়—

মহারাজ : না। আভাস মানে হচ্ছে—

—এটা সত্য নয়।

মহারাজ : ব্যাবহারিক জীবনটা সত্য নয়।

—স্বামীজী বলছেন—মুক্ত অবস্থা, তার বন্ধন নেই। এই যে-অনুভব, এটাকে আভাস বলব, না বন্ধনটা আভাস বলব?

মহারাজ : দুই-ই আভাস। মুক্তিও আভাস।

—মহারাজ, স্বামীজী 'সন্ন্যাসীর গীতি'তে বলেছেন যে, "সত্য সব, কিন্তু নামরূপ-পারে/ নিত্যমুক্ত আত্মা আনন্দে বিহরে।"

মহারাজ : এর মানে কী?

—তার মানে, এইসমস্ত ব্যাবহারিক সত্তা যাকে বলি, তাকে সত্য বলে স্বীকার করছেন।

মহারাজ : ব্যাবহারিক সত্য কখনো সত্য হয়? তাহলে ব্যাবহারিক শব্দের অর্থ কী?

—তা যদি না হয়, তাহলে স্বামীজীর এই কথার অর্থ কী দাঁড়াবে?

মহারাজ : তবে তুমি ভাল করে বুঝে বল।

—আমার প্রশ্ন হচ্ছে, কষ্টটা ধরে নিয়েই তো আমরা কষ্টের বাইরে যেতে চাইছি?

মহারাজ : আমাদের বর্তমানকালের যে-অনুভব সেটাকে ধরে নিয়ে বলছি ব্যবহার। এখন যদি আমি এই নিত্যতে অবস্থিত হই, তাহলে কি আমার কোনদিন ব্যবহার ছিল? আমি বব্ধ ছিলাম, মুক্ত হলাম—এই বোধ হবে? না আমি নিত্যমুক্ত—এই বোধ হবে?

—তখন—

মহারাজ : নিত্যমুক্ত আবার তখন হয় নাকি? নিত্য বলছ, আবার তখন বলছ। এক কথার দুটো অর্থ?

প্রশ্ন : মহারাজ, স্বামীজী একজায়গায় বলেছেন : "দর্শনবর্জিত ধর্ম কুসংস্কারে গিয়ে দাঁড়ায়, আবার ধর্মবর্জিত দর্শন শুধু নাস্তিকতায় পরিণত হয়।" তাহলে ধর্মটা কিরকম হবে মহারাজ?

মহারাজ : ধর্ম তো ব্যাখ্যা করা মুশকিল। হিন্দুধর্ম বলছে—বেদে বিশ্বাস। খ্রিস্টধর্ম বলছে—ঈশ্বরে বিশ্বাস।

—দর্শনবর্জিত ধর্ম কুসংস্কারে গিয়ে দাঁড়ায়। মহারাজ, এর মানে কী?

মহারাজ : দার্শনিক তত্ত্ব বা ভিত্তি ছাড়া ধর্ম যখন কতগুলি আচার-আচরণে পর্যবসিত হয়, তখন সেই ধর্ম কুসংস্কারে দাঁড়ায়।

—কিন্তু ritual-গুলির তো প্রয়োজন আছে।

মহারাজ : তা প্রয়োজন আছে, খালি ritual থাকলে চলবে না। Ritual must be consistent with reason.

—যেগুলির পিছনে দর্শন আছে বা ভাবনা কিছু আছে, অর্থাৎ যে ritual-গুলি আমরা মানছি, তার পিছনে কোন ভাবনা বা ধারণা থাকতে হবে। এটাই তো তত্ত্ব, মহারাজ?

মহারাজ : হ্যাঁ। তা না হলে ritual-এর মূল্য ঐ বেড়াল-বাঁধার মতো হয়ে যাবে।

—ধর্মবর্জিত দর্শন, এখানে ধর্ম মানে কি ritual-গুলি?

মহারাজ : না, ধর্ম মানে ঈশ্বরে বিশ্বাস। কোন নাস্তিকতা নয়।

—এখানে ধর্মবর্জিত দর্শন মানে কী? ধর্মবর্জিত দর্শন শুধু নাস্তিকতায় পরিণত হয়?

মহারাজ : ধর্মবর্জিত মানে, যেখানে আধ্যাত্মিক কোন তত্ত্বে বিশ্বাস থাকে না। খালি দর্শন। চার্বাক দর্শন যেমন। খালি বুদ্ধির কসরত—তাতে নাস্তিকতা আসে।

—আমরা মহারাজ Western Philosophy-তে দেখি যে, সেখানে দর্শন আছে।

মহারাজ : Western Philosophy ব্যাপক শব্দ। তাতে রকমারি আছে।

—তা ঠিক। তবু অধিকাংশ দার্শনিকের যে-ভাব বা পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা অধিকাংশই যে-দর্শনের প্রচার করেছেন, সেখানে ধর্ম, ভগবান, আত্মা, পরলোক—এসব বিষয়ের আলোচনা খুব কম হয়েছে। সেই দর্শনকে আমরা দর্শন বলছি তো।

মহারাজ : না, না। Western Philosophy ব্যাপক, তার মধ্যে নানারকম আছে। ধার্মিক দর্শন আছে। অধার্মিক দর্শন আছে।

—ধর্মবর্জিত দর্শন বলতে আমরা কোন্‌টা বুঝব? শুধু আলোচনা বা শুধু বিচার?

মহারাজ : দর্শন মানে শুধু বিচার।

—ধর্মবর্জিত মানে যে-জীবনে ব্যবহার বা ritual-এর কোন ব্যাপার নেই।

মহারাজ : এর পিছনে একটা আধ্যাত্মিক তত্ত্বের বিশ্বাস না থাকলে খালি বিচারে কাজ হয় না।

—মহারাজ, আমরা বলে থাকি শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শন। শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শন বলতে আমরা কী বুঝব?

মহারাজ : শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশই তাঁর দর্শন।

—সে তো ঠিক। একটু ব্যাখ্যা করুন মহারাজ। অনেক তো ঠাকুরের উপদেশ—অনেক রকম এবং ব্যাপক তার দৃষ্টিভঙ্গি।

মহারাজ : আরে! দর্শন মানে একটা যুক্তি ও ধারা—একটা তাত্ত্বিক অংশ।

॥ ১০৬ ॥

প্রশ্ন : কালকে মহারাজ, 'সন্ন্যাসীর গীতি' সম্পর্কে যেটা বলছিলাম : "সত্য সব, কিন্তু নামরূপ-পারে/ নিত্যমুক্ত আত্মা আনন্দে বিহরে।" আপনি বলেছিলেন, তার আগের portion-টায় কী বলেছেন স্বামীজী। তার আগের portion-টায় বলেছেন : "'কৃত কর্মফল ভুঞ্জিতে হইবে'/ বলে লোক, 'হেতু কার্য প্রসবিবে,/ শুভ কর্মে-শুভ, মন্দে—মন্দ ফল, এ নিয়ম রোধে নাহি কারো বল।/ এ মর-জগতে সাকার যে জন,/

শৃঙ্খল তাহার অঙ্গের ভূষণ।'" তারপরে বলছেন—"সত্য সব, কিন্তু নামরূপ-পারে/ নিত্যমুক্ত আত্মা আনন্দে বিহরে।" প্রসঙ্গটা উঠেছিল অদ্বৈত-বেদান্ত মত নিয়ে। বেদান্তমতে এই সমস্ত কিছু মিথ্যা। তা, আমি তো বলেছিলাম যে, সবকিছুই সত্য—স্বামীজী এই কথা বলেছেন। আমার যা ধারণা মহারাজ, আমি বলছি, তাছাড়া আমি যেটুকু বুঝেছি—সব কিছুই সত্য। নিম্নতম সত্য থেকে উচ্চতম সত্যে—

মহারাজ : তা কখনো হয়? সত্য কখনো নিম্নতম, আবার উচ্চতম হয়?

—তা যদি না হয় মহারাজ, তাহলে এগুলি কী? এইসমস্ত দর্শন? এতদিনের বিচার, এতদিনের সাধনা?

মহারাজ : দেখ, ঠাকুরের দৃষ্টান্ত। সাকারও বলেছেন, নিরাকারও বলেছেন। তা নিরাকারকে উচ্চতম বলবে, আর সাকারকে নিম্নতম বলবে?

—আচ্ছা উচ্চতম নিম্নতম না হোক, প্রকারভেদ তো আছে?

মহারাজ : তা, প্রকারভেদ যে আছে—আমি কি না বলছি নাকি? কিন্তু উচ্চতম নিম্নতম বলো না।

—আচ্ছা, তার মানে, এই সমস্ত কিছু সত্য—এই কথাটা তো স্বীকার করছেন?

মহারাজ : ঠাকুর তো তাই বলেছেন।

—সেই কথা। এটা স্বীকার করলে তো মিটে গেল।

মহারাজ : ঠাকুর তো তাই বলেছেন। মিটে গেল-র কথাই ঠাকুর বলেছেন। (সকলের হাসি)

—মহারাজ, এখানে আলোচনা হওয়ার পরেও কয়েকজন সাধু আমাকে বলেছেন যে, তুমি ভুল। বেদান্ত-মতটাই হচ্ছে আসল। এগুলি বিচারে দাঁড়ায় না। যুক্তির দ্বারা সিদ্ধ হয় না। আমি তাদের বলেছি যে, কথাটা ঠিক নয়।

মহারাজ : আর তত্ত্ব কেবল যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে?

—না, শুধু যুক্তির দ্বারা কেন হবে?

মহারাজ : "নৈষা তর্কেণ ন আপনেয়া।" (কঠোপনিষদ্, ১।২।৯) বেদান্তেরই কথা।

—বেদান্তের কথা।

মহারাজ : তর্ক মানুষের অনুভবের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তর্ক এমনি হয় না। অনুভব নিয়ে তর্ক হয়। কাজেই তুমি তর্ক বলছ, শেষে দাঁড়াবে কোথায়— অনুভবকে যদি লক্ষ্য না কর, অনুভবকে যদি স্বীকার না কর? ভক্তের অনুভব কি অনুভব নয়?

—হ্যাঁ।

মহারাজ : তবে?

—ঠিক আছে, মহারাজ। আর আমার কিছু বলার নেই। (সকলের উচ্চ হাসি)

—মহারাজ।

মহারাজ : বল।

—গতদিন যে-কথা হচ্ছিল—স্বামীজী বলেছেন : "আমরা মিথ্যা থেকে সত্যে যাই না, আমরা নিম্নতর সত্য থেকে উচ্চতম সত্যে যাই।"

মহারাজ : তাহলে উচ্চতম সত্য অপেক্ষা নিম্নতর সত্য হচ্ছে মিথ্যা।

—ও, সেটাকে সত্য বলা যাবে না?

মহারাজ : কী করে বলা যায়? সত্য মানে ত্রিকালবাধরাহিত্য। ত্রিকালে অবাধ হচ্ছে তো।

—তার মানে শুধু উচ্চতম অবস্থাতেই সত্য। তার আগে পর্যন্ত সেটাকে সত্য বলা যাবে না।

মহারাজ : আগে সাপ যখন দেখছি, সাপটা সত্য?

—না, যখন দেখছি তখন সত্য নয়।

মহারাজ : সাপটা তো কোনকালেই ছিল না। তা, যখন দেখছি তখন সেটা সত্য? যদি সত্য হয় তাহলে তারপর যখন দড়ি দেখছি, সাপটা গেল কোথায়?

—অবস্থাভেদে—

মহারাজ : অবস্থাভেদে। অবস্থাগুলো কি সত্য হতে পারে?

—অবস্থাগুলির অংশ—অংশভাবে, তারা যে-অবস্থায় যেমন আছে, সে-অবস্থায় সত্য।

মহারাজ : এ আবার কিরকম সত্য! তাহলে সব সত্যই আপেক্ষিক হয়ে যায়!

—মহারাজ, স্বামীজীর এই কথাটা আমরা কিভাবে বুঝব—"আমরা নিম্নতর সত্য থেকে উচ্চতম সত্যে আরোহণ করি।"

মহারাজ : নিম্নতর সত্যগুলো—সোপান, সিঁড়ি।

—সেই সিঁড়িগুলি যদি মিথ্যা হয়, তার ওপর নির্ভর করে কী করে আমরা সত্যে পৌঁছাব?

মহারাজ : সেগুলো যদি মিথ্যা হয়, তাহলে কী করে ছাদে উঠবে?

—হ্যাঁ। এই তো—এই কথা।

মহারাজ : সেগুলোকে সেইজন্য সত্য বলা হচ্ছে। কারো যদি নিষ্ঠা না থাকে, সত্য বলে বোধ না থাকে, সে তাকে আশ্রয় করবে না।

—মানে, ঠাকুর বলছেন ছাদে ওঠার পর আবার দেখা যায়—ছাদও যে-জিনিসে তৈরি, সিঁড়িও সেই জিনিসে তৈরি। মিথ্যা বলছেন না। একই বলছেন।

মহারাজ : তৈরি জিনিসটা বলছ কাকে? এক ব্রহ্মবস্তু দিয়ে সব তৈরি। আবার ওটাকে ইট-কাঠ দিয়ে বলছ, তা তো হবে না। ব্রহ্মই বস্তু—"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" সর্বত্রই ব্রহ্ম ব্যাপকরূপে আছেন। তিনি দেশ-কাল বা নিমিত্তের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নন। এই তো কথা।

—হ্যাঁ। দেশকালনিমিত্ত যাকিছু সব তিনিই হয়েছেন।

মহারাজ : তিনি দেশ-কাল-নিমিত্ত হন নাকি? এগুলো তো ব্যাখ্যা।

—মহারাজ, উপনিষদেও তো বলেছেন : "পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।" (পুরুষসূক্তম্, ২)

মহারাজ : তাতে কী হল?

—এর মানে, এই সমস্ত কিছুকে তো স্বীকার করা হচ্ছে। তিনিই এই সমস্ত কিছু হয়েছেন। পরিষ্কার বলা হল তো।

মহারাজ : তা, তিনি হয়েছেন মানে, তিনি কি বিকারী? তাঁকে পরিণামী বলা হল? হয়েছেন যদি বলা হয়, তাহলে তিনি পরিণামী, তিনি বিকারী। (হাসি)

—মহারাজ, ঠাকুরের এই উদাহরণগুলি তাহলে—

মহারাজ : আসল কথা দেখ, যাকিছু দেখছি, তা সবই তিনি। এই তিনি হয়েছেন—একথা ঠিক নয়। যাকিছু দেখছি, সব তিনি। সাপটা দড়ি। তাকে সাপ বলি বা ফাটল বলি বা জলধারা বলি—সবগুলো সেই দড়ি।

—হ্যাঁ। এবারে ঠিক বোঝা যাচ্ছে।

মহারাজ : তবে?

—ঠিক আছে।

মহারাজ : "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" মানে ঐ বোঝায়।

প্রশ্ন : মহারাজ, আজ বাবুরাম মহারাজের তিথিপুজো। কিছু বলুন।

মহারাজ : শ্রীশ এখনো ফেরেনি, না?

—ফিরেছে, মহারাজ।

মহারাজ : ফিরেছে? দেখাই যাচ্ছে না যে! শ্রীশ—কোথায় সে?

—আমি আছি।

মহারাজ : কোথায়? আছ? চালু কর না?

—আজকে বাবুরাম মহারাজের তিথিপূজা। বাবুরাম মহারাজের কথা একটু বলুন।

মহারাজ : মহাভারতের কথা অমৃতসমান।/ কাশীরাম দাস কহে শুন পুণ্যবান। (সকলের হাসি)

—কী প্রসঙ্গে হল এটা মহারাজ? কী প্রসঙ্গে বললেন এটা? বাবুরাম মহারাজের কথা কিছু হোক—বাবুরাম মহারাজকে তো আপনি দেখেননি?

মহারাজ : না। বাবুরাম মহারাজকে দেখিনি বলা যায়। আবার একটা faint impression আছে—যেন দেখেছি বলে মনে হয়।

—কিরকম impression মহারাজ?

মহারাজ : বলছি যে—faint impression। তা কিরকম বলা যায়?

—বেলুড় মঠেই সম্ভবত। নাকি?

মহারাজ : হ্যাঁ। বেলুড় মঠে। তারপর মনে আছে—তাঁর ভাণ্ডারার দিন এসেছিলাম।

—ভাণ্ডারার দিন?

মহারাজ : হ্যাঁ।

—গলা গেছে।

মহারাজ : গলা গেছে? কোথায় গেছে? (সকলের হাসি) শ্রীশ তোমার বৈরাগ্যের কথা এরা শুনেছে?

—আমার আবার কবে বৈরাগ্য হল?

মহারাজ : ঐ যে খবরের কাগজ পড়তে সময় পেতে না! মনে নেই? কোন মহারাজ তোমায় জিজ্ঞাসা করলেন—খবর কী? তুমি বললে—খবরের কাগজ আমি পড়ি না। খবরের কাগজ পড়তে সময় পাই না।

—ঐ একবার। মঠে আসার কিছুদিন পরে—

মহারাজ : আরেকটি মেয়ে বলছে—আমি জনমদুখিনী। নিজেকে জনম-দুখিনী বলে বলত। পাড়ার ছেলেরা তাকে খেপাত। আর সে যা-তা বলে গালাগাল দিত। তাই শুনবার জন্য খেপাত।

—তাহলে, আজ কিছু কথা হবে না?

মহারাজ : বাবুরাম মহারাজের কথা সব আমাদের বইয়ে বেরিয়ে গেছে। আর নতুন করে কিছু বলার নেই। সাধুদের খুব ভালবাসতেন।

—না, সাধুদের খুব বকাবকিও করতেন।

মহারাজ : হ্যাঁ, একদিন একজনকে গালাগাল দিয়েছেন। তা মঠ থেকে বেরিয়ে গেছে। মহারাজ বললেন : অ্যাঁ! ব্যাটা গেল কোথায়? সকলে বলল—আপনি বকাবকি করেছেন, সে গেটের কাছে বসে কাঁদছে। তারপর গেলেন গেটের কাছে, গিয়ে দেখেন যে সত্যি কাঁদছে। অ্যাঁ! ব্যাটা একটু গালাগাল শুনে অভিমান হয়েছে! চল, ঘরে চল। এরপর নিজে খুব আদর করে খাওয়ালেন তাকে।

—মহারাজ, আঁটপুর গেছেন?

মহারাজ : আঁটপুর? হ্যাঁ, গেছি তো।

—মঠ নেওয়ার আগে না পরে?

মহারাজ : পরে। মঠ নেওয়ার আগে গেছি বাড়িতে। কোথায় যাব? মঠ নেওয়ার পর মন্দির হয়েছে। মন্দির হওয়ার আগে বাড়িতে গেছি। তা, মন্দির হয়েছে, আমরা গেছি। গিয়ে দেখি নাটমন্দিরে বসে একজন খবরের কাগজ পড়ছে। তা আমরা গেলাম, প্রণাম করলাম। ফিরেও চাইল না। একটু যে ফিরে চাইবে, তাও না। কথাই বলল না কেউ। চলে এলাম। এরপরে সে নাকি দীক্ষা-টিক্ষা নিয়েছিল। (হাসি) ও যদি আগে দীক্ষা নিত, তাহলে অন্তত ফিরে চাইত। (হাসি) আরেকজন আমাদের গুজরাটি ছেলে। সে সাধু হয়েছে। সে একবার মঠে এসেছিল। তা আমায় বর্ণনা করছে—মঠে গেলাম, কেউ কথাই বলে না। তা বলছে—মনে হল, কথাই বলে না যখন, এলাম কেন—একজনকে আমি জিজ্ঞাসা করতে গেলাম। হঠাৎ একটা গাড়ি এল, সবাই সেদিকে ছুটল—গাড়ির দিকে। আমার সঙ্গে কেউ কথাই বলল না। যদিও পরে সে সাধু হয়েছে। আমি বলি, কী ব্যাপার? এর পরেও সাধু হলে! তা, হাসছে। মঠের সম্বন্ধে এই ধারণা ছিল, তবুও সাধু হয়ে গেল। এখন আর বলবে না ওরকম। আজ আর কোন কাজের কথা হল না। বুঝেছ?

—সময় হয়ে গেছে, মহারাজ।

মহারাজ : সিটি পড়ে গেল?

—Whistle পড়ে গেছে। এখন, আপনার পরবর্তী রুটিন শুরু হবে।

মহারাজ : না, আজকাল revolving stage তো—revolve করে বদলে গেল।

—তাহলেও তো light off করতে হবে।

মহারাজ : না, light off করে না।

—করে না?

মহারাজ : না। তোমরা revolving দেখেছ? (সকলের হাসি)

—দেখেছি মহারাজ।

মহারাজ : তাহলে light off করে বলছ কেন?

—Light off করে মহারাজ, আমরা দেখেছি।

মহারাজ : না। আমি দেখেছি, light off করে না। (হাসি)

—আপনি তাহলে latest দেখেছেন।

মহারাজ : আমি Star theatre দেখেছি। (সকলের হাসি) Star theatre-এ revolving দেখেছি। তার আগে কখনো theatre-ও দেখিনি, revolving-ও দেখিনি। তারপর মেয়েরা অভিনয় করছে, কখনো দেখিনি। ঐ প্রথম দেখলাম। সিলেট থেকে ভক্ত এসেছে theatre দেখতে। আরে বিটি—বিটি মানে মেয়ে—আরে বিটি তো দেখা যাবে! আর আগেকার দিনে ছিল—বৃন্দে হল অধিকারী। যাত্রা—বৃন্দা। তা, বৃন্দে সখী—বড় বড় ঐ দাড়ি খোঁচায়। (মহারাজের হাসি) আবার এর ভেতরে মাঝে মাঝে নিচে নেমে তামাক খেয়ে নিচ্ছে। (সকলের হাসি) এসব দেখেছ?

—না, মহারাজ। এসব দেখিনি।

মহারাজ : এই! তোমরা সেদিনের ছেলে। তোমরা কিছুই দেখনি।

—মহারাজ, আর আপনি যে বলেন, একজন যাত্রা দলে গেছে। তা, গল্পটা কী?

মহারাজ : হ্যাঁ, গ্রামের একটি ছেলে পঞ্চানন। সে একবার সেই গ্রাম ছেড়ে যাত্রাদলের সঙ্গে চলে যায়। বহুদিন বাদে সে গ্রামে ফিরলে পাড়া-পড়শিরা জিজ্ঞেস করে—হ্যাঁরে পঞ্চা, তুই এখন কোথায় আছিস?—যাত্রাদলে।—কী সাজিস?—তামাক সাজি। (সকলের হাসি)

॥ ১০৭ ॥

মহারাজ : অ— পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। একজন তো পালিয়েছে। সে আর আসছে না। (সকলের হাসি) জ— এখন পালিয়ে বেঁচেছে।

—তাকে আরেকজন ধরেছে।

মহারাজ : কে?

—ঠান্ডা। ঠান্ডায় ধরেছে। (হাসি) মহারাজ—

মহারাজ : হ্যাঁ বল।

—আমি প্র— বলছি। (সকলের হাসি) শুনতে পাচ্ছেন মহারাজ?

মহারাজ : হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি—বল।

—কালকে কথা হচ্ছিল দ্বৈত আর অদ্বৈতবাদে। বললেন—এরা নিজ নিজ standpoint-এ সম্পূর্ণ পৃথক। পরস্পরের সাথে সমন্বয়ের কোন সম্ভাবনা নেই। তাই তো?

মহারাজ : সমন্বয়ের সম্ভাবনা নেই, কে বলল? সবগুলোকে যদি গ্রহণ কর তাহলেই সমন্বয় হল।

—হ্যাঁ। আমার এটাই ধারণা ছিল মহারাজ।

মহারাজ : তা তো হবেই। সমন্বয় এভাবেই হবে। 'আমি সব লই'—ঠাকুর বলছেন।

—মহারাজ, এটাই কী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ?

মহারাজ : না, না। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মানে—চিৎ-বিশিষ্ট এবং অচিৎ-বিশিষ্ট উভয়ের একত্ব। যে চিৎ-বিশিষ্ট সেই অচিৎ-বিশিষ্ট—দুইয়ের একত্ব মানে এই।

—চিৎ মানে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব উপহিত?

মহারাজ : চিৎ-বিশিষ্ট অচিৎ-বিশিষ্টয়ৈরেক্যম্।

—বিশিষ্ট কথাটা যদি একটু ব্যাখ্যা করেন, মহারাজ। বিশিষ্ট বলতে কি—

মহারাজ : চিৎ-বিশিষ্ট চৈতন্য, আর অচিৎ-বিশিষ্ট চৈতন্য—তাদের একত্ব।

—অচিৎ-বিশিষ্ট চৈতন্য বলতে কি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব?

মহারাজ : এসমস্ত আলাদা কথা। সাংখ্যের কথা। আর এটা হচ্ছে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের কথা। দুটোকে এক করবে না। এই হচ্ছে আমাদের মুশকিল। বিভিন্ন বাদকে আমরা একই অর্থে ধরতে চাই। তা হয় না। ঠাকুর বলছেন, যখন দ্বৈত, তখন সেটাকে তত্ত্ব হিসাবেই বলছেন। এটাকে একটা step হিসাবে নয়।

—অচিৎ-বিশিষ্ট বলতে মহারাজ—অচিৎ জিনিসটা কী তাহলে?

মহারাজ : অচিৎ-বিশিষ্ট মানে জড়-বিশিষ্ট। অচিৎ মানে জড়।

—জড় বলতে এখানে কোন্ জিনিসটাকে বোঝাচ্ছে?

মহারাজ : সমস্ত জগৎ—দৃশ্যজগৎ।

—এটাই তো চতুর্বিংশতি তত্ত্ব মহারাজ?

মহারাজ : আবার চতুর্বিংশতি তত্ত্ব বলছ! এটা সাংখ্যের একটা মত। তা তুমি এর ভিতরে ঢোকাচ্ছ কেন? বিভিন্ন vocabulary-কে ভিন্ন রাখতে হবে।

—আচ্ছা। তাহলে মহারাজ এতে জগৎ বলতে আমরা কতটা নেব? জগতের মধ্যে কোন্‌টা পড়ছে?

মহারাজ : সমস্ত জগৎ। যাকিছু জড় তাই জগৎ।

—জড় বলতে মহারাজ, ব্যাবহারিক জগৎটাও তো জড় দেখি।

মহারাজ : আবার ব্যাবহারিক পারমার্থিক নয়। এটা পরমার্থত চিৎ এবং অচিৎ-এর ঐক্য।

—পরমার্থ হল যেটা চিৎ।

মহারাজ : পরমার্থ মানে আপেক্ষিক সত্য নয়।

—আচ্ছা। নিরপেক্ষ যে চিৎ অর্থাৎ অখণ্ড সচ্চিদানন্দ যার কথা বলা হচ্ছে।

মহারাজ : এটা একটা হল। যারা অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে মানে তাদের অচিৎ-বিশিষ্ট মানতে হয় না।

—যারা অচিৎ-বিশিষ্টকে মানে তারা অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে মানে না—

মহারাজ : তত্ত্ব বিচার করলে এসে যায়। ঠাকুর বলছেন, আমি সব লই।

—জিনিসটা তো একই, তত্ত্বটা তো একই।

মহারাজ : আরে! না মানলে আবার এক হল কী করে? মানা নিয়ে তো কথা। এক বহু হল—এটা সকলে মানে কি? যদি কেউ না মানে, সেটা কী করে তত্ত্ব হবে?

—তার কাছে সেটা না। কিন্তু তত্ত্বত জিনিসটা তো এক।

মহারাজ : আবার বলছ এক? কাকে তত্ত্ব বলে? এক হলে—মানা, আর না মানা আলাদা করছ কেন? তা তো নয়। যারা মানে, সেটাকে তত্ত্ব

বলে মানে। যেমন জীব আর ব্রহ্ম—অদ্বৈতীরা বলে অভিন্ন। দ্বৈতবাদী অভিন্ন বলে না কখনো। তারা বলে, জীব আর ঈশ্বর নিত্য পৃথক।

॥ ১০৮ ॥

মহারাজ : গলা এখনো ঠিক হয়নি?

—না, এখনো ঠিক হয়নি। মহারাজ, অশুদ্ধ মহারাজ আছেন।

মহারাজ : অশুদ্ধ! ও অশুদ্ধ। (সকলের হাসি) ও পালিয়ে পালিয়ে বাঁচে খালি। আরে, আমরা টাকা চাইব না। (সকলের হাসি) অশুদ্ধকে যাই বলি, ও চাবি আনে না। (সকলের হাসি) সেদিকে সাবধান আছে।

—এমনি হেসে কথা বলবেন, টাকা চাইলেই গম্ভীর হয়ে যান। (হাসি)

মহারাজ : অন্য জায়গায় তো কথা বলে। এখানে ভয়ে কথাই বলে না। (হাসি) নি—, মায়ের তিথিপুজোর জোগাড় হচ্ছে?

—হচ্ছে মহারাজ। প্যান্ডেল-ট্যান্ডেল হচ্ছে।

মহারাজ : টাকা-কড়ি আসছে?

—টাকা-কড়ি আসছে।

মহারাজ : কত হল?

—কত হল, বলা যাবে না এখন।

মহারাজ : বলতে দোষ নেই। আমরা তো—

—আমার জানা নেই। কারণ বিভিন্ন counter থেকে যোগ করা হয়। সেই যোগটা জানা নেই।

মহারাজ : ভালভাবে হবে তো?

—হ্যাঁ, মহারাজ। ভালভাবে হবে।

মহারাজ : কত হাজার?

—হাজার নয়, লক্ষ।

মহারাজ : লক্ষ!

লক্ষ লক্ষ লক্ষ্য ছেড়ে এক লক্ষ্য হওয়া চাই।
এক লক্ষ দেবে কড়ি তবে আমি পার করি।

গোপীরা পার হবে, কৃষ্ণ নৌকা এনেছে। তা বলছে—আমাদের পার করে দাও। তা বলছে—এক লক্ষ দেবে কড়ি তবে আমি পার করি। আরেকজনে আখর দিচ্ছে—লক্ষ লক্ষ লক্ষ্য ছেড়ে এক লক্ষ্য হওয়া চাই। (কিছুক্ষণ পর) কী, কথা বলছ না কেন?

—মহারাজ, কৃষ্ণ তো গরু চরাত, আবার নৌকা কবে থেকে বাইতে শুরু করল?

মহারাজ : যখন যেরকম দরকার আর কী। যখন যেরকম দরকার। কিছু কথা বল। কিছু বল।

—মহারাজ, কালকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল। আপনি বলেছিলেন, চিৎ-বিশিষ্ট এবং অচিৎ-বিশিষ্ট সম্পর্কে।

মহারাজ : 'চিদচিদ্বিশিষ্টয়োরৈক্য'।

—সাধারণভাবে 'বিশিষ্ট' শব্দের যা অর্থ, এখানে কি একই অর্থ?

মহারাজ : বিশিষ্ট মানে অভিমানী। জড়তে অভিমানী, চৈতন্যতে অভিমানী, জীবেতে অভিমানী, জগতে অভিমানী।

—চেতনেতে অভিমানী?

মহারাজ : হুঁ। জীব চেতন। তবে খণ্ড চৈতন্য। তাতে অভিমানী। তাকে আমি মনে করছি। আর জগৎটাকে আমি মনে করছি। তুমি জীব-জগৎ হয়েছ—না? তাই বলছে। হওয়াতে তার অভিমান।

—কথা হচ্ছিল মহারাজ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং ঠাকুর যে বলেছিলেন, তিনি সবকিছুই নেন—এই দুটো এক কিনা?

মহারাজ : হ্যাঁ। দুটো এক। তিনি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন।

—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর মতে, এই জীব জগৎ সমস্ত কিছু—সবই তিনি?

মহারাজ : সব তিনি তো বটেই। আবার এর অতিরিক্তও বটে।

—অতিরিক্তও বটে! তাহলে কি এটাও মানা হল? যখন বলছি—তিনিই সব হয়েছেন আবার অতিরিক্তও হয়েছেন, তাহলে কিরকমভাবে মানা হচ্ছে?

মহারাজ : কিরকম? যখন হবে তখন বুঝতে পারবে।

—সে তো মহারাজ, পরের কথা। আলোচনা, বুদ্ধির দ্বারা যদি—

মহারাজ : তা নয়। কথা হচ্ছে, এই সমস্ত তিনি। জীব জগৎ সব তিনি। এর নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। জীবও তিনি, জগৎও তিনি। চেতনও তিনি, জড়ও তিনি।

—দ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ দুটোকেই নিচ্ছে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ?

মহারাজ : দ্বৈতবাদীর মত হচ্ছে—তিনি আলাদা, জগৎ আলাদা। এখানে তা নয়। তিনি জগৎও বটে, চেতনও বটে।

—অর্থাৎ দ্বৈতবাদকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বহন করে?

মহারাজ : অ্যাঁ?

—দ্বৈতবাদীর যে-সিদ্ধান্ত বা মত—এটা কি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বহন করে?

মহারাজ : একজনের মত আরেকজন ব্যবহার করে না। বিশ্বাস করে না। তাহলে তারা ভিন্ন মতবাদী হতো না।

—তাহলে এখানে ঠাকুরের সাথে এদের—

মহারাজ : ঠাকুর বলতেন, মতুয়ার বুদ্ধি ভাল নয়। তিনি এই হতে পারেন, আর এই হতে পারেন না—এইরকম হয় না। তিনি অনন্ত, তাঁর অনন্ত লীলা। তাঁর ইচ্ছামত তিনি হতে পারেন এবং তিনি হয়েছেন—সেটাকে মিথ্যা বলব না।

—আরেকটা কথা মহারাজ, আমরা সংঘের মধ্য থেকে অদ্বৈতবাদ কিভাবে practise করব?

মহারাজ : Practise করো না, দ্বৈতবাদ practise কর।

—হ্যাঁ। আপনি একদিন বলেছিলেন, যাদের শক্তি আছে তারা অদ্বৈত practise করবে। কিন্তু এখানে—সংঘের মধ্যে থেকে কাজকর্মের মধ্যে থেকে কিভাবে practise করা যেতে পারে?

মহারাজ : আমরা অদ্বৈতবাদকে মানি, তাই বলে অদ্বৈতকে আলাদাভাবে practise করি না।

—তা আমরাও তো practise করতে পারি না।

মহারাজ : তা পার না, করবে না। কে করতে বলছে? তবে অদ্বৈতবাদকে সিদ্ধান্ত বলে মানতে হবে।

—একটা বাদকে সিদ্ধান্ত বলে মানলাম—অদ্বৈতবাদ। তারপর practise করব দ্বৈতবাদ। এটা মহারাজ কিরকম?

মহারাজ : কেন হবে না? আমি এর বেশি করি না। এটাই করছি। আমার এটায় রুচি।

"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদ্ ঋজুকুটিলনানাপথজুষাং।
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥"

(শিবমহিম্নঃস্তোত্র, ৭)

—মহারাজ, ঠাকুরের জীবনে দেখা যায়, আপনিও একদিন বলেছিলেন, ঠাকুর যখন দ্বৈতবাদ অভ্যাস করছেন, তখন অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বা অন্য কোন মতবাদ মনের মধ্যে স্থান দিচ্ছেন না।

মহারাজ : না, না। তা নয়, তা নয়। একই সময় কখনো বলছেন—আমি তোমাদের রেণুর রেণু। আবার কখনো বলছেন—এর ভিতরে দুটি আছে, ঈশ্বর আর ভক্ত, ভক্ত আর ভগবান। ঠাকুরের কথা তো এগুলো।

—মহারাজ, যে-তিনটি মতবাদের কথা হল, তিনটিই পৃথক। কিন্তু ঠাকুর যে সমন্বয় করেছেন সেটা কী দৃষ্টিতে?

মহারাজ : তিনটিকেই তিনি মানতেন।

—মানতেন মানে তো পৃথক পৃথক ভাবেই মানতেন।

মহারাজ : আরে! পৃথক পৃথক ভাবে হোক, মানতেন তো। জগতের যত তত্ত্ববিদ্ আছে তারা একজন অপরের তত্ত্বকে মানে না। ঠাকুর বলছেন—'আমি সব লই'।

—লই মানে যে অদ্বৈত, দ্বৈত এবং বিশিষ্টাদ্বৈত তিনটিই সত্য বা তিনটিই পথ, এই হিসাবে তো?

মহারাজ : হ্যাঁ, তা তো বটেই!

—আচ্ছা, তিনটি—যখন যেটা করছি, একটাকে যখন সত্য বলছি, তখন একই সময়ে অন্য বিরুদ্ধ মত সত্য; তা কী করে—সেটাই প্রশ্ন।

মহারাজ : আমরা দেখিয়ে দেব ঠাকুরকে—তিনি তিনটিকেই মানছেন। একই সময়ে তিনটিকে মানছেন। বলেছেন, তিনি সব হতে পারেন।

—তিনি সব হয়েছেন বা হতে পারেন—এটাকে আমরা সাধারণত বিশিষ্টাদ্বৈত মতের উদাহরণ মনে করি।

মহারাজ : তা মনে করি। কিন্তু তিনি অদ্বৈত হতে পারেন, তিনি দ্বৈত হতে পারেন, বিশিষ্টাদ্বৈত হতে পারেন। ঠাকুর ছাড়া আর কেউ একথা বলবে না।

—তিনি সব হয়েছেন বলছেন—এটা তো অদ্বৈতবাদীরা মানবে না। তারা বলছেন, সব বলে কিছু নেই।

মহারাজ : আরে! আমি বলছি তো—যখন বলছেন তিনি—এর ভিতরে দুটি আছে—ভক্ত আর ভগবান। তখন কী করে দুটি হয়? তাকে বলে Split individuality.

—হ্যাঁ। একজনের মধ্যে দুটি ভাব হতে পারে। দুটি একই সঙ্গে না—একটি যখন আছে, তখন অন্যটির হয়তো প্রাবল্য।

মহারাজ : দুটি একইসঙ্গে আছে বলছেন তো। একই ক্ষেত্রে দুটি রয়েছে।

—একই ক্ষেত্রে। কিন্তু একটি যখন উঠছে, আরেকটি তখন উঠছে না। যখন ভক্তের ভাব তখন ভগবানের ভাব সেখানে নেই—

মহারাজ : তিনি কে? তিনি ব্রহ্মও বটে। তিনি জীবও বটে, তিনি দেহও বটে, তিনি দেহীও বটে।

—কিন্তু এই প্রসঙ্গে মহারাজ, সমস্যা হয়। শ্রীমা যখন বিমলানন্দজীকে বলছেন, "আমাদের গুরু যিনি তিনি তো অদ্বৈত। তোমরা সেই গুরুর শিষ্য, তখন তোমরাও অদ্বৈতবাদী। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি তোমরা অবশ্য অদ্বৈতবাদী।" এই কথাটাকে আমরা কিভাবে গ্রহণ করব?

মহারাজ : অদ্বৈতবাদকে তোমরা তত্ত্ব বলে মানবে। অদ্বৈতকে 'অব্যবহার্যম্' বলা হয়েছে। তা হল, অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিত হলে সে অবস্থায়। তার আগে পর্যন্ত অদ্বৈতভাবকে সামনে আদর্শরূপে রেখে ব্যবহারের চেষ্টা। ঠাকুর বলেছেন না—"অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর্।" এই হল কথা। অদ্বৈতবোধ যদি মাথায় থাকে তাহলে বেচালে পা পড়বে না।